শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক

বিষয় সূচী

প্রকাশকের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য জীবন কথা "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের" ষষ্ঠ খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল ইহা পরম আনন্দের বিষয়। শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৪৯ সনের জুলাই মাস হইতে ১৯৫০ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী এবং শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য সব কথা এই খণ্ডের মূল বিষয়। বারাণসী আশ্রমে পবিত্র গঙ্গাতটে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত অপূর্ব্ব তত্ত্বালোচনা, পরম পূজ্য ভাগবত সম্রাট স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজী কর্ত্তৃক ১৫ দিন ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবৎ সপ্তাহ, অতি প্রসিদ্ধ শ্রী ত্রিবেণী পুরীজী মহারাজ, উত্তরকাশীর শ্রী দেবী গিরিজী মহারাজ, বৃন্দাবনের শ্রী হরিবাবাজী মহারাজ প্রভৃতি দর্শন-দুর্লভ সিদ্ধ মহাত্মাদের দিব্য উপস্থিতিতে অভূতপূর্ব্ব দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ, কাশীধামে বিশিষ্ট মহাত্মাদের উপস্থিতিতে 'স্বয়ম্ভূ বিশ্বনাথের' প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মচারী মৃন্ময়, স্বরূপ, প্রকাশ ও পার্শী ব্রহ্মচারী কেশবের কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ, পুরীতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের নবকলেবর উৎসবে শ্রীশ্রীমার উপস্থিতি এবং শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির ও বিগ্রহাদি সম্পর্কে শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য ইতিকথা এবং ঐ একই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরের উপর বিচিত্র সব ক্রিয়ার বিষদ্ বর্ণনাই এই ভাগের মূল প্রতিপাদ্য বস্তু।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা হইলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের সপ্তম ভাগও আশা করা যায় অতি শীঘ্রই ভক্তদের সম্মুখে পুস্তকাকারে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে।

পণ্ডিচেরী নিবাসী শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী ভবানী লাহোরীর স্বর্গগতা পত্নী শ্রীমতী রোসার স্মৃতিতে এই গ্রন্থের বর্তমান ভাগটি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে সমর্পিত হইল। শ্রীশ্রীমার পরমকৃপায় এই ভক্ত মহিলার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই কামনা।

বিনীত

— প্রকাশক

উত্তরকাশীতে শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(ষষ্ঠ খণ্ড)

(এক)

কাশীধামে মাতৃসঙ্গ

২৮শে আষাঢ়, মঙ্গলবার বাং ১৩৫৬ (ইং ১২/৭/৪৯)

আজ বেলা ১২টার সময় দিল্লী হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম, বন্ধুবর মনোমোহন আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল এবং আমাদের অপেক্ষায় সে নিজেও অনাহারে ছিল। ভূপতিবাবুও কলিকাতা হইতে গতকল্য আসিয়াছেন। যাহা হউক আমরা শীঘ্র স্নান সমাপন করিয়া মনোমোহনের বাসায় গিয়া আহার করিলাম। রাত্রি দশটায় শ্রীশ্রীমা আসিলেন।

জাগতিক বিদ্যাভাসের সার্থকতা

৩০শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪/৭/৪৯)

সকালবেলা বাজার এবং গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া আশ্রমে গেলাম। তখন বেলা ১০টা হইবে, তখনও শ্রীশ্রীমা হল ঘরে আসেন নাই, একটু পরেই আসিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আসিয়াছেন। তিনিও তখন হলঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি আরও অনেকে ঐখানে ছিলেন। শ্রীযুক্ত অরুণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীর বেশ নাদুসনুদুস গোপালের চেহারা। (সকলের হাস্য) বাবাজী পুঁথি পুস্তকের ধার ধারে না, বলে "বহি ত বয়ে যায়।"

কিন্তু আমি বলি বহিকে আমরা যেমন বহন করিব, আবার অনেক সময় বহিও আমাদিগকে বহন করিয়া নিয়া যায়। কোথায়? না সেই পরমপদের দিকে। বাবাজী বলে যে বহি পড়িয়া কিছু হয় না। এক অর্থে কথাটা ঠিক, আবার অন্য অর্থে কথাটা ঠিক নয়। কোথায়ও যাইতে হইলে যেমন হয় টাইম-টেবিল দেখিতে হয় কিম্বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সেইরূপ ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে হয় সাধুদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয় কিংবা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। এই হিসাবে সদ্‌গ্রন্থের উপকারিতা আছে। জাগতিক বিদ্যালাভ করিতে গেলেও ত তোমাদের ভিতরে একটা দিক্ খুলিয়া যায় যদিও ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আপাততঃ দেখা যায় না, কিন্তু জাগতিক বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ উঠে তবে ঐ জাগতিক বিদ্যার খোলা পথ দিয়াই উহা তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে। সেইজন্য বলি সমস্ত দিক্ কাজ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে কোন না কোন প্রকারে ভিতরের পথগুলি খুলিয়া রাখা ভাল। বৃষ্টির জল বাহির করিবার জন্য নালা তৈয়ার করিলে একদিকে যেমন উহা দিয়া বৃষ্টির এবং অন্যান্য নোংরাজল চলিয়া যায়, আবার প্লাবনের সময় ঐ পথ দিয়াই গঙ্গা বা সমুদ্রের জল প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই জাগতিক কাজের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করিলে ঐ বুদ্ধিও একদিন ধর্ম্মের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে। কারণ সবই যে তিনি। তিনি যে কোন ভাবে, যে কোন স্থানে নিজকে যে কোন সময় প্রকট করিতে পারেন। এই শরীরের কথাই ধর না। এ শরীরের ত লেখাপড়া বা শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই যে উহার সাহায্যে এ শরীর কিছু গ্রহণ করিবে, তবুও এ শরীর যাহা লইয়া থাকিত, তাহার ভিতর দিয়াই ইহা যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করিত। সেইজন্য উদাহরণ দেওয়ার সময় এ শরীর ঘরকন্নার জিনিষপত্রাদির সাহায্যই বেশী লয়। যে ভগবৎভাব হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং হঠাৎ নিভিয়া যায় এবং যাহার কোন স্থায়ী ফল থাকে না তাহা বুঝাইতে উহাকে পাটকাঠির আগুনের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকি, আর যে ভগবৎভাব ধীরে ধীরে প্রকাশিত এবং স্থায়ীভাবে

থাকে তাহাকে কাঠের আগুনের সঙ্গে তুলনা দিয়া থাকি। এ শরীর যে সব উদাহরণ দেয়, তাহা এই জাতীয়।

তারপর এ শরীর যখন বৌ সাজিয়া ছিল, তখন ত এ শরীরের ভিতর দিয়া জপ, পূজা ইত্যাদি সমস্ত আধ্যাত্মিক কাজগুলি হইত। তখন দেখা গিয়াছে যে এ শরীর ঐ গুলি লইয়াই দিবারাত্র পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া অন্যান্য মেয়েরা এ শরীরকে বলিত, 'এ আবার কেমন জপ বা পূজা করা! আমরাও ত মন্ত্র পড়িয়াছি, আমরাও ত পূজা করি কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা সকল সময় ঐ লইয়া পড়িয়া থাকি?' উহার উত্তরে এ শরীর বলিত—মন্ত্র ত একটা বীজের মত। বীজ পুতিলে যেমন উহা হইতে গাছ বাহির হয় সেইরূপ মন্ত্র সাধনা করিলেও বীজ হইতে গাছ বাহির হওয়ার মত প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ গুলি ত অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। তা'ই যাহার ঐরূপ হয় সে উহা লইয়া মাতিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তোমরাও লক্ষ্য করিয়াছ যে বীজ হইতে চারা গাছ যখন হয় তখন বীজ ফাটিয়া উহা হইতে সূতার মত অঙ্কুর বাহির হইয়া মাটি ভেদ করিয়া সোজা উপর দিকে উঠিতে থাকে। কখনও কখনও ঐ অঙ্কুরটি বাঁকা হইয়া বীজকে জড়াইয়া পরে সোজা হইয়া উঠিয়া থাকে। মন্ত্রের বেলায়ও সেই রূপ। মন্ত্র জাগরণকে তোমরা কুণ্ডলিনী জাগরণ বল। উহাও অঙ্কুরের মত কখনও সোজা হইয়া কখনও বা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরে উঠে। এই ভাবেও কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়। আবার কেহ কেহ বলে যে কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রার মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই আরম্ভ হয় না। এ দেহের ত কোনও মতের সঙ্গেই বিরোধ নাই, তাই এ শরীর বলে যে—হাঁ, তাহাও হইতে পারে। কি অর্থে হইতে পারে জান? বীজ হইতে গাছ বাহির হইয়া যখন উহা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আবার ঐ গাছে ফল, বীজ হয় এবং ঐ ফল, বীজ, অনন্ত গাছ, ফল বীজের সূচনা করে অর্থাৎ ঐ ভাবে গাছের অনন্তত্বের দিকটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইরূপ খণ্ডশক্তি সহস্রার মধ্যে গিয়া উহার অনন্ত গতি, স্থিতি প্রকাশ করিয়া দেয়। এই প্রকাশের দিকটাকে কেহ

যদি কর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করে তাহাও দোষের হইবে না।

অজ্ঞান এবং জ্ঞানাতীত অবস্থা

অরুণ বাবু—গতকল্য যে কথা হইয়াছিল, উহার মধ্যে আমার বিশেষ বক্তব্য এই ছিল যে অজ্ঞান নাশ করিতে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন সেই রূপ পরে জ্ঞানকেও ত্যাগ করিতে হয়। যেমন শরীরের ময়লা উঠাইতে সাবানের প্রয়োজন হয়; এখানে ময়লাটা হইল অজ্ঞান আর সাবানটা জ্ঞান। সাবান দিয়া ময়লা উঠান হয় সত্য, কিন্তু শেষে জল দিয়া সাবানকেও ধুইয়া ফেলিতে হয়।

এই কথাগুলিতে সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদা প্রভৃতি অনেকেই আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন সাবানটাকে ত আর জ্ঞান বলা যায় না, উহা কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধি করিতে হয়। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "হাঁ, সাবানটা জ্ঞান নয়। যদিও উহা ময়লা উঠাইবার একটা উপায় মাত্র, কিন্তু উহা নিজেও ময়লা। উহাকে সেবা কর্ম্ম ইত্যাদি বলিতে পার। জল দিয়া ময়লা এবং সাবান ধুইয়া ফেলিতে হয়। এই জলই হইল জ্ঞান-গঙ্গা। কাজেই জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই অজ্ঞান চলিয়া যায়।"

অরুণ বাবু—জ্ঞানের প্রকাশ হয় কিরূপে?

মা—ইহা স্বয়ং প্রকাশ।

অরুণ বাবু—এই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানই-বা চলিয়া যায় কি ভাবে?

মা—এই স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানে যদি পূর্ণভাবে স্থিতি লাভ করা যায় তখন জ্ঞান আর অজ্ঞানের কোন প্রশ্নই থাকে না।

অরুণ বাবু—আমিও ত তাহাই বলি। যখন আমি সদ্যোজাত শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিলাম, তখন ত অন্ন, বস্ত্র, পুঁথি, পুস্তক—কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই; অথচ সবই আপনা আপনি জুটিয়া গিয়াছে সেইরূপ—

মা—একথাটা ঠিক হইল না। তুমি যে বলিতেছ যে জন্মের সময় তুমি অন্ন, বস্ত্র কিছুই সঙ্গে করিয়া আন নাই—ইহা ঠিক নয়।

আমি বলি তুমি জন্মগ্রহণের পর এ যাবৎ যাহা কিছু চাহিয়াছ ও পাইয়াছ, তাহার একটা পুটুলি সঙ্গে লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। (সকলের হাস্য) তুমি জান আর নাই জান, ঐ রূপ যে একটা পুটুলী সঙ্গে ছিল তাহা নিশ্চিত। তবে একথা সত্য যে ঐ পুটুলীতে যাহা ছিল না এরূপও কোন কোন জিনিষ তুমি জন্মের পর সদ্‌গুণে পাইয়া থাকিতে পার।

অরুণ বাবু—আমি যদি অন্যের হুকুমে কাজ করি তবে উহার ফলাফল আমার নয়। সেজন্য আমি ভোগ করিব কেন?

মা—তুমি যাহাকে অন্যের হুকুমে কাজ বলিতেছ—উহারই বা স্পষ্ট ধারণা কই? সেইজন্য দেখা যায় যে অন্যের হুকুমে কাজ করিলেও ভোগফলটা নিজের উপর থাকিয়া যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য বুঝা যায় যে, যে কাজটা করা হইতেছে উহা ত আমার নিজের নয়। আমি যন্ত্রমাত্র, কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হয় না বলিয়া কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। যখন ধারণা হয় যে আমি যন্ত্র বই কিছু নই এবং যন্ত্রী তিনিই, তখনই বলিতে হইবে যে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে। এই অবস্থায় কর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে না।

ইহার পর অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। এদিকে বেলাও অনেক হইয়াছে দেখিয়া মায়ের আহারের জন্য তাগাদা আসিল। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

জাগতিক হিসাবে সমষ্টিভাবে জীবের কল্যাণ সম্ভবপর নয়

বিকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা নীচে আসিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া অনেকেই বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। অরুণ বাবু এ বেলাও মার সঙ্গে নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি? অনেক সময় বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যেমন পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্যের সহিত সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য। আবার উভয়ের সহিত বিবেক যাহাকে কর্ত্তব্য

বলিয়া নির্দ্দেশ করে উহার সহিত সংঘর্ষ। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি?"

মা—এই প্রশ্নের একটা দিক হইতে এরূপ বলা যায় যে যা হয়ে যায়। তুমি জগৎকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন তুলিতছ কি না, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই এখানে সকল বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়াই জগৎ। কাজেই এখানে সকলেরই এক কর্ত্তব্য হইতে পারে না। জগতের দুঃখ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করে যে এমন কিছু করা যায় না যাহা হইতে এই দুঃখ দূর হয়? কিন্তু কাজে দেখা যায় যে এই ভাবের উদয় হইতে যে কাজ হয় উহাতে যাহার দুঃখ মোচন হইবার তাহারই হয়। সকলের পক্ষে সমান হয় না। যে দুই এক জনের উপকার হয় তাহাও তাহাদের কর্মফলের জন্য। ঐ ফল তাহাদের প্রাপ্য বলিয়াই এইরূপ যোগাযোগ হয়। এমনও দেখা যায় যে কেহ কাহারও উপকার করিতে গিয়া তাহা করিতে পারে না, কারণ যাহার উপকার করিতে চাহিতেছে তাহার কিংবা তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বাধা আসিতেছে। জলপ্লাবন হইলে যেমন কতকগুলি জায়গা জলে ডুবিয়া যায় আবার জল কমিয়া গেলে সেগুলি যেমন পূর্ব্বের অবস্থায় ফুটিয়া উঠে, এ জগতের ব্যাপারও সেইরূপ। এই জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাজনেরা ত কতবার নূতন নূতন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সমষ্টিভাবে জগতের দুঃখ দূর হয় নাই। সাময়িকভাবে উহার একটা ফল দেখা গেলেও কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, যে জগৎ সেই জগৎই আছে।

অরুণ বাবু—হাঁ, মা, জগতের মঙ্গল করিতে গিয়া কতজনকে ক্রুশবিদ্ধ হইতে হইয়াছে, গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দূর দূর পল্লীগ্রামে কতলোক যে এই ভাবে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মা—হাঁ, তাহা ত হইতেছেই। তোমাদিগকে আরও একটা কথা বলিতেছি—লোকে যে এখন স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করার পক্ষপাতী

—ইহাও কিন্তু সর্ব্বাংশে মঙ্গলজনক নয়। লোকেরা আজকাল স্বামী, স্ত্রী এবং নিজেদের ছেলেপেলে লইয়াই সংসার করাই সুখের মনে করে। কিন্তু এই ভাবে সংসার করিতে গিয়াও দেখে যে এখানে জ্বালা-যন্ত্রণার অন্ত নাই। আবার স্বামীর পরিজন লইয়া সংসার করিতে গেলেও কষ্ট হয় সত্য; কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেতে ধৈর্য্য ও সংযম শিক্ষা হয়—উহার মূল্যও কম নয়। অনেকে আবার দশজন লইয়া সংসার করিতে গিয়া শেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ নানাভাবেই কিন্তু সংসার বৈরাগ্য জন্মে। কাজেই সংসারে যে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়—ইহাও ভগবানের কৃপা মনে করিতে হইবে।

অরুণ বাবু—তোমার কথায় মনে হয় যে বিবাহ এবং সংসারাদি করা ভাল নয়।

মা—এমন কথা ত আমি বলি নাই।

অরুণ বাবু—সন্ন্যাস এবং গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট?

মা—সকলের জন্য ত এক পথ নয়। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে ভালমন্দ বিচার চলে না। কেহ বিবাহ না করিয়াও বিবাহিত, আবার কেহ বিবাহ করিয়াও সন্ন্যাসী। (সকলের হাস্য)

অরুণ বাবু চিরকুমার।

জন্মান্তরবাদ

৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার, (ইং ১৫।৭।৪৯)

আজ বেলা ১১টার সময় মা হল ঘরে আসিলেন। আমরা অল্পসংখ্যক লোক ঐখানে উপস্থিত ছিলাম। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, গতকল্য জন্মান্তরের কথা উঠিয়াছিল কিন্তু কোন আলোচনা হয় নাই। আজ ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হউক। খৃষ্টানদের মতে পূর্ব্বজন্ম নাই। তাহারা বলে যে মৃত্যুর পর সকলকেই বিচারের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় এবং যখন সেই দিন আসে তখন সকলেই কবর হইতে উত্থিত হয় এবং বিচারের ফলে কেহ নরকে কেহ বা স্বর্গে গমন করে। ইহাদের যে পূর্ব্বজন্ম হয়—এরূপ

কোন কথা উহাদের শাস্ত্রে নাই।

মা—অতি সত্য কথা।

শাস্ত্রী মহাশয়—আমাদের মধ্যে আবার লোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে বলা হয়।

মা—হাঁ, সত্য ত একই।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে সমর্থন করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। মা আমাদের দুইচারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা তাঁহার কথা বুঝিতেছি কি না। আমি বলিলাম যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহাই বলিলেন।

মা—বুঝিতে গেলেই বোঝা বাড়ে। (সকলের হাস্য) তাই নয় কি? লোকে মন দিয়া বোঝে। মন কিনা মানিয়া নেওয়া। আবার মনকে মান অর্থাৎ অভিমান বা অহঙ্কার বলিতে পার। কাজেই মন দিয়া বুঝা আর কিছুই নয়, শুধু বোঝা বা ভার বাড়ান। এক সত্যকেই লোকে সংস্কার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ করে।

শাস্ত্রী মহাশয়—হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস যে কাশীতে মৃত্যু হইলেই শিবলোক প্রাপ্তি হয়। এখন, কাশীতে যদি কাহারও মৃত্যু হয় এবং তাহার যদি এই জাতীয় সংস্কার না থাকে তবে কি তাহার শিবলোক প্রাপ্তি হইবে না?

মা—কাহার যে কি সংস্কার আছে, তাহা তোমাদের জানা নাই। যদি কোন সংস্কার না থাকে তবে ঐ লোকটির কাশীতে আসা হইল কেন? এজন্মে হয়ত তুমি দেখিতেছ যে এ সব বিষয়ে তাহার কোন বিশ্বাস নাই, কিন্তু এ জাতীয় কতখানি বিশ্বাস লইয়া যে সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাত তোমার জানা নাই। সেইজন্য বলা হয় যে, কাহার কি গতি হইবে তাহা এক জন্মের কর্ম্ম দেখিয়া বলা যায় না। কেহ হয়ত কর্ম্ম শেষ করিতে জন্ম গ্রহণ করে। কেহ বা কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেইজন্য বলা হয় কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মভোগ। জন্মান্তর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর একদিন এই কথা তুলিও।

সাধন ব্রহ্মচারী—আমরা যে কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করি ইহা বোধ হয় ভগবান্ চান না। (সকলের হাস্য)

মা—সত্যি কি তোমরা মুক্তি চাও? হরিবাবার লোকেরা যে সব লীলা করে তাহার গল্প তোমার মনে আছে কি? নারদ কেমন করিয়া শেঠজীকে শেষে জোর করিয়াই স্বর্গে লইয়া গেল, কারণ ইচ্ছা করিয়া কেহই এই জগৎ ফেলিয়া স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত নয়।

সাধন—আমার কাছে যদি নারদ এখন আসেন তবে আমি এখনই তাঁহার সহিত বৈকুণ্ঠে যাইতে প্রস্তুত আছি।

মা—হাঁ, ঐ শেঠজীর মত। (সকলের হাস্য)

এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ হাস্যালাপ হইল। মনে হইল আজ যেন মার কথাগুলি জমিয়া উঠিতেছে না। কোন প্রসঙ্গ ধরিয়াই মা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছেন না। কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, "এবার দিল্লীতে কথা উঠিয়াছিল অভাব সম্বন্ধে। অভাব বোধ সকলের মধ্যেই আছে। উহা পুরুষের মধ্যে যেমন স্ত্রীলোকের মধ্যেও তেমন। স্ত্রীলোককে তোমরা অবলা বল না? কারণ সে একজন না একজন অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। পিতাই হউক, স্বামীই হউক বা পুত্রই হউক—তাহার একটি অবলম্বন চাই। এজন্য স্ত্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। কারণ সে নিজেই অবলা বা দুর্ব্বল। সে অপরকে বল দিবে কোথায় হইতে? অবশ্য তাহার যদি শক্তিসঞ্চয় হয় তবে আর সে অবলা থাকে না এবং তখন তাহার দীক্ষা দিবার ক্ষমতাও হয়। সে আলাদা কথা। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই থাকে। কাজেই তাহার সাধনা হইল নিজের মধ্যে যে পরম পুরুষ আছেন, তাঁহাকে জাগাইয়া তোলা; পরমপুরুষকে জাগাইয়া উহাকে শক্তির সহিত যুক্ত করা। আবার পুরুষের মধ্যেও অভাব বোধ আছে। তাহারাও স্ত্রীলোক হইতে সেবা চায়। স্ত্রীলোক যেমন পুরুষ চায়, পুরুষও সেইরূপ স্ত্রীলোক চায়। উভয়ের মধ্যেই অভাব। স্ত্রীলোককে যেমন তাহার নিজের মধ্যে যে পরমপুরুষ আছেন, তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, পুরুষকেও

সেইরূপ তাহার মধ্যে যে মহাশক্তি সুপ্তভাবে আছেন, তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়। এইরূপ পরমপুরুষ এবং মহাশক্তির মিলন হইতেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য বলা হয় সীতারাম, শিবদুর্গা ইত্যাদি।"

সত্য উপলব্ধি করিতে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার প্রয়োজন হয় না

আমি—মা, কেহ যদি কোন একপথে সাধনা করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করে, তবে অন্যপথে সাধনা করিয়া ঐ পূর্ণত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কি তাহাকে পুনরায় সাধন করিতে হয়? অর্থাৎ কেহ যদি কৃষ্ণের সাধনা করিয়া পূর্ণত্ব পায় তবে কালীর সাধনা করিয়া ঐ পূর্ণত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহা কি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়?

মা—না, কারণ পূর্ণত্বের মধ্যেই সব আছে। এ অবস্থা লাভ হইলে আর কোন দ্বন্দ্বই থাকে না তবে একটা মজা আছে। কোন কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে এরূপও শোনা যায় যে তিনি শক্তিপথে উপাসনা করিয়া আবার হনুমানের সাধনা বা অন্যকোন পথের সাধনা আরম্ভ করিলেন। ইহার কারণ এই যে কাহারও কাহারও এক পথে সাধন করিতে করিতে অন্য পথগুলিও খুলিয়া যায়। যেমন কেহ দেবীর সাধনা আরম্ভ করিল এবং ঐ সাধনা চলার পথেই তাহার নিকট আর একটি নূতন পথ খুলিয়া গেল এবং ঐ নূতন পথে সে হয়ত হনুমানের কিংবা রাধার সাধনা আরম্ভ করিল। যতক্ষণ সাধন চলিতে থাকে ততক্ষণ ত সাধক পথেই থাকেন। একবার যদি পূর্ণত্বে পৌঁছান যায় তবে আর সাধন কোথায়?

সাক্ষীস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ

১লা শ্রাবণ রবিবার (ইং ১৭।৭।৪৯)

বেলা ১০টায় আশ্রমে গেলাম। দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি অনেকেই মার কথা শুনিতে আসিয়াছেন। দেবশঙ্করবাবু মাকে প্রশ্ন করিলেনঃ 'ব্রহ্মস্বরূপ এবং সাক্ষিস্বরূপ' এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা

ত ব্রহ্ম বলিতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মই বুঝি। সাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বুঝিব?"

মা—আচ্ছা, সাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বোঝ?

দেবশঙ্করবাবু—সাক্ষী যখন বলা হয় তখন বিষয়ের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়। সাক্ষী থাকিলেই সাক্ষ্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থাতে বিষয় নাই। সেখানে এক ব্রহ্মই অসঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

মা—আচ্ছা, এই যে বলিলে যে সাক্ষী বলিলে বিষয় মানিয়া লওয়া হয় এই বিষয়ের জ্ঞানই বা কিরূপ?

দেবশঙ্করবাবু—অজ্ঞানীর নিকট বিষয় বা দৃশ্যবস্তু সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি দৃশ্যবস্তুকে মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং জানিয়াই তিনি নির্বিকার দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন।

মা—এই যে দ্রষ্টা বা সাক্ষীর কথা বলিতেছ ইহাও দুই রকমের হইতে পারে। অজ্ঞানীর কথা এখানে ছাড়িয়া দিলাম। যাহারা সাধন ভজন করিয়া একটু উন্নত হইয়াছে তাহারা এই বাহ্য জগতকে মিথ্যা মনে করিয়া নিজকে ইহার সহিত না জড়াইয়া শুধু সাক্ষী ভাবে ইহাকে দেখিয়া যাইতে পারে। এই যে এখানে সাক্ষী বলা হইল ইহা কিন্তু প্রকৃত সাক্ষীর ভাব নয়। ইহাকে সাক্ষীর মত বলিতে পার, কারণ সাধক এখানে নিজকে সাক্ষী বলিয়া মনে করিতেছে। মনে করা অর্থাৎ মানিয়া লওয়া। এই ভাব মানিয়া লইলে প্রকৃত সাক্ষী অবস্থা লাভ হয় না এবং এখান হইতে সাধকের পতনও হইতে পারে। প্রকৃত সাক্ষীর অবস্থা যখন আসে তখন বাহ্যজগৎ যে অলীক বা মিথ্যা তাহা আর মানিয়া লইতে হয় না। অর্থাৎ উহা আর তখন মনের ব্যাপার নয়, উহা তখন মিথ্যা বলিয়াই অনুভূত হয় এবং হয় বলিয়াই সাধক তখন নির্বিকার এবং অসঙ্গভাবে অবস্থান করিতে পারে। তোমাদের শাস্ত্রেও বলে না যে এক গাছে দুইটি পাখী আছে, উহার একটি ফল খায় এবং অন্য একটি বসিয়া বসিয়া উহা দেখে। যে পাখীটি এইভাবে দেখে সেই দ্রষ্টা বা সাক্ষী।

দেবশঙ্করবাবু—আচ্ছা, এই শেষোক্ত সাধককে কি জীবনমুক্ত

বলিতে পারি?

মা—না, কারণ এখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে। ইহা হইল একটা অবস্থা—দাঁড়াইয়া কিছু দেখার অবস্থা। দ্বৈত বোধ থাকিলে মুক্তি কোথায়? তবে সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ অর্থেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাক্ষীস্বরূপ সেই অবস্থারই ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায় যেখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই—যেখানে মাত্র দ্বিতীয় পাখীটিই আছে, আর যে পাখীটি ফল খায় সে নাই। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পাখীটিকে দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ বলিতে পার। উহা ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নয়। কাজেই দেখিলে যে সাক্ষীস্বরূপ কথাটি তিন অর্থেই ব্যবহার করা যায়—প্রথম, সাক্ষীর মত কিন্তু প্রকৃত সাক্ষী নয়, দ্বিতীয় প্রকৃত সাক্ষী কিন্তু এখানে দ্বৈত জ্ঞান আছে এবং তৃতীয় সাক্ষীস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই।

আকাশগঙ্গায় স্নান

২রা শ্রাবণ সোমবার (ইং ১৮।৭।৪৯)

আজ সকাল বেলা হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে আশ্রমে আজ শতাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, সেইজন্য সকালবেলা আর আশ্রমে গেলাম না। বিকালে যখন আশ্রমে গেলাম, তখন কুমারবাবু ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও পাঠে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন প্রায় পৌনে নয়টা পর্য্যন্ত চলিল। ইহার পর ১৫ মিনিট মৌন থাকিতে হয়। সকলে যখন আশ্রম-চত্বরে মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বৃষ্টিও দুই এক ফোটা নয়, বেশ জোরেই আসিল। শ্রীশ্রীমা আসন ছাড়িয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া আমরাও সকলে নীরবে ভিজিতে লাগিলাম। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—সকলেরই এক অবস্থা। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। ঝম্‌ঝম্ শব্দে বারিপাত হইতেছে, আর এতগুলি লোক নিঃশব্দে এবং নিশ্চলভাবে ঐ বারিধারা গ্রহণ করিতেছে এবং শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ভিজিতেছে বলিয়া সকলেই মনে মনে অতি প্রফুল্ল। মৌন যতক্ষণ ছিল, বৃষ্টিও ততক্ষণ ছিল।

মৌন ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "অনেক দিন আকাশগঙ্গায় স্নান হয় নাই, আজ হইয়া গেল"। আমরা সিক্ত বস্ত্রে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

গ্রহণ বর্জন দুইয়েরই প্রয়োজন আছে

৩রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ১৯।৭।৪৯)

বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে শ্রীশ্রীমা দোতলার বারান্দায় বসিয়া চিঠি লেখাইতেছেন। এই চিঠি লেখার ব্যাপার লইয়া প্রায় ১ ঘন্টা/১।। ঘন্টা কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে কে যেন মাকে একটা মালা, কিছু ফুল এবং একটা শসা ও কয়েকটি লেবু দিয়া গেল। মা এতক্ষণ শসাটি হাতে করিয়াছিলেন, এখন শসাটি হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে শসা ভালবাসে?" কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন মা বলিলেন, "অমূল্য, তুমি এই শসা নেও।" এই বলিয়া আধখানা শসা মা আমার হাতে দিলেন। বাকী আধখানা এক বিধবাকে দিয়া দিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ মায়ের হাত হইতে একটি লেবু লইলেন। নির্ম্মলাদিদি নাম্নী এক বিধবাও একটি লেবু পাইলেন। পূর্ব্বোক্ত বিধবাটিকে সঙ্গে করিয়া যখন নির্ম্মলাদিদি চলিয়া আসিতেছিলেন তখন মা বলিলেন, "এই মালাটিও বা থাকে কেন? ইহাও লইয়া যাও"—এই বলিয়া মা মালাটি নির্ম্মলাদিদির গলায় পরাইয়া দিলেন। নির্ম্মলাদিদির সঙ্গিনী বিধবাটিকে মা ফুলগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এই ফুলগুলি হইতে একটি ফুল লও।"

বিধবা—মা, তুমি একটি ফুল আমাকে দেও।

মা—লওয়ার দিকটা শিক্ষা করা ভাল, অবশ্য এ ফুলের কথা বলিতেছি না। ভগবানের নিকট হইতে কিছু লওযার চেষ্টা করাও ভাল। আবার অনেকের এইরূপ ভাবও হয় যে সে ভগবানের কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিবে। এইভাবে যাহা পাওয়া যায় তাহা রক্ষা করার চেষ্টা যেমন করা উচিত, সেইরূপ ভগবান যাহা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে ভাল জিনিষ গ্রহণ এবং রক্ষা করার চেষ্টা করাও উচিত। এই দুই ভাবই ভাল।

সংখ্যা রাখিয়া জপ

নির্ম্মলাদিদি—মা, সংখ্যা রাখিয়া জপ করা ভাল কি সংখ্যা না রাখিয়া জপ করা ভাল?

মা—সর্বদাই ভগবানের নাম করার চেষ্টা করা উচিত। সংখ্যা রাখিয়া জপ করার একটা সুবিধা এই যে ইহাতে দৈনিক সংখ্যা পূরণ হয় এবং উহা গুরুতে সমর্পণ হয়। তাহা ছাড়া সংখ্যা পূরণ করিবার জন্যও নিজকে কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখিতে হয়। এইভাবে বন্ধন গ্রহণ করিলে বন্ধন মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। প্রত্যহ জপের সংখ্যা পূরণ করিতে করিতে যে দিন বাস্তবিক সংখ্যা পূর্ণ হয়, সেই দিনই তাঁহার প্রকাশ হয়। কবে যে সংখ্যা এইভাবে পূর্ণ হইবে তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই, কিন্তু তবুও প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার জপ করা ভাল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করিয়া বাকী সময়ও সংখ্যা না রাখিয়া জপ করা উচিত। মন স্থির করার যে কথা বলা হয় তাহাও কিন্তু এ জাতীয় কর্ম হইতেই হইয়া যায়। সর্বদা ভগবানের বিষয় চিন্তা, জপ ইত্যাদি দ্বারাই মনস্থির হইয়া আসে। ইহা ভিন্ন মনস্থির করিবার আর কোন উপায় নাই। বিষয় লইয়া থাকিলে মন চঞ্চল হইতে বাধ্য। এক ভগবৎচিন্তার দ্বারাই মনের চঞ্চলতা নষ্ট করা যায় এবং একবার নামজপাদিতে অভ্যস্ত হইলে পরে দেখা যায় যে বিষয়ের আলাপ করিলে বা শুনিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এবং কতক্ষণে বসিয়া ভগবানের নাম করিতে পারিব সেইজন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

এইভাবে মা কিছুক্ষন বলিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া আসিলাম কারণ আকাশ এমনভাবে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় যে শীঘ্রই বর্ষণ আরম্ভ হইবে।

গঙ্গাদিদির মাতার মৃত্যু

বিকালবেলা যখন আশ্রমে গেলাম তখন শ্রীশ্রীমাকে তাড়াতাড়ি হল ঘরে যাইতে দেখিলাম; শুনিলাম যে গঙ্গাদিদির মাতার অবস্থা খুব খারাপ। গঙ্গাদিদির মাতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। তিনি কাশীতে বাসা করিয়া ছিলেন। প্রায় ২।।০ মাস পূর্ব্বে মা তাহাকে

একবার আশ্রমে আনিয়াছিলেন। কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া তিনি আবার বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কাজেই মা তাঁহাকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। এবার দেরাদুন হইতে আসিয়া মা আবার তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়াছেন। আজ কয়েকদিন যাবৎ তাহার অবস্থা খারাপ চলিতেছে। যাহা হউক, মার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হলঘরে গেলাম। সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদা রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে শীঘ্র মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিয়া ভূপতিবাবুসহ আমি মনোমোহনের বাসায় চলিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে রোগিণীর অবস্থা খুবই খারাপ চলিতেছে। শ্রীশ্রীমা রোগিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা নামকীর্ত্তন করিতেছে। মায়ের হাতে একটি ফুলের মালা। মিস্ ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) মায়ের জন্য মালাটি আনিয়াছিল। রোগিণী অতিকষ্টে শ্বাস টানিতেছে, পুত্র ননী কাছে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিতেছে। ইহা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "ভিতরে গঙ্গা, বাহিরেও গঙ্গা" তখন রোগিণীর জ্ঞান আছে। একটু পরে উহাও যেন লোপ পাইল বলিয়া মনে হইল। অতি ধীরে এবং কষ্টের সহিত তখন শ্বাস চলিতেছে। গঙ্গাদিদি রোগিণীকে স্পর্শ করিবার জন্য মাকে অনুরোধ করিলেন। মা তৎক্ষণাৎ গিয়া রোগিণীর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন এবং সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহার একটু পরেই দেহত্যাগ হইল। তখন মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মা হলঘর হইতে বাহিরে আসিয়া চত্বরে বেড়াইতে লাগিলেন। আমি মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এদিকে এক নৌকা ঠিক করিয়া উহার উপরে মৃতদেহ চাপাইয়া যজ্ঞভূষণদাদা প্রভৃতি মণিকর্ণিকার দিকে রওনা হইলেন। আমি আবার মনোমোহনের বাসায় ফিরিয়া গেলাম। সেখানে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আবার আশ্রমে আসিলাম। মা তখন নেপাল (নারায়ণ স্বামী) দাদার ঘরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় বলাই নামে ৩।৪ বৎসরের ছেলেকে মায়ের কাছে আনা হইল। সে তখন

কাঁদিতেছিল। কে যেন বলিল ছেলেটি ভয় পাইয়া কাঁপিতেছে। ইহা শুনিয়া মা এবং খুকুনীদিদি ছেলেটিকে সাহস দিতে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। মা ছেলেটিকে একটু গরম দুধ দিতে বলিলেন। মৃতের চেহারা দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক ছেলেটি ভয় পাইয়াছিল। ইহার একটু পরই মা আহার করিতে উঠিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ভবিতব্যের প্রকাশ সামান্য উপলক্ষ্য ধরিয়া হয়
৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ২১।৭।৪৯)

আজ আর সকালের দিকে আশ্রমে যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন হলঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনান্তে নানা কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় শ্রীশ্রীমা কমল (বিরজানন্দজী) দাদার মায়ের কথা তুলিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই আশ্রমেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। মা বলিলেন, "কমলের মার ছেলের প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল। ছেলে যে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে ইহা তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ছেলের কথা মনে হইলেই তাহার চোখ দিয়া জল পড়িত এবং ছেলেকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিত। একবার সে বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেল, উদ্দেশ্য ছেলেকে বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়া। বিন্ধ্যাচল থাকার সময় একটি ইন্দুর তাঁহার বিছানায় ঢুকিয়া খুব জ্বালাতন করিতে থাকে। উহার অত্যাচার সহ্য করিয়া না পারিয়া সে রাগ করিয়া ইন্দুরটিকে মারিয়া ফেলে। ইন্দুরটিকে মারিয়া তাঁহার ভীষণ অনুতাপ হয়। জীবনে সে কখনও কিছু মারে নাই। ক্রোধের বশে সে ইন্দুরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার যাইবে কোথায়? সেই জন্য তাহার এত অনুতাপ! তাহা ছাড়া সে নিজের ছেলেকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাই আক্ষেপ করিতে করিতে সে বলিত, "এই ইন্দুরেরও বাপ মা আছে, উহাও কাহারও পুত্র; আমি অন্যের ছেলেকে মারিয়া ফেলিলাম।" অর্থাৎ সে নিজের পুত্রস্নেহের ভিতর দিয়াই ইন্দুরের বাপমার কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করা

যায় সে সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তে যে সব দানের কথা আছে উহা শুনিয়া সে বলিল, "আমার এত টাকা কোথায় যে আমি দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব?" তখন এই শরীর খেয়ালবশে তাহাকে বলিল, যদি তুমি টাকা পয়সা দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পার তবে এক কাজ কর। তুমি বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া নিজের ছেলেকেই বিশ্বনাথকে দান করিয়া ফেল এবং আর ছেলের উপর কোন দাবী রাখিও না। সে তাহাই করিল। আমি একদিন কমলকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে সে যদি বিশ্বনাথের মন্দিরে তাহার মাকে কিছু করিতে দেখে তবে সে যেন তাহার মায়ের নিকট হইতে দীক্ষা নেয়। সেও তাহাই করিল, এইভাবে কমলের মা পুত্রস্নেহের দারুণ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিল। এই ঘটনার পর হইতেই দেখা গিয়াছে যে ছেলের প্রতি তাহার যে দারুণ আকর্ষণ ছিল তাহা অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কমলের যে সন্ন্যাসজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা পূর্ণ হইল। তাই দেখ, যাহা ঘটিবার তাহা কেমন একটা সামান্য উপলক্ষ্য ধরিয়া ঘটিয়া যায়।"

ভয়রূপে শক্তির প্রকাশ

(ছোট) স্বামী শঙ্করানন্দ - মা, সেদিন বলাই যে প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল তাহা কি ভাবে হইল? সে কি বাস্তবিকই প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছিল? মা—বলাই ছেলেমানুষ, বোধহয় কেহ উহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল যে গঙ্গাদিদির মা ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহা শুনিয়াই বোধহয় ও এত ভয় পাইয়াছিল। তবে মৃত ব্যক্তি অনেক সময় দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া দেখা দেয় এবং কথা বলে, এরূপ কথা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। অবশ্য বলাই বাস্তবিক কিছু দেখিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে এ শরীর কিছু বলিতেছেনা। এই যে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর হওয়া, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হওয়া, ইহাও একরূপ শক্তির খেলা। যেখানে এইরূপ শক্তির খেলা হয় উহার প্রভাবটাও কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং

ঐ প্রকাশটা ভয়রূপে দেখা দেয়। এই জন্য এইরূপ বিধান আছে যে যাহারা ছেলেপেলে লইয়া শুইয়া থাকে তাহারা রাত্রিতে উঠিয়া যদি জপ করে তবে যেন বিছানা ছাড়িয়া আলাদা আসনে বসিয়া জপ করে। কারণ যদি জপের ফলে কোন শক্তির প্রকাশ হয় তবে যাহারা ঐ শক্তি ধারণ করিতে সমর্থ নয় তাহাদের নিকট ঐ শক্তির প্রকাশটা ভয়রূপে দেখা দিবে। ছেলেপেলে হয়ত ঘুম হইতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিবে। ভয়রূপে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহা এ দেহও দেখিয়াছে। বাজিতপুরে যখন ছিলাম তখন ত রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া জপ ইত্যাদি হইত। ভোলানাথ পাশে ঘুমাইয়া থাকিত। ঐ জপাদির সময় নামের গুণেই নানা শক্তির খেলা আরম্ভ হইত। যখন ঐরূপ শক্তির প্রকাশ আরও হইত তখন দেখিয়াছি যে শরীরের মধ্যে কেমন একটা ভয়ের ভাব দেখা দিত, তখনই শক্তির খেলা বন্ধ হইয়া যাইত। ভয় পাইলে যেমন শক্তির খেলা বন্ধ হয়, সেই শক্তির খেলা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ভয়ের ভাব প্রকাশ হয়। এ শরীরের উপর দিয়া যখন সাধনের অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল তখন এই দুই ভাবই দেখিয়াছি।

একান্ত নির্ভর ভাবই শক্তির প্রকাশের সহায়ক

নেপালদাদা (নারায়ণ স্বামী)—তুমি যখন রাত্রিতে বসিয়া নাম জপ করিতে তখন কি ভাবে নাম হইত?

মা—উহার ত কতরকম আছে। কখনও কখনও দেখিতাম যে মুখ দিয়া উচ্চারণ না করিলেও শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অতি স্পষ্টভাবে নাম হইয়া যাইতেছে। কখনও কখনও ভিতরে আপনা আপনি নাম চলিত, আমি শুধু বসিয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতাম। এইরূপ কতপ্রকার যে হয় তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়।

নেপালদাদা—আচ্ছা, আসন ইত্যাদি কি ভাবে হয়?

মা—এ শরীরের আসন আপনা হইতেই হইত। বাজিতপুর ত ততটা নিরিবিলি ছিল না; বিদ্যাকুটে যখন ছিলাম তখন সন্ধ্যা হইলেই ভগবানের নাম করিতে বসিতাম। ঘরখানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতাম, কারণ উহা মন্দির কিনা। ঐখানে বসিয়া ভগবানের নাম

করা হয়। সন্ধ্যাবেলা নাম করিতে বসিয়া নিজেকে একেবারে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দিতাম। ভগবানের হাতে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া না দিলে ত ভগবান্ গড়িয়া নিতে পারেন না। যদি পেছন হইতে কোন টান বা আকর্ষণ থাকে তবে নাম করিতে গিয়া ভগবানের পরশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখনই সমস্ত আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ভগবানের নাম লইতে আরম্ভ করা যায় তখনই দেখা যায় যে ভগবান্ কি ভাবে আসিয়া সাধককে গড়িয়া তোলেন। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত শরীর ছাড়িয়া যখন ভগবানের নাম করিতে আরম্ভ করিতাম তখন দেখিতাম যে আপনা আপনি আসন হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে শরীরটা সোজা হইয়া উঠিত এবং উহা এমন ভাবে সটান হইত যে ইচ্ছা করিয়া উহা ঘুরান ফিরান যাইত না। আবার যখন ঐ ভাবটা চলিয়া যাইত তখন শরীর আপনা আপনি নুইয়া পড়িত।

নেপালদাদা—নামের গুণে এই সব হয়, না নিজেকে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দেওয়ার ফলে এইরূপ হয়?

মা—দুই কারণেই হইতে পারে। নামের শক্তি ত আছেই। তাহা ছাড়া বেপরোয়াভাবে নিজেকে ভগবানের কাছে ঢালিয়া দিলেও নামের শক্তি ফুটিয়া বাহির হয়। দুইটি ভাব প্রায় এক সময়েই চলিতে থাকে। নামের শক্তি যখন প্রকাশ হয় তখন শরীরের বা মনের উপর কাহারও হাত থাকে না। আবার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়া নাম করিতে পারিলেও নামের শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নেপালদাদা—কোন স্থানে মহাপুরুষ বসিয়া যদি তপস্যা করে তবে ঐ স্থানের প্রভাব কি ভাবে বুঝা যায়? প্রভাবটা কি মাটির না উপরের?

মা—প্রভাবটা স্থানের ও হইতে পারে অথবা মাটির উপরেরও হইতে পারে। সকল সময় যে প্রভাবটা মাটিতেই সংযুক্ত থাকে তাহা নয়। এই প্রভাবের পরিচয় নিজে নিজেই পাওয়া যায়। কোন স্থানে গেলে মনটা যে চঞ্চল হয়, আবার কোন স্থানে গেলে মনটা স্থির হয় ইহা ঐ স্থানের প্রভাবের জন্যই। আমরা যে ভাবে থাকি,

যাহা কিছু দেখি বা চিন্তা করি ঐ ঐ ভাবেই আমাদের সত্তার অংশ ছড়াইয়া থাকে এবং এ অবস্থায় থাকিয়াই প্রভাব বিস্তার করে।

রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া মা উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজনীয়তা

৬ই শ্রাবণ শুক্রবার (ইং ২২।৭।৪৯)

সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর স্বামী শঙ্করানন্দ মাকে বলিলেন, আজ মনোরঞ্জন (সরকার) বাবুর সঙ্গে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, যে ভাবে আজকাল শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে লোকের আর শ্রদ্ধা থাকে না। কাজেই ঐ ভাবে শ্রাদ্ধ না করিয়া ঐ অর্থ দ্বারা অন্য কোন সৎকাজ করাই ভাল। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।

মা—(গঙ্গাদিদিকে) শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে?

গঙ্গাদিদি। যাহা শ্রদ্ধার সহিত করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধা শব্দ হইতেই শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

মা—যমুনাদাস বাজাজ কিছুদিন রায়পুরে থাকিয়া শেষে ওয়ার্দাতে ফিরিয়া গিয়া আমাকে ঐখানে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তখন আমার ঐদিকে যাইবার কোন খেয়াল হইল না। পরে যখন খেয়াল হইল তখন শুনিতে পাইলাম যে বাজাজের মৃত্যু হইয়াছে। এ দেহের কাছে বাঁচিয়া থাকা বা মরিয়া যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই বাজাজের মৃত্যুর পর ওয়ার্দাতে গেলাম। তখন বাজাজের স্ত্রী আমাকে বলিয়াছিল "মাতাজী, মহাত্মা গান্ধী শ্রাদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এখন কি হইবে? আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমরা যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিও," অবশ্য সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে শ্রাদ্ধ করা উচিত কি না। যদি করিত তবে কি বলিতাম তাহা এখন বলিতে পারি না। যাহা হউক আমি ওর্য়াদা হইতে ফিরিবার পথে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বাজাজের পুত্র কমলনয়ন শ্রাদ্ধ করিতেছে। শ্রাদ্ধ করিতে যাহা

যাহা করিতে হয় সে ঠিক্ ঠিক্ তাহাই করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি খুকুনীকে বলিলাম, "উহারা করিবেনা বলিতেছে কিন্তু আমি যে তাহার ছেলেকে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিতেছি।"

তোমরা এইমাত্র বলিলে না যে শ্রদ্ধার সহিত যাহা করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ। দুর্গাপূজা, নারায়ণপূজা, এগুলি ত শ্রদ্ধারই কর্ম্ম, কিন্তু তাহা হইলেও নারায়ণপূজা যেভাবে করা হয় দুর্গাপূজা সেভাবে করা হয় না, প্রত্যেক কার্য্যের বিধিই ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ শ্রাদ্ধের বিধিও ভিন্ন। লোকে বহুদিন হইতে যাহা যে ভাবে করিয়া আসিতেছে তাহা তাহারা সেই ভাবে করিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করে। সেইজন্য মুসলমান, খৃষ্টান তাহাদের নিজ নিজ প্রথা অনুসারে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। আবার তোমরাই বল না যে ঋষিদের মুখ হইতে যে সব মন্ত্র বাহির হইয়াছে উহার অর্থ না বুঝিয়া যদি আবৃত্তি করিয়া যাওয়া যায় বা কাহাকেও আবৃত্তি করিতে শুনা যায় তাহা হইলেও ফল হয়। সেই হিসাবে শ্রাদ্ধাদির অর্থ না বুঝিলেও যদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উহা করা যায় তাহা হইলেও ফল পাওয়া যায়। এরূপ কত কথাই ত শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রেত নিজে দেখা দিয়া বা স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনকে গয়ায় পিণ্ড দিতে বলে। (মনোরঞ্জনবাবুকে) তুমি বলিতেছিলে যে, যে ভাবে আজকাল শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাতে শ্রদ্ধা থাকে না। যাহাকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইলে শ্রদ্ধা হয় সেইরূপ লোক দিয়াই শ্রাদ্ধ করান উচিত। তবে এ কথাও সত্য যে, মন্ত্র এবং ভাব দ্বারা যেরূপ পূজা হয় সেইরূপ ভাব দ্বারাও শ্রাদ্ধ হইতে পারে।

মহাপুরুষের দীক্ষা এবং সাধারণ দীক্ষা

৭ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২৩।৭।৪৯)

আজ বেলা ১০।।০ টার সময় আশ্রমে গেলাম, মা তখন হলঘরে বসিয়াছিলেন। একটি মহিলা (নির্ম্মলাদিদি) দীক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, মা, আমি জানিতে চাই যে যদি কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা না লইয়া সাধারণের নিকট হইতে

দীক্ষা লওয়া যায় তবে কি আবার মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হয়?

মা—দীক্ষাই যদি একবার লওয়া হইয়া থাকে, তবে আবার দীক্ষা কি? আলোচনা এইভাবে আরম্ভ হইল সত্য কিন্তু মা কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। শ্রীমান কুসুম ব্রহ্মচারীও (নির্ব্বানানন্দ) দীক্ষার প্রশ্নটি অবলম্বন করিয়া উহাকে বিশদ করিবার জন্য মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাপুরুষের দীক্ষা, সাধারণ লোকের দীক্ষা, এবং পুস্তক হইতে কোন মন্ত্র নিজেই বাছিয়া লইয়া উহা জপ করা—এই তিন প্রকার অবস্থার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি?" কিন্তু মার কথা অনবরত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, "আজ কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছি যে সবই যেন 'গায়েব' হইয়া যাইতেছে, একথা খুকুনীকে বলিয়াছি। খুকুনী সেদিন ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া মুখে দিল, পরে যখন তরকারী মুখে দিল তখন দেখি যে পূর্ব্বের ডাল ভাতের স্মৃতি একেবারেই নাই। আজকাল যে খুকুনী কিংবা অন্য কাহারও সহিত কথা বলা হয় উহা যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়া বলা হয়। তাহা না হইলে সবই তলাইয়া যায়। তোমরা যে প্রশ্ন কর তাহার উত্তর দিতে গিয়াও মাঝে মাঝে এই অবস্থা হয়। পূর্ব্বে শুনিয়া রাখিয়া এখানে ত কিছু সাজান গুছান নাই যে কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে উহা তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরিব। প্রশ্নের সঙ্গে ভাব এবং ভাষা সবই যে নূতন হইয়া তৈরী হয়। ভাল ভাবে প্রশ্নের জবাব আসে, আবার কখন কখন কথা সব ভাঙ্গিয়া যায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—এরূপ হয় কেন?

মা—তোরা বাজাইয়া নিতে পারিস না তাই এরূপ হয়। যাক্ এখন কথা উঠিয়াছে যে, যাহার মন্ত্র চৈতন্য হয় নাই সে যদি দীক্ষা দেয় তবে ঐ দীক্ষার কোন ফল হয় কি না? বাস্তবিক এমন একটা অবস্থা আছে যখন মনে হয় যে এ জাতীয় দীক্ষা হইতে কোনই কাজ হয় না, আবার এমনও দেখা যায় যে, গুরুর নিকট যে মন্ত্রের চেতন হয় নাই উহা আবার শিষ্যের নিকট চেতন হইয়া গিয়াছে। বারদীর

ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও এইরূপ কথা শুনা যায়। তিনি গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলেন অথচ গুরু নিজে অজ্ঞান রহিয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই এক আত্মা বা এক সত্তা, তিনি কাহার নিকট কি ভাবে প্রকাশিত হইবেন তাহা কি বলা যায়? অনেক সময় দেখা যায় যে কেহ একজনের নিকট দীক্ষা নিল, কিন্তু কিছুদিন জপাদি করিয়া কোন ফল না পাইয়া অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হইল। এখানে তোমরা দেখিতেছ যে একজনই ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট যাইতেছে; কিন্তু গুরুশক্তি যখন তাহার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে তখন সে বুঝিবে যে একমাত্র গুরু যিনি তিনিই তাহাকে বার বার কৃপা করিয়াছেন। দীক্ষা পাইয়া কিছুই হইল না বলিয়া যে ব্যাকুলতা আসে ইহা হইতেই বুঝা যায়—দীক্ষাটা বৃথা হয় নাই। দীক্ষা না হইলে হয়ত ব্যাকুলতা আসিত না।

গাছের জন্য তোমরা ত বীজ বপন কর, বীজটিকে ত মাটিতে চাপা দিয়া রাখিলে, মাটির নীচে থাকিয়া ঐ বীজ কি ভাবে বৃক্ষ হইয়া উপরে উঠিবে তাহা কিন্তু সে নিজেই ঠিক করিয়া নেয়। আবার দেখ এক সময় কতকগুলি বীজ বুনিলে, এক সময় সকল গাছ সমান ভাবে হয় না, কোনটি সবল হইয়া উঠে আবার কোনটি দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। আবার কিছুদিন পর ঐ দুর্ব্বল চারাটিই সবল হইয়া অন্যান্য চারা গাছকে ছাড়াইয়া যায়। কাজেই কখন কি ভাবে যে কাহার বীজ কাজ করিবে তাহা বলা যায় না। তোমরা অনেক সময় বল যে বীজ পুরাতন হইলে উহা হইতে গাছ হয় না, সেই জন্য গাছ করিতে নূতন বীজের খোঁজ করা হয়। সেইরূপ বলা হয় যে সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট বীজ পাইলে উহা চেতন বলিয়া সহজেই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কুলগুরু বা সাধারণ লোকের নিকট হইতে কোন বীজ পাইলে উহাতে কোন ফল হয় না কারণ ঐ সব বীজের হয় ত এককালে চেতন ছিল কিন্তু কালক্রমে উহার শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে মনে রাখিও যে এই জাতীয় বীজ নষ্ট হয় না। কারণ ইহা যে নিত্য বস্তু। এখানে যে বীজরূপে ভগবান্‌ই বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্

কি নষ্ট হইবার জিনিষ? আর মাটিতে বীজ বুনিলে যাহা নষ্ট হইতে দেখা যায় তাহা কি বাস্তবিকই বৃথা যায়? বৃথা কিছুই যায় না। ঐ বীজ মাটিতে পচিয়া সার হইয়া থাকে। যদি দেখ যে ঐ বীজ পিপড়ায় খাইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলেও বলা যায় যে উহা নষ্ট হয় নাই। ভগবান্ই বীজের শক্তিটা উঠাইয়া নিয়া উহা পিপড়ার পুষ্টিসাধনে লাগাইয়া দিয়াছেন। এই ভাবে দেখিলে কিছুই নষ্ট হয় না এবং কিছুই বৃথা যায় না। তোমরাই ত বল যে নাম নামী অভেদ। যদি তাহাই হয় তবে সকল নামেই যে ভগবানের পূর্ণশক্তি আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে অনেক সময় দেখা যায় যে কোন কোন নাম জপ করিয়া কেহ কেহ শীঘ্র ফল লাভ করে। আবার কাহারও বিলম্ব হয়। এই যে শীঘ্র এবং বিলম্ব হওয়া যাহা কিছু দেখ তাহা তোমরা কালের মধ্যে আছ বলিয়াই দেখ, তাহা না হইলে শক্তি হিসাবে সবই সমান।

কুসুম ব্রহ্মচারী—মহাপুরুষের নিকট হইতে কোন চেতন মন্ত্র লাভ করা আর কুলগুরু বা সাধারণ লোকের নিকট হইতে কোন মন্ত্র লাভ করা এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই?

মা—কিছু পার্থক্য আছেই বলিতে হইবে। তাহা না হইলে লোকে পার্থক্য করে কেন? তবে তোমরা ইহাও দেখিতে পাও যে এক মহাপুরুষের অনেক শিষ্য থাকে। তাহারা সকলে এক গুরুর শক্তি লাভ করিলেও সকলে সমানভাবে উন্নতি লাভ করে না। মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা লাভ করিয়া কাহারও হয়ত এ জীবনে ভাল করিয়া ধর্ম্মভাবই ফুটিয়া উঠে না।

আমি—তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে কেহ হয়ত একজনের নিকট দীক্ষালাভ করিল কিন্তু অন্য একজনের শক্তিলাভ করিল, ইহাতে বুঝা যায় যে প্রত্যেক মন্ত্রেই শক্তি থাকে না।

মা—হাঁ, লোকের আলাদা আলাদা জ্ঞান থাকে বলিয়াই এরূপ মনে হয়। কিন্তু গুরুশক্তি যদি মাত্র এক হয় তবে আর আলাদা ভাব কোথায়? একজনের কাছে দীক্ষা নিয়া যে আবার অপরের কাছে

কেহ কিছু লাভ করিল বলিয়া মনে করে এখানেও কিন্তু সে একই শক্তির খেলা হইতে পারে, কারণ পরে সে যাহা কিছু লাভ করিল তাহা যে তাহার দীক্ষার জন্যই নয় তাহা কে বলিতে পারে? আবার এমনও হয় যে কেহ দীক্ষার পর অপরের নিকট গিয়া এমন কোন উপদেশ লাভ করিল যাহাতে তাহার গুরুনিষ্ঠাই বাড়িয়া গেল। এইরূপ কতই হইতে পারে, কাজেই অজ্ঞান অবস্থায় যাহা আলাদা আলাদা মনে হয় জ্ঞান হইলে দেখা যায় উহা এক গুরু শক্তিরই কাজ। কাহারও হয়ত দেখিলে যে সে সাধন ভজনে উন্নতি লাভ করিয়া এমন একটি অবস্থায় পড়িল যাহাতে পড়িয়া সে বেশ ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ইহা মনে হয় যে তাহার জীবনটাই বুঝি বৃথা গেল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। এই যে ঘুরপাক খাইতে দেখা যায় তাহাও কিন্তু গুরুর ইচ্ছাই হইতেছে এবং ইহার দরকার আছে বলিয়াই হইতেছে। আবার হঠাৎ একসময় এই অবস্থা হইতেই ইষ্টের সাক্ষাৎকার হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য বলা হয় যে একবার গুরুর আশ্রয় লাভ করিলে তিনি নিরাশ করেন না।

আমি—পুস্তক হইতে কেহ যদি নিজে নিজে কোন মন্ত্র বাছিয়া নিয়া জপ করিতে আরম্ভ করে তবে কেমন হইবে?

মা—অনেক সময় বলা হয় যে গুরুবাক্য লাভ না করিলে কিছু হয় না। সেইজন্য দীক্ষা লওয়ার অর্থই হইল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। এখানে দীক্ষা লইয়া সে যে গুরুর আশ্রয় পাইয়াছে এই ভাবটাই বড় হইয়া উঠে এবং ইহাই তাহাকে পরমপদ প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। সাধারণ লোকের মধ্যে জীবভাব প্রবল বলিয়া সে নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। সে আজ হয়ত মনে করিল যে সে একটি বিশেষ মন্ত্র লাভ করিয়াছে এবং উহাই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র; কিন্তু কিছুদিন পর তাহার নিজের উপর অবিশ্বাস আসিবে। সে হয়ত তখন মনে করিবে যে ঐ মন্ত্র ত সে নিজেই বাছিয়া নিয়াছে কাজেই তাহাতে যে ফল হইতেছে না উহা আর আশ্চর্য্য কি? আমার কাছে আসিলে আমি অনেককে বলি যে

তাহাদের যে নাম ভাল লাগে সেই নাম যেন তাহারা করে। ইহাতে অনেকেই বলে, "মা, তুমি ত কোন নাম বলিয়া দিতেছ না। আমার নাম যে আমাকেই ঠিক করিতে বলিতেছ।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জীবভাবের জন্য লোকের দুর্ব্বলতা সহজে যায় না।

আবার দেখ, পুঁথিতে যে মন্ত্র আছে উহাও কোন মহাপুরুষের বাক্য। কাগজে উহা লেখা আছে বলিয়াই উহা কাগজ নয়। উহাও শক্তিযুক্ত বাক্য। সাক্ষাৎভাবে কোন মহাপুরুষের বাক্য লাভ এবং পুঁথি হইতে কোন মন্ত্র লাভের মধ্যে পার্থক্য এই যে পুঁথি হইতে মন্ত্রলাভ করিলে উহা সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট হইতে লাভ করা হইল না। এখানে মহাপুরুষ ও তাঁহার বাক্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে এই ব্যবধান ব্যবধানই নয়। সে পুঁথি হইতে মন্ত্র লাভ করিয়াই মনে করে যে, সে সাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের নিকট হইতে উহা লাভ করিয়াছে। এরূপ যাহার হয় তাহার ঐ ভাবেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। এ শরীরের কাছেও অনেকে আসিয়া বলিয়াছে, "মা, এই মন্ত্র জপ করিতে চাই, ইহাতে কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না?" ইহার উত্তরে এ শরীর হয়ত তখন কখন কখন বলিয়াছে, "হাঁ, হইবে।" এগুলি কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের কথা। সাধারণতঃ এইরূপ বলা বড় হয় না।

স্বপ্নের দীক্ষা সম্বন্ধেও এই জাতীয় কথা শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে স্বপ্নের দীক্ষা লাভ করিলে ঐ দীক্ষা ততক্ষণ কার্যকরী হয় না যতক্ষণ না ঐ দীক্ষামন্ত্র কোন জীবিত গুরুর মুখ হইতে লাভ করা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে গুরুর নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে দীক্ষা লাভ করিলে যে শক্তিলাভ হয় উহা পূর্ণভাবে স্বপ্নেও হইতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে আবার গুরুর মুখ হইতে ঐ স্বপ্নের মন্ত্র লইতে হইবে। এ শরীর ত কিছুই ফেলিতে পারে না। এ শরীর বলি কেন? বাস্তবিক পক্ষে কিছুই মিথ্যা নয়। সবই যে সত্য। সব সত্য বলিয়াই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা এইবার উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সূক্ষ্মদেহে শ্রাদ্ধ এবং উহার ফল

৮ই শ্রাবণ রবিবার (ইং ২৪।৭।৪৯)

আজ বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "তোমাকে কেহ কি খবর দিয়াছে?"

আমি—না।

মা—(হাসিয়া) নিশ্চয়ই খবর দিয়াছে। এখানে চিঠি লইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছিল। কুসুম তোমাকে খবর দিতে চাহিতেছিল। আমিই নিষেধ করিতেছিলাম। লোকে যখন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে তখন কি আর খবর দেওয়ার বাকী থাকে? মা কয়েকখানা private চিঠি আমাকে দিয়ে বলিলেন, "তুমি চিঠিগুলি পড়।"

চিঠি পড়া ও লেখার ব্যাপার শেষ হইলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, সেদিন যমুনাদাস বাজাজের কথা বলিতে বলিতে তুমি বলিয়াছিলে, মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুসারে বাজাজের ছেলে তাহার পিতার শ্রাদ্ধ করিল না অথচ তুমি দেখিতে পাইলে যে বাজাজের ছেলে সূক্ষ্ম দেহে তাহার পিতার শ্রাদ্ধ করিতেছে। ইহা হয় কেমন করিয়া? যাহা স্থূলে মোটেই হইল না তাহা সূক্ষ্মে হয় কেমন করিয়া?"

মা—(হাসিয়া) এ প্রশ্ন খুকুনী করিয়াছিল, তখন তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলাম তাহা খেয়াল হইতেছে না। তবে ইহার উত্তর এভাবেও দেওয়া যায় একজন স্থূলে কিছু না করিলেও ঐ অভাবটা কাহারও প্রভাবে সূক্ষ্মে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

আমি। তোমার কথায় মনে হইতেছে যে বাজাজের ছেলে শ্রাদ্ধ না করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল তাহা কাহারও কৃপায় সূক্ষ্মে ঐ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হেতু কাটিয়া গেল। আচ্ছা, এমনও কি হয় না যে বাজাজের ছেলের শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা খুবই ছিল কেবল মহাত্মা গান্ধীর

আদেশ লঙ্ঘনের ভয়ে তাহা পূর্ণ করিতে পারে নাই এবং এই ইচ্ছা ছিল বলিয়াই তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম দেহে ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

মা। এরূপও হইতে পারে। কারণ মানস পূজার কথা তোমাদের শাস্ত্রে আছে ত? তবে একটা কথা এই যে শাস্ত্রের বিধি কায়মনোবাক্যে পালন করিতে শাস্ত্রে বলে। যদি কেহ শ্রাদ্ধ স্থূলভাবে না করিয়া মনে মনে ঐ শ্রাদ্ধ করে তবে স্থূলভাবে ঐ শ্রাদ্ধ করিলে যে ফলটা পাওয়া যাইত, মনে মনে করিলে ঐ ফলটা ষোল আনা পাওয়া যায় না। তবে বাজাজের ছেলের বেলায় সূক্ষ্মে যে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে স্থূলভাবে শ্রাদ্ধ করার সমস্ত ফলই ছিল।

গঙ্গা দিদি। এইজন্যই বুঝি মৃত্যুর পর তুমি বাজাজের বাড়ীতে গিয়াছিলে? পূর্ব্বে এত ডাকাডাকি করিল তখন ত গেলে না।

মা। (হাসিয়া) তোমার পণ্ডিতি বুদ্ধি দিয়া তুমি বুঝি এক নূতন কারণ বাহির করিলে? (সকলের হাস্য) যাহা হউক শেষ রক্ষা হইলেই হইল।

গঙ্গা দিদি। যিনি ভগবানের নাম করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহার জন্য শ্রাদ্ধের বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

মা। এই যে ভগবানের নাম করার কথা বলিতেছ, ইহার মধ্যেও একটু বিশেষ আছে। তোমরা জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাও যে ভগবানের নাম করা হয় কিন্তু উহার ফল কিছু দেখা যায় না, ঐ ফল অনুভূতিতে আসে না। অবশ্য নাম করার যে ফল সে ফল থাকিয়াই যায়। সেইজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানের নাম শুনাইবার ব্যবস্থা, যেন উহা শুনিয়া তাহার ভগবানের নাম স্মরণে আসে। মৃত্যুর সময় যদি কেহ ভগবানের নাম করে কিন্তু ঐ নাম করার ফলে যদি কাহারও নামরূপী ভগবৎ সত্তায় স্থিতিলাভ না হয় তবে শ্রাদ্ধ দ্বারা তাহার তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। আর যে ভগবানের নাম করিতে গিয়া নামের মধ্যস্থিতি লাভ করে তাহার জন্য অবশ্য শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই।

গঙ্গা দিদি। আচ্ছা, শ্রাদ্ধ দ্বারা কি কাহারও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইতে

পারে ?

মা। পিতামাতার প্রতি সন্তানের একটা কর্ত্তব্য আছে। কারণ পিতা মাতা হইতে তাহার জন্ম কিনা। সেইজন্য সন্তান এবং পিতামাতার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে। যতক্ষণ এই যোগসূত্র থাকে ততক্ষণ পিতামাতাও সন্তানের হাতে জলপিণ্ড আশা করেন এবং উহা পাইলে তৃপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। যদি এই জলপিণ্ড না পান তবে উহা পাওয়ার কামনা থাকে বলিয়া ঊর্দ্ধগতির একটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জলপিণ্ড পাইলে কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া এই অন্তরায় কাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে ঊর্দ্ধগতি হয়। অবশ্য পিতা যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন অথবা পুত্র যদি সন্ন্যাসী হইয়া যায় তবে এই সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পিতাপুত্রের মধ্যে যে যোগসূত্র থাকে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে আর শ্রাদ্ধ করিতে হয় না।

স্তর, গতি, স্থিতি—ইহার অর্থ

এই সময় গঙ্গাদিদির ভ্রাতা শ্রীমান ননী মাকে প্রশ্ন করিল, "মা, আপনি যে স্তর, গতি, স্থিতি ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন উহার অর্থ কিভাবে গ্রহণ করিব ?"

মা। স্তর বা স্থান বলিয়া যাহা বলা যায় সে সম্বন্ধে অবশ্য তোমাদের ঠিক ঠিক ধারণা হয় না সত্য কিন্তু ঐ সব অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের নিজ নিজ একটা ধারণা আছে। তোমরা আবরণের মধ্যে থাকিয়া ঐ ধারণা কর বলিয়া উহা সত্য হয় না। যেমন ধরনা তোমরা কোন দিন হরিদ্বারে যাও নাই অথচ হরিদ্বার কথাটি শুনিয়াই ঐ জায়গা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া নিলে। পরে যখন হরিদ্বারে গেলে তখন দেখিলে যে, যে ধারণা তুমি করিয়াছিলে উহা ঠিক নয়। এখন কথা হইতেছে কি যে তোমার ধারণা কি তবে একেবারেই মিথ্যা ? তাহা নয়। প্রত্যেক স্থানের অনন্তরূপ থাকিতে পারে। তোমার ধারণাও ঐ অনন্তরূপের একটি। হরিদ্বারের কথা এখানে কেন আসিল তাহা বলিতেছি, এই শরীর যখন প্রথম হরিদ্বারে গেল তখন হরিদ্বারের বাড়ী ঘর যাহা আছে তাহাত দেখিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারের

আরও একটি রূপও এ দেহের কাছে ফুটিয়া উঠিল। ঐ রূপে হরিদ্বারে বাড়ী ঘর নাই। উহা যেন শূন্য ধূ ধূ করে—এক মরুভূমির মত। কোন সময়ে হরিদ্বারের এই রূপ ছিল বলিয়াই উহা এ দেহের কাছে প্রকাশ পাইল।

গুরু যখন তোমাদের স্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দেন, তোমরা উহা শুনিয়া ঐ সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া ফেল। তোমাদের অবস্থায় ঐরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু নির্দিষ্ট পথে যতই তুমি চলিতে থাকিবে ততই তোমার ধারণা বদলাইতে থাকিবে। পরে যখন তুমি গুরুর সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইবে তখন দেখিতে পাইবে যে এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা কিছু ধারণা করিয়াছ, তাহা সবই অবস্থা ভেদে সত্য। এই জন্যই বলা হয় যে সর্ব্বরূপ তাহারই রূপ, সর্ব্বনাম তাহারই নাম। গুরু করার সুবিধা এই যে, তিনি একটা কিছু ধরাইয়া অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দেন। তিনি কোন নাম বলিয়া দিলেন বা কোন মূর্ত্তির ধ্যান করিতে দিলেন যাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার সাহায্য হয়। তোমাদের অবস্থায় তুমি যাহা ধারণা করিতে পারিবে গুরু অবশ্য তোমাকে তাহাই বলিয়া দিবেন।

গুরু-নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে তোমার অনুভূতি হইতে তোমার ধারণা বদলাইতে থাকিবে। যতক্ষণ এইরূপ বদলাইতে থাকিবে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে তুমি পথেই আছ। একবার যদি পরমগুরু-অবস্থা লাভ করা যায় তখন দেখা যায় যে কিছুই মিথ্যা নয়, অবস্থা ভেদে সবই সত্য। আবার গুরুর নিকট হইতে নাম লাভ করিয়া উহা লইয়া দীর্ঘ দিন কাজ করিয়াও যদি তোমার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলেও মনে করিতে হইবে না যে তুমি এক অবস্থায়ই আছ। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু গুরু তাহা তোমাকে জানিতে দিতেছেন না। সময় হইলে সমস্তই তিনি তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন। কাজেই স্থান, স্থিতি, স্তর বলিতে সেই সব অবস্থায়ই বুঝায় যাহা গুরু তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন। ইষ্ট, গতি, অর্থও সেই গতি যাহা গুরু তোমাকে

দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন ত এই কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিলে?

ননী। আমি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

মা। বেশ যদি আরও কোন প্রশ্ন উঠে তবে তাহা জানাইও।

প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে বিধি নিষেধ—
৯ই শ্রাবণ সোমবার (ইং ২৫।৭।৪৯)

বেলা ১০।। সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া মাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলাম। বড় এবং ছোট স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ছোট শঙ্করানন্দ স্বামী মাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মা, শাস্ত্রে প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে নানাবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত তাহা জানিতে চাই।"

মা। শাস্ত্রে কি আছে?

স্বামী শঙ্করানন্দ। শাস্ত্রে পূজা, আরতি এবং প্রণামের পর প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা। এই প্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রভু দাস ভাবটি পুষ্ট হয়, অর্থাৎ যে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা যায় আমি যে তাহারই দাস এই ভাবটা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত তাহা জানিতে চাই।

মা। কেন? এ সম্বন্ধে ত তোমার গুরুর মত আছে। তাহা কি?

স্বামী শঙ্করানন্দ। প্রসাদ আসিলে গুরুজী উহা ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মা। তবে আর চাও কি?

স্বামীজী। আমার কথা বলিতেছি না। অপর কাহারও মনে যদি প্রসাদ গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তবে তাহার কি করা কর্ত্তব্য?

মা। এই যে বলা হইল সমস্ত প্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা উপায় হিসাবে বলা হয়। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রসাদ বলিয়া কিছু থাকে না, সবই ব্রহ্ম হইয়া যায়। কাহারও গুরু যদি দেবতা বিশেষের প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ দিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে এ শরীরের কিছু

বলিবার নাই। কারণ গুরুর আদেশ সর্ব্বদা পালনীয়। প্রসাদ বলিতে আমরা প্রসন্নতা বুঝি অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিলে মনের ময়লা বা অজ্ঞান কাটিয়া গিয়া আমাদের স্বরূপ প্রকাশের সহায়তা করে। প্রসাদ মাত্রেরই মনের মল বা অজ্ঞানতা নাশের ক্ষমতা আছে। এই ভাব হইতে প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। আবার সাধনের এমন অবস্থা আছে যখন নিজে যে ভোগ ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করা যায় উহা ছাড়া অন্য ভোগ গ্রহণের কোন প্রবৃত্তিই হয় না। এই ভাব সাধনের ফলে নিজের ভিতর হইতে স্বভাবতঃই উঠে। কিন্তু বাস্তবিক যদি কাহারও এরূপ কোন ভাব না থাকে তবে দেবতার প্রসাদ লইয়া বাছাবাছি করা পাপ। আবার সাধনের ফলে আরও একটি অবস্থা হয়—সাধক নিজ হাতে যাহা গ্রহণ করে তাহাই তাহার নিকট পবিত্র বলিয়া মনে হয়। এইখানে নিজে কিছু নিবেদন করিতেছে বলিয়া যে পবিত্র মনে হইতেছে তাহা নহে। সে নিজে নিবেদন করুক বা না করুক তাহার স্পর্শে কোন জিনিষ আসিলেই উহা যে পবিত্র এই ভাবটি জাগিয়া উঠে। সাধনের ইহাও একটা অবস্থা। এইরূপ অনেক অবস্থা থাকিতে বা আসিতে পারে। পরে এইসব গণ্ডীবদ্ধ ভাব কাটিতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয় সকলের যাহা ইষ্ট উহা আমারও ইষ্ট। আমার ইষ্ট ত এত ছোট নয় যে উহা শুধু আমার কাছেই প্রকাশ হইবে। সকলের কাছেই আমার ইষ্টের প্রকাশ, আমার গুরুই জগৎগুরু। এই জ্ঞান হইতে প্রসাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি কাটিয়া যায়। তখন সবকিছুই ভগবানের প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, ফল ফুল যাহা কিছু দেখা যায় উহা সমস্তই যে ভগবানের প্রসাদ বা সমস্তই যে ব্রহ্ম এই বোধ আসিয়া যায়। এইগুলি হইল সাধনের অবস্থার কথা; ইহার সঙ্গে শাস্ত্রের বিধি নিষেধের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যতক্ষণ এ জাতীয় জ্ঞান বা অবস্থা লাভ না হয় ততক্ষণ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ধরিয়া অথবা গুরুর আদেশ মানিয়া চলাই ভাল।

আবার প্রসাদ কতটুকু গ্রহণ করা এ সম্বন্ধেও নানা কথা আছে। কেহ বলেন প্রসাদ কণিকামাত্র গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া উহা ভাল লাগে কি মন্দ লাগে সে সব বিচার করিতে

নাই। প্রসাদ মাত্রই যখন মনের ময়লা কাটিয়া দেয়, উহার সামান্য কিছু লাভ হইলেই হইল। আবার কেহ কেহ বলেন প্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিতে হয় এবং ঐরূপ ভোজন করিলে উহা হইতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। এগুলি হইল ভাবের দিক দিয়া কথা। কিন্তু ভাবের ফল ছাড়াও প্রসাদের নিজস্ব একটা ফল আছে। সেইজন্য ছোট ছেলেপেলের মুখে প্রসাদ দেওয়া হয়। কারণ তাহাদের বেলায় ত ভাবের কোন প্রশ্ন নাই। আগুন জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, স্পর্শ করিলে আগুনের গুণ প্রকাশ হইবেই। সেইরূপ ভক্তি করিয়াই হউক বা অভক্তি করিয়াই হউক প্রসাদ গ্রহণ করিলে উহার ফল থাকিবেই। তবে ভাবযুক্ত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভাব এবং প্রসাদের ফল দুই-ই পাওয়া যায়।

একটি ভদ্রলোক—মাতাজী, ব্রহ্ম ত নিত্য শুদ্ধ বস্তু, তাহাতে মলিনতা আসে কি প্রকারে ?

মা— ব্রহ্মে কখনও মলিনতা আসিতে পারে না, উহা সর্ব্বদাই নিত্য শুদ্ধরূপে প্রকাশমান। জীবভাবই বদ্ধভাব! জীবভাবেই মলিনতা দেখা যায়, ব্রহ্মভাবে উহা সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক—আমার মধ্যে যে মলিনতা বুদ্ধি আছে উহা কাটাইবার উপায় কি ?

মা—পিতাজী, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ কর।

ভদ্রলোক—মহাপুরুষেরও কি প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়? উড়িয়া বাবার মৃত্যু দেখিয়া—এই প্রশ্ন মনে হইতেছে।

মা—এই শরীর কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে কিছু বলে না।

ভদ্রলোক—সেই জন্যই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মহাপুরুষদের প্রারব্ধ ভোগ হয় কিনা।

মা—মহাপুরুষ বলিতে তুমি কি বোঝ?

ভদ্রলোক—যিনি রাগ দ্বেষের অতীত।

মা—যদি তুমি মনে কর যে মহাপুরুষ কর্ম্মের মধ্যে আছেন তবে তাঁহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। আবার সুইচ বন্ধ

করিলেও ইলেকট্রিক পাখা যেমন কিছুক্ষণ চলিতে থাকে সেইরূপ কোন মহাপুরুষের কর্ম্ম যদি সুইচ বন্ধ হওয়ার পর পাখা চলার মত তোমার মনে হয়, তবে জানিও যে তাহারও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ হইতেছে। তবে এ ভোগ সাধারণ লোকের ভোগের মত নয়। আবার এমনও হইতে পারে যে প্রারব্ধ ভোগ হয় না। ভগবান্ যদি সকল কর্ম্মই শেষ করিতে পারেন তবে এই প্রারব্ধটুকু কি শেষ করিতে পারেন না ?

১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার (ইং ২৬/৭/৪৯)

আজ আশ্রমে একশত দশটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল। এইসব ব্রাহ্মণ-ভোজন সাবিত্রী যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবেই করান হইতেছে। দুপুরে এই ভোজন দেখিবার জন্য মা আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা কখনও এরূপ ব্রাহ্মণ-ভোজন দেখি নাই। ইহাও যেন এক প্রকার যজ্ঞ। ব্রাহ্মণগণ সকলেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, চন্দন ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের ললাট চর্চ্চিত ; গলায় মাল্যধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেকের স্থানে আহার্য্য সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাত্রের নিকটেই ধূপ জ্বলিতেছে। সকলে সমস্বরে বেদ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। চারি বেদই পাঠ হইল এবং এই বেদ পাঠ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। ইঁহাদের ভোজনের আয়োজন ইঁহারাই করেন। যিনি রান্নাদি করেন তাঁহারই সমস্ত দোষ ত্রুটি। আর যিনি ভোজন করান তিনি অর্থ দিয়াই খালাস।

সন্ধ্যা কীর্ত্তনান্তে যখন চত্বরে মার কাছে গিয়া বসিলাম তখন অতি অল্প সংখ্যক লোকই মার কাছে ছিল। কন্যাপীঠের তিনটি ছোট ছোট মেয়ে মার অতি নিকটে বসিয়াছিল। মা একটি মালা দ্বারা তাঁহার দুই হাত বাঁধিয়া ছোট মেয়েদিগকে বলিলেন, "দেখ্ আমি হাত বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তোরা ইহা খুলিয়া দিতে পারিস ?" মা প্রথমে যে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে অস্বীকার করিল। তাহার দেখাদেখি বাকি দুইটি মেয়েও বলিল যে তাহারাও বাঁধ খুলিতে পারিবে না। তাহাদের এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "কৈলাসের

পথে তাক্‌লাকোটে একদল ভেড়া দেখিয়াছিলাম। . ওদিকে এই ভেড়াগুলিই মালপত্র বহন করে। যে এই ভেড়াগুলি চালাইয়া লইয়া যায় তাহাকে খুব সাবধানে চলিতে হয়, কারণ একটি ভেড়া যেদিকে যাইবে ঐ ভেড়ার দলও সেই দিকে যাইবে, উহা স্থানই হউক কি অস্থানই হউক। এই মেয়েরাও ঐ সকল ভেড়ার মত ব্যবহার করিল। যেই একজন বলিল যে সে বাঁধ খুলিতে পারিবে না, আর সকলে কোন চেষ্টা না করিয়াই বলিয়া উঠিল তাহারাও পারিবে না। (সকলের হাস্য)

নৌকায় যাইতে ডাকাতের হাতে পড়া

মা যখন এই ভেড়ার গল্প করিতেছিলেন উহার একটু পরেই আশ্রমের বাহিরে পাঁঠার ডাক শুনা গেল। উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এ আবার কি ? ভেড়ার কথা বলিতে বলিতে দেখি শব্দরূপে তাহার দেখা দিতে আসিয়াছে। এখানে ত পাঁঠার শব্দ বড় শুনা যায় না।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। একটু পর মা আবার বলিতে লাগিলেন, "সে অনেক দিনের কথা। তখন এ শরীর বৌ সাজিয়াছিল। পূজার সময় সকলে মিলিয়া বিদ্যাকূটে যাইতেছি। একটি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে। নৌকাখানি ছোট! উহাতে ভোলানাথ এবং আমি উঠিয়াছি, মধুবাবু এবং তাহার স্ত্রী কন্যা ইত্যাদি তিন চারিটি লোকও উঠিয়াছে। কালী বাড়ীতে বলি দিবার জন্য একটি পাঁঠাও সঙ্গে লওয়া হইয়াছে। সকলে মতলব করিয়াছিল যে নৌকাতে কিছুদূর গিয়া শেষে ষ্টিমারে যাওয়া হইবে। সেই জন্যই নৌকাখানা ছোট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন কারণে ষ্টীমার পাওয়া গেল না। সমস্ত রাস্তাই নৌকায় যাইতে হইল। নৌকার মধ্যে মেয়েছেলেব সংখ্যাই বেশী, পুরুষ মাত্র দুইজন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময় একখানা বড় নৌকা উহাতে অনেকগুলি বলিষ্ঠ লোক আমাদের পিছু নিয়াছে। কিছুক্ষণ পর তাহারা আমাদের নৌকার খুব কাছে আসিল এবং তামাক খাইবে বলিয়া আমাদের মাঝির কাছে আগুন চাহিল। মধুবাবু এবং ভোলানাথ সন্দেহ

করিতে লাগিল যে উহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আমাদের নৌকার লোকজন এবং জিনিষপত্র দেখিবার জন্যই তাহারা আমাদের এত কাছে আসিয়াছে। তখন মধুবাবু এবং ভোলানাথ এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল যাহা শুনিয়া উহারা মনে করিল যে এই নৌকায় যাহারা যাইতেছে, তাহারা পুলিশের লোক। এইসব কথাবার্ত্তার জন্যই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক ঐ বড় নৌকাটি একটু দূরে সরিয়া গেল কিন্তু আমাদের পিছন ছাড়িল না। এদিকে ঘোর অন্ধকার করিয়া রাত্রি আসিল। ভোলানাথ ও মধুবাবুকে ভয়ে খুব কাতর দেখিলাম। উহা দেখিয়া আমি মাঝিদিগকে একটা দিক্ দেখাইয়া সেইদিকে নৌকা চালাইতে বলিলাম। মধুবাবু আমার কথা শুনিয়া একটু সাহস পাইয়া মাঝিদিগকে বলিল, "ছোট ঠাকুরণ যখন বলিতেছেন তখন ঐ দিকেই নৌকা চালাও।" তাহাই করা হইল। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের নৌকা আর উহারা দেখিতে পাইল না। কিন্তু এদিকে একটি নূতন উৎপাত উপস্থিত হইল। আমাদের সঙ্গে পাঁঠাটি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। উহা শুনিয়া মধুবাবু প্রভৃতি আবার ভয় পাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল যে যদিও অন্ধকারের জন্য নৌকা দেখা যাইতেছে না কিন্তু এই পাঁঠার চিৎকার শুনিয়াই ত ডাকাতের দল আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহারা পাঁঠার চিৎকার বন্ধ করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতে লাগিল। আমাদের নৌকা যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যদি সেই রাস্তায় যাওয়া হইত তবে আর উপায় ছিল না, কারণ উহা এত নির্জ্জন এবং খারাপ ছিল যে ঐখানে আমাদের সকলকে মারিয়া যদি জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়া যাইত তবে উহাদের বাধা দিবার কেউ থাকিত না। যাহা হউক আমরা নূতন পথ দিয়া এ জেলে-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জেলেরা নদীর ধারে নৌকায় ভোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদের নৌকাও তাহাদের মধ্যে নিয়া রাখা হইল। রাত্রিটা তাহাদের সঙ্গে কাটাইয়া আমরা ভোরে বিদ্যাকুটে রওনা হইলাম। যখন বিদ্যাকুটে গিয়া আমরা পৌঁছিলাম তখন সকলেই বলিতে লাগিল যে

আমরা পূর্বে যে রাস্তা দিয়া আসিতেছিলাম, সে রাস্তায় রাত্রিবেলা কেহ আসে না এবং আসিলে বিপদ হয়ই হয়।

জ্ঞানীর রোগ যন্ত্রণা থাকে কি ?

১১ই শ্রাবণ বুধবার (ইং ২৭/৭/৪৯)

বেলা ১।।০ টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন শ্রীশ্রী মাকে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে দেখিলাম। ভদ্রলোকের নাম শ্রীসুধীর গোপাল মুখার্জি। তিনি পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। দুই দিন ছুটি পাইয়া ইনি মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম সুধীরবাবু মাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নটি এই—সন্তদাস বাবাজী নাকি এক সময় বলিয়াছিলেন যে এমন অবস্থা আছে যখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যেও অসুখের অনুভূতি থাকিতে পারে। আবার শ্রীঅরবিন্দ নাকি বলিয়াছেন যে উচ্চতম অবস্থা হইল তাহাই সেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে অসুখের দুঃখ ও বেদনা অমৃতবৎ মনে হয়। এই দুইটি কথার তাৎপর্য্য সুধীরবাবু মার কাছে জানিতে চাহিলেন। আমি গিয়া মাকে বলিতে শুনিলাম, "এই শরীর ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলে না। আর এই শরীরের নিকট উচ্চ নীচ অবস্থা বলিয়াও কিছু নাই। তবে এমন অবস্থা আছে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোতের মধ্যেও অসুখের অনুভূতি আসিতে পারে। এই যে অসুখের অনুভূতি বা ব্যথাবেদনার প্রকাশ ইহাও তাঁহারই এক রূপ। বেদনা রূপে ত তিনিই। কাজেই এখানে ব্যথাবেদনাই আনন্দময়। আবার এমন অবস্থা আছে যেখানে বেদনার তীব্রতা ও জ্বালা স্পষ্ট হইতেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানও আছে যে জ্বালারূপে, বেদনারূপে তাঁহারই প্রকাশ হইতেছে। এখানে হয়ত মহাত্মারা বেদনার জন্য অজ্ঞানীর মতই 'আহা', 'উহু' করিতেছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহাদের শান্ত নির্বিকার ভাব চলিতেছে। বাহিরের প্রকাশটা অজ্ঞানীর মত হইলেও ভিতরে কিন্তু স্থির শান্তভাব।

ইহা ছাড়া আরও একটি অবস্থা আছে যেখানে সুখ, দুঃখ, আরাম

ব্যারামের কোন প্রশ্নই নাই। ইহা অদ্বৈত অবস্থা। যে অবস্থাকে অদ্বৈত বলা হয় তাহাকে সুখ দুঃখরূপে ভোগ করা যায় না। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। যিনি অদ্বৈত অবস্থায় স্থিত, তাহার মধ্যে সুখ দুঃখাদি ভাবের প্রকাশ দেখা গেলেও তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞানের কোন হানি হয় না। জগৎগুরুর অবস্থা ধর না কেন। জগৎগুরু অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিয়া পরমপদে স্থিত করাইয়া দেন। এখানেও বলা চলে যে জগৎগুরুর মধ্যে অজ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি অজ্ঞানীর অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং উহা বুঝিয়াই উহা দূর করিবার উপায় বলিয়া দেন। এক্ষেত্রে যেমন অজ্ঞান জগৎগুরুর পূর্ণ জ্ঞানের বাধক নয় সেইরূপ এমন অবস্থা আছে যেখানে ব্যথা বেদনার প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞানের কোন হানি হয় না।

মালা ও স্বরূপধারণের উপকারিতা

সুধীরবাবুর শরীরে নানারূপ স্বরূপের (অর্থাৎ তিলকাদি) চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নগুলি দেখিতেও সুন্দর। শ্রীমান ভূপেন কয়েকটি চিহ্ন দেখাইয়া সুধীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল যে এগুলি কিসের প্রতীক। সুধীরবাবু বলিলেন, "এগুলি দেখিতে ঠাকুরের পায়ের আংশিক নুপুরের চিহ্ন।"

নির্ম্মলাদিদি—ইহা শরীরে ধারণ করিয়া লাভ কি ?

সুধীরবাবু—শরীরে এইসব চিহ্ন ধারণ করিবার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ এই চিহ্ন ধারণ করিবার সময় মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে ঐ সকল জায়গায় স্থাপনা করা হয়। এই দেহ যে ঠাকুরেরই মন্দির এবং এ দেহের সহিত যে ঠাকুরের নিত্য সম্বন্ধ ইহা সর্বদা মনে জাগরূক রাখার ইহা একটা উপায় মাত্র। তাহা ছাড়া এই চিহ্ন ধারণ করিয়া কোন অপকর্ম করিতে গেলে এই চিহ্ন হইতে অনেক সময় বাধা আসে। তখন মনে হয় যে যদি মিথ্যা বা অন্যায় আচরণ করাই হইল তবে এই চিহ্ন ধারণ করা কেন ? এই হিসাবে স্বরূপ ধারণের একটা উপকারিতা দেখা যায়।

কি দিয়া এই স্বরূপ করা হয় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সুধীরবাবু

বলিলেন "অনেক জিনিষ দিয়াই ইহা করা যায়, যেমন চন্দন, ভষ্ম, গোপীচন্দন, তুলসীতলার মাটি, গঙ্গার মাটি, কুম্‌কুম্ ইত্যাদি।"

স্বামী শঙ্করানন্দ—এগুলিকে তিলক না বলিয়া স্বরূপ বলা হয় কেন?

সুধীরবাবু—এই চিহ্ন দ্বারা ঠাকুরের সহিত যে এ দেহের নিত্য সম্বন্ধ তাহা বুঝান হয়; অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যে ঠাকুরই ইহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিহ্ন ধারণ করা হয় বলিয়া ইহাকে স্বরূপ বলা হয়। মালা ধারণের উদ্দেশ্যও তাহাই। ঠাকুরের চরণের সহিত এ মস্তক যে বাঁধা হইয়া গিয়াছে মালা ধারণ করিয়া তাহাই বুঝান হয়।

নির্ম্মলা দিদি—চিহ্ন ধারণ করিলেই কি এ ভাব মনে আসে?

সুধীরবাবু—যাহার ঐ সব ভাব আসিবার নয় তাহার কিছুতেই আসিবে না। তবে ঐ সব ভাব মনে আসিবার উপায়রূপে ইহার ব্যবহার হয় মাত্র এবং ইহা ধারণ করিতে করিতে ঐ সকল ভাব আসিয়াও পড়ে।

এই সময় শ্রীশ্রী মা বলিলেন, "এই যে মন্ত্র পড়িয়া চিহ্ন ধারণ করা হয় উহারও একটা ফল আছে। তাহা ছাড়া দ্রব্যগুণও আছে। যে সব জিনিষ দিয়া স্বরূপ করা হয় এসব দ্রব্যের একটা স্পর্শগুণও আছে। এই যে বলা হইল যে এগুলি ধারণ করিলে কোন ফলই হয় না, একথা সত্য নয়। ভাবের সহিত স্বরূপ ধারণ করিলে ভাবের ফল এবং চিহ্ন ধারণের ফল এ দুইই পাওয়া যায়। ভাব না থাকিলেও দ্রব্যগুণের জন্য এবং নিত্য ধারণ করার ফল হইতেও ভাবের উদয় হয়। কাজেই এগুলি ধারণ করা যে বৃথা তাহা বলা যায় না। এ শরীর একবার কুচবিহার গিয়াছিল, যে বাড়ীতে এ শরীর গিয়াছিল সেখানকার লোকের ভাবগুলি বেশ ভাল। বাড়ীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনে থাকিয়া ঐ বাড়ীর এক বৃদ্ধার সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে বৃদ্ধার শরীরে স্বরূপের চিহ্নগুলি জ্বলজ্বল করিতেছে। অপরে

অবশ্য ইহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। বেড়াইয়া যখন আবার কীর্ত্তন স্থলে আসা হইল তখন আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বুঝি বৈষ্ণব?" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা খুব আশ্চর্য্য বোধ করিল। সে বলিল, "তুমি ইহা জানিলে কিরূপে?" আমি বলিলাম যে আমি তাহার শরীরে স্বরূপের চিহ্ন দেখিয়াছি, ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা অবাক হইয়া গেল। ব্যাপার হইল এই যে ঐ বাড়ীর সকলেই শাক্ত। বৃদ্ধা চুপে চুপে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলে যাহাতে টের না পায় সেইজন্য সে জল দিয়া দেহে স্বরূপ করিত। কাজেই অপরে ইহা বুঝিতে পারিত না। ঐ মা (অর্থাৎ নির্ম্মলা দিদি) বলিতেছিল না যে স্বরূপ করা বৃথা কিন্তু এই ঘটনা হইতে প্রমাণ হইল যে উহা বৃথা নয়। অন্যে না দেখিলেও যে স্বরূপের একটা ক্রিয়া থাকে তাহা অনেক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

স্বাভাবিক ভাবে প্রাণায়াম এবং কুম্ভক
১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ২৮/৭/৪৯)

আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বে আশ্রমে গেলাম। তখন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মা হলঘরে আসেন নাই। দেবশঙ্করবাবু সস্ত্রীক আসিয়াছেন এবং শ্রীশ্রী মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বেলা ১০ টার পর মা হল ঘরে আসিলেন। নানা কথা হইতে লাগিল। দেবশঙ্করবাবু কুম্ভকের কথা উঠাইলেন। মা উহা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে প্রাণায়াম এবং কুম্ভক ইত্যাদির কথা বলা হয় ইহা কিন্তু অবস্থাভেদে স্বাভাবিক ভাবেই হয়। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বা প্রাণের গতি আমাদের কর্ম্ম ও ভাবের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই প্রাণের গতি দুই ভাবে ক্রিয়া করে — এক হইল অভাবের দিকে অর্থাৎ জাগতিক কর্ম্মের দিকে; আর এক হইল আধ্যাত্মিক কর্ম্মের দিকে অথবা স্বভাবের দিকে। জাগতিক কর্ম্মের যে দিকটা উহা অভাবেরই দিক, কারণ ঐ কর্ম্ম করিয়া অভাব মিটান যায় না। কর্ম্মও যেমন হইয়া যাইতেছে অভাবও সেইরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। এটা জগতের দিক অর্থাৎ গতির দিক দিয়া তাই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অভাবের

তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন কারণে এই ক্রিয়া যখন বন্ধ হয় এবং আমাদের লক্ষ্যটা তাঁহার পরশ পাইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া যায় তখন আপনাআপনি জগতের দিকে যে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে উহার উপর একটা পরদা পড়িয়া যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস তখন স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই কুম্ভক বলে এবং ইহা স্বাভাবিক ভাবেই হয়। শাস্ত্রে অবশ্য কুম্ভক করিবার বিধি আছে এবং ঐভাবে কুম্ভক করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেও কুম্ভক হইয়া যাইতে পারে। কুম্ভক হইয়া যাওয়ার জন্যই কুম্ভক অভ্যাস করা। জাগতিক দিকে প্রাণের বা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি থাকিলে যেমন নানা কামনাবাসনা এবং উহা পূর্ণ করিবার চিন্তা একের পর এক করিয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, আবার ঐ প্রাণের গতি যখন স্বভাবের দিকে ফিরিয়া যায় তখনও কিন্তু নানা দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। এগুলিকে সূক্ষ্ম জগতের দৃশ্য বলিতে পার, তত্ত্বজ্ঞান বলিতে পার। এগুলির প্রকাশ হইলেই সাধক শক্তির আভাস পায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—এগুলি শুধু শুনিয়াই গেলাম। ইহা যে হয় তাহা বোধে আসিল না।

মা—শুনিয়া গেলেই সোনা হইয়া যায়।

পূজাদি করিয়া রোগ-শান্তি হয় কিনা

আবার অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার খুব ভুগিয়া উঠিলেন। তাঁহার বহুমূত্রের দোষ আছে তাহার উপর আবার কারবাঙ্কল (carbuncle) হইয়াছিল। তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন এখন আবার এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি জন্য তাঁহার এই রোগ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে নানা গুজব আছে সুধীরবাবু সেইসব কথা মাকে বলিতেছিলেন। একটি গুজব হইল এই যে কোন শিষ্যের রোগ-শান্তির জন্য পূজা করিয়াই গোপাল দাদার এই দশা। দেবশঙ্করবাবু এই সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূজা করিয়া যে রোগ-শান্তি হয় ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "তাবিজ কবজ ধারণ করিয়া যদি রোগ শান্তি হয় তবে পূজা করিয়াই বা উহা

হইবে না কেন ? তোমাদের কাছেই শুনিয়াছি যে তোমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে যে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজা করিলে রোগ শান্তি হয়, কিন্তু এই পূজা যদি বিধিপূর্ব্বক না হয় তবে রোগ নাকি আরও বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া তোমরা জাগতিক ভাবেও দেখিতে পাও যে কোন অপরাধ করিয়া যদি বড় কর্ত্তাকে বলিয়া ক্ষমা পাওয়া যায় তবে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী আর কিছু করিতে পারে না। সেইরূপ কোন রোগ হইলে সেই রোগের অধিপতি যে দেবতা আছেন তাহাকে পূজা দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে তুষ্ট করিতে পারিলে আর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

গুরুদত্ত কায়া

এইসব কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা গুরুদত্ত কায়ার কথা উঠাইলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, গুরুদত্ত কায়া সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেদিন তুমি বলিয়াছিলে যে গুরু শিষ্যকে দীক্ষার সময় যে বীজ দেন যাহার মধ্যে শিষ্যকে পরমপদে পৌঁছাইয়া দিবার পক্ষে যাহা কিছু দরকার তাহা পূর্ণভাবে আছে এবং যাহা কালক্রমে শিষ্যকে পরমপদে স্থিত করিয়া দেয়, সেই বীজই হইল শিষ্যের গুরুদত্ত কায়া।"

মা—হাঁ।

আমি—যে শিষ্য এই বীজ লাভ করে তাহার অবশ্য নিজের করণীয় খুব কম জিনিষই থাকে; কারণ গুরুদত্ত বীজ নিজ শক্তির গুণেই শিষ্যকে পরমপদে স্থিত করিয়া দেয়, যে গুরু হইতে এই বীজ পাওয়া যায় তিনি নিশ্চয়ই যোগী গুরু। কারণ যিনি যোগযুক্ত নন তিনি অপরকে পরমপদে পৌঁছাইবার শক্তি কোথা হইতে পাইবেন? এখন প্রশ্ন হইল যদি যোগী গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট দীক্ষালাভ করা যায় বা যদি পুস্তক হইতে কোন মন্ত্র লইয়া অভ্যাস করা যায় তবে পুরুষাকার বলে কি গুরুদত্ত কায়ার মত কোন কায়া তৈয়ার করা যায় ? যদি করা যায় তবে ঐ কায়ার গতি স্থিতি কিরূপ হইবে ?

মা—সেদিন তোমাদিগকে বলিতেছিলাম যে গুরুদত্ত কায়া লাভ করিয়াও শিষ্য নিজ কর্ম্ম দ্বারা নূতন নূতন অনুভূতি পাইতে পারে। গুরুশক্তিই তাহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায় যখন তাহার নিজ হইতে স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম হইতে থাকে। এইসব কর্ম্মকে তোমরা কৃপাশূন্য কর্ম্ম বলিতে পার। অবশ্য এ কথা বলা চলে যে, গুরু যে বীজ দিয়াছিলেন উহার মধ্যেই এই জাতীয় কৃপাশূন্য কর্ম্ম করিবার শক্তি নিহিত ছিল। গুরুশক্তির দিক ত অনন্ত, কাজেই এই শক্তির ক্রিয়াও অনন্ত ভাবে হইতে পারে। তাহা ছাড়া সেদিন আরও বলিয়াছিলাম যে স্বপ্নে কেহ কোন শক্তি পাইল এবং এমনভাবে পাইল যাহাতে তাহার আর লৌকিক গুরু গ্রহণের দরকারই পড়িল না। শাস্ত্র পাঠ হইতেও এরূপ হইতে পারে অর্থাৎ শাস্ত্রের কোন একটা কথা তাহার নিকট এমনভাবে প্রকাশিত হইল যাহার জন্য তাহার লৌকিক ভাবে কোন দীক্ষার প্রয়োজন হইল না।

আমি—তুমি যাহা বলিতেছ উহা সমস্তই গুরুকৃপার কথা, কোন না কোন রূপে গুরুশক্তি আসিয়াই পড়িতেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল এই যে এরূপ কোন শক্তি যদি না পাওয়া যায় তবে কেবলমাত্র পুরুষাকার বলে পরমপদ লাভের জন্য কোন শক্তি অর্জ্জন করা যায় কিনা ?

মা—গুরুশক্তি যদি প্রথমে নাও থাকে, যদি তুমি নিজে নিজে কোন নাম বা মূর্ত্তি লইয়া জপ ধ্যান ইত্যাদি করিতে থাক তবে দেখিবে যে তোমার ঐ কর্ম্মের পথ দিয়াই গুরু বা ভগবান আসিয়া হাজির হইয়াছেন। যদি খাল কাটিতে আরম্ভ কর তবে ঐ খাল দিয়াই গঙ্গার জল আসিয়া পড়িতে কতক্ষণ ?

শ্রীশ্রী মায়ের দীক্ষা

সুধীরবাবু—মা আপনার মধ্যে যেভাবে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ হয় সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা—(হাসিয়া) একটা কথা তোমাদিগকে বলিতেছি—এ শরীর এখনও যাহা, ছোট বেলায়ও ঠিক তাহাই ছিল, এ শরীরের প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন অবস্থা নাই। এ কথা আমি গঙ্গার উপর বসিয়া

বলিতেছি। (সকলের উচ্চ হাস্য) তবে এ শরীরের উপরে একটা সাধনার খেলা হইয়াছে। কিছুটা সময় এ শরীর সাধক সাজিয়াছিল এবং সাধকের যে সব ভাব হয় তাহাও পূর্ণভাবে এ শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি অনেক সময় বলি না যে দেখিয়া আসি ননী* কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বার বার ননীকে দেখিয়া আসি; আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

সুধীরবাবু—কিভাবে এই সাধনা প্রথম আরম্ভ হইল এবং কিভাবে আপনার দীক্ষাদি হইল তাহা সংক্ষেপে শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা—এ শরীরের পিতা কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মসঙ্গীত করিতে ভালবাসিতেন। শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি সমস্ত পথেরই ধর্ম্মসঙ্গীত তিনি করিতেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা খুব কম ছিল। তিনি এই সব গান গাহিয়া গাহিয়া রাত্রি কাটাইতেন। এ শরীরের যখন চারি পাঁচ বৎসর তখন একদিন এ শরীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা, হরির নাম করিলে কি হয়?" তিনি বলিলেন, "নাম করিলে হরিকে দেখা যায়।" আমি আবার বলিলাম, "হরি দেখিতে খুব বড় নাকি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ খুব বড়।" আমি বলিলাম, "এই যে মাঠ দেখা যায় এই মাঠের মত বড়?" তিনি বলিলেন, "ইহার চেয়ে অনেক বড়। তুই তাঁহাকে ডাক না তবেই দেখিতে পাইবি ইঁনি কত বড়।" এইখান হইতেই কিন্তু নাম করিবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু প্রকৃতভাবে নাম আরম্ভ হইল যখন ভোলানাথ বিবাহের পর আমাকে নিয়া অষ্টগ্রামে গেল। সেখানে আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানে আরও একটি লোক ছিল এবং সে ভোলানাথের বন্ধু ছিল। যদিও আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া থাকিতাম তবুও সে আমাকে মা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার মা যে ঘরে মারা গিয়াছিল সেই ঘরেই আমাদিগকে থাকিতে দিল।

* ইনি শ্রীযুক্ত সুধীর মহাশয়ের স্ত্রী, ইতিমধ্যে ইনি কলকাতা হইতে কাশীতে বেড়াইতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ছোটবেলায় তুলসীগাছের যত্ন করিতে শিখিয়াছিলাম। এ শরীরের মা তাহা শিখাইয়াছিল। অষ্টগ্রামে আসিয়াও একটি তুলসী মঞ্চ করিলাম। সেখানে ফুল বাতি দিয়া এমন করিয়া রাখিতাম যে লোকে ঐখানে আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিত। এই তুলসীমঞ্চ দেখিয়াই এখানে কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত হয়। অন্য এক জায়গা হইতে কীর্ত্তনের দল রাত্রিবেলা বাতি এবং খোল করতাল লইয়া গান করিতে আসিল এবং আসিয়াই ঐ তুলসীতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিল। যখন কীর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন আমি এক রোগিনীর সেবায় ছিলাম; কিন্তু ঐ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেলাম। তখন আর লজ্জা সরমের কোন প্রশ্নই নাই। ইহার পূর্ব্বে কিন্তু আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া খুব সাবধানের সঙ্গে চলিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে আমার ফিট হইয়াছে। তাহারা আমাকে উঠাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল। এদিকে মানুষের শরীর দিয়া ঘাম যেরূপ দরদর ধারায় পড়িতে থাকে সেইরূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ কীর্ত্তনের সঙ্গে যেন আমি এক হইয়া গেলাম। কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি কাহারও ভাব হয় তাহা কিন্তু অন্য রকমের হইবে। কারণ ঐ ভাব ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া উহাকে জাগতিক ভাবের কিছু লেশ থাকে। কিন্তু এ শরীরের যে ভাব হইল উহা ক্রিয়ার জন্য নয়। কাজেই এখানে জাগতিক দিকটা একেবারেই বন্ধ এবং এখানে আনন্দের অনুভূতিও কতকটা স্বতন্ত্র। কীর্ত্তনের এই ভাব হওয়ার পর হইতেই নিয়মমত হরিনাম চলিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে যে নাম বাবা করিত তাহা মাঝে মাঝে হইত। প্রত্যহ নিয়মিত করা হইত না।

শ্রীশ্রী মা এই পর্য্যন্ত বলিলে মাকে আহার করাইবার জন্য নিতে আসিল, আমরাও প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিকাল বেলাও এই আলোচনা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

বিকালবেলা ৫টা বাজিতে বাজিতেই আশ্রমে গেলাম। মা তখনও উপর হইতে নামেন নাই। একটু পরই মা নামিয়া আসিলেন। আসিয়া

চত্বরের উপর বসিলেন। সুধীরবাবু সকালবেলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে গুরু ছাড়া সাধন ভজন চলিতেই পারে না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম শ্রীঅরবিন্দ এবং আপনার মধ্যে দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দ যদিও প্রথমে একটি গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুকে ছাড়াইয়া অনেক উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ হইতেই যে তাঁহার এই অবস্থা লাভ হইয়াছে এ কথা তিনি বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদি ভগবৎ কৃপার জন্য উন্মুখ হওয়া যায় তবে উহা লাভও করা শক্ত নয় এবং সেইজন্য গুরু যদি পূর্ণ জ্ঞানী নাও হন তাহাতেও কোনও বাধা সৃষ্টি হয় না। আর গুরু যদি পূর্ণও হন কিন্তু শিষ্য যদি সেরূপ আধার সম্পন্ন না হন এবং ভগবানের দিকে নিজকে উন্মুখ করিয়া রাখিতে অসমর্থ হন তবে গুরু পূর্ণ হইলেও তাহাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারেন না।

মা—আচ্ছা, কৃপার দিকে নিজকে উন্মুখ করিয়া রাখিলেই কি ভগবৎ-কৃপা আসে, না ভগবৎ কৃপা আসিলেই নিজকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করিয়া রাখা যায়? আমিও বলি যে শাবল দিয়া মাটিতে আঘাত করিলে শাবল যে মাটিতে ঢুকিয়া যায় তাহা আঘাতের জন্যই কি ঐরূপ হয়, না মাটি শাবলকে ঢুকিতে রাস্তা করিয়া দেয় বলিয়াই উহা মাটিতে ঢুকিয়া পড়ে?

সুধীরবাবু—ইহার কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে হয় তাহা বলা শক্ত। বোধহয় দুইটিই এক সময়ে হয়। যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আপনার বেলাও কোন গুরু দেখা যায় না। সেইজন্য আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে আপনার গুরুকরণ করিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে না গুরু ছাড়াই হইয়াছে? সকালবেলা যতদূর বলিয়াছিলেন তাহার পর হইতেই এখন আরম্ভ করুন। সকালবেলা বলিয়াছিলেন যে কীর্ত্তনে আপনার দেহ এলাইয়া পড়িত।

মা—হাঁ, উহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এরূপ হইত। আমরা

যেখানে থাকিতাম তাহার নিকটেই এক ছুতোরবাড়ী ছিল। তাহারা নৌকা তৈয়ার করিত। দিনের বেলা তাহারা কাজকর্ম্ম করিত কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহারা কীর্ত্তন করিত। তাহাদের বাড়ী যদিও দেখা যাইত না, কারণ মাঝখানে একটি বাঁশঝোপ ছিল কিন্তু তাহাদের কীর্ত্তনের শব্দ আসিয়া পৌঁছিত।

ঐ শব্দ শুনিয়াই শরীরের বিকল অবস্থা হইত। পরে এমন হইল যে দিনের বেলায় যখন ঐ বাড়ীর দিকে চাহিতাম তখন ওদিকের সবই যেন আনন্দময় বলিয়া মনে হইত এবং উহাদের সহিত সামাজিকভাবে সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর না হইলেও কীর্ত্তনের জন্য উহাদের সহিত একটা আনন্দময় সম্বন্ধ হইয়াছিল। ঐ ছুতোরদের বাড়ীতে একটা ছোট ছেলে ছিল। সে আমার কাছে আসিত। তাহাকে কীর্ত্তন করিতে বলিলে সে নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিত। তাহাকে কীর্ত্তন করিয়া নাচান এই শরীরের একটা খেয়াল ছিল। এই কীর্ত্তন করিতে গিয়া তাহারও ভাব হইত। তাহার মা যখন ঐ ভাব দেখিল সে ভয় পাইয়া আমাকে বলিল, "এত এখনও শিশু, ইহাকে আর হরিবোল করিয়া নাচাইবেন না"। তাহার মা নিষেধ করার পর হইতেই তাহাকে আর নাচান হইত না। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হইলেই সে 'হরিবোল', 'গোবিন্দ বল' বলিয়া জোরে জোরে চেঁচাইত। যাহা হউক এইরূপে নানাস্থানে এবং নানাভাবের কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে শরীরের বিকল অবস্থা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ইহাকে গোপন করিবার চেষ্টা হইত। কিন্তু এ চেষ্টাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। কারণ ভাবের বেগ যখন প্রবলভাবে আসিত তখন গোপন করিবার চেষ্টা কোথায় ভাসিয়া যাইত। কীর্ত্তনে যে আমার ভাব হয় ইহা লইয়াও আমাকে ঠাট্টা করিত। আমিও তাহাদের ঠাট্টাতে হাসিয়া যোগ দিয়া জিনিষটা হাল্কা করিয়া নিতাম। এইজন্য কীর্ত্তনে যে আমার ভাব হইত উহার উপর কেহ জোর দিত না এবং ভোলানাথ ব্যতীত বাহিরের লোকও উহা বিশেষ জানিতে পারিত না। আর তখন আমার একটা খেয়াল ছিল যে আমার এই ভাব হওয়াটা বাহিরে

যেন বিশেষ প্রকাশ না হয়। ইহার পর গগন কীর্ত্তনীয়া নামে এক ভাল কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করিতে আসিল। তাহারা কীর্ত্তন করিবে এবং কীর্ত্তন শেষ হইলে আহার করিয়া যাইবে। সেইজন্য তাহাদের জন্য নানাভাবে রান্না করিয়া রাখা হইল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দেখিতে পাইলাম যে কীর্ত্তনের মধ্যে দুইটি অল্প বয়স্ক বালক নৃত্য করিতেছে। মজাও এমন, এ শরীরও একটি শিশু সাজিয়া শিশুর মত চঞ্চল ব্যবহার করিতে লাগিল। একবার ছুটিয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিতেছি যে খাবার জিনিষ ঠিক আছে কিনা, আবার কীর্ত্তন-স্থানে আসিতেছি, এইরূপে এ শরীরের ছুটাছুটি চলিতেছে। এই ছোটাছুটির উদ্দেশ্য হইল খাবার জিনিষ রক্ষা করা। কিন্তু উহা ঠিকভাবে রক্ষা হইতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য নাই। কীর্ত্তন-স্থানে একটি চৌকী পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একবার ঐ চৌকীতে বসা আবার রান্নাঘরের দিকে ছোট শিশুর মত ছুটিয়া যাওয়া। এইরূপ করিতে করিতে কখন যে চৌকীর উপর শরীরটা এলাইয়া পড়িল সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। এদিকে যখন কীর্ত্তন শেষ হইল তখন কীর্ত্তনীয়াদিগকে খাওয়াইতে নিয়া দেখা গেল যে রান্নাঘরে কুকুর ঢুকিয়া সমস্ত জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভোলানাথের খুব রাগ হইল। সে তখন আমার খোঁজ করিতে লাগিল। খোঁজ করিয়া দেখে যে আমি বেহুঁশভাবে পড়িয়া আছি। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া যখন দেখিল যে আমি একেবারেই জ্ঞানশূন্য তখন আর সে কাহাকে গালাগালি দেবে? এদিকে পাশের বাড়ী যাহারা ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া খিচুড়ী ইত্যাদি রান্না করিয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে খাওয়াইয়া দিল। আমি কিন্তু সারারাত্রি বেহুঁশভাবেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না দেখিল তখন ভোলানাথ ঐ কীর্ত্তনীয়াদিগকে ডাকিয়া আবার গান শুরু করিয়া দিল। গান প্রায় বেলা তিনটা পর্য্যন্ত চলিলে আমার হুঁশ হইল। এই সময় হইতেই দেহের এই ভাবকে লোকে হিষ্টিরিয়া বলিতে লাগিল। ভোলানাথ এ শরীরের পিতামাতার নিকট চিঠি লিখিল। তাহারাও এই সংবাদ শুনিয়া খুব ব্যস্ত হইলেন। এ শরীরের

মা কিন্তু দেখা করিতে আসিল না। সে ভাবিল এই ভাব যদি ধর্ম্মপথের সহায়ক হইয়া থাকে তবে সে গিয়া ইহাতে বাধা দিয়া কি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিবে? এইসব চিন্তা করিয়া সে এই রোগের কথা শুনিয়াও আমাকে দেখিতে আসিল না। ইহার পর যখন বিদ্যাকুট হইয়া বাজিতপুরে আসা হইল (অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক কথা বাদ দিয়া যাইতেছি) তখনও ঐভাব চলিতে লাগিল। পাছে লোকে এইসব কথা জানিতে পারে সেইজন্য ভোলানাথ বিশেষ সতর্ক থাকিত, কীর্ত্তন হইলে আমাকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত না। আমি যে ছোট ঘরে থাকিতাম সেইখানেই কপাট বন্ধ করিয়া রাখা হইত। আমি ঐ ঘরের মধ্যেই গড়াগড়ি যাইতাম। কিন্তু তবুও এখানে এক দুর্নাম রটিয়া গেল যে রমনীবাবুর (ভোলানাথের) স্ত্রী কীর্ত্তনে ঢোল কাঁধে লইয়া নাচিয়াছে।

যাহা হউক এই সময় এখানকার সাব-রেজিষ্ট্রারের মাতার গুরুদেব আসিলেন। তিনি শক্তি-উপাসক ছিলেন এবং রক্তবর্ণের কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তাঁহার কাছে আমার অবস্থার কথা বলা হইলে তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ভোলানাথ আমাকে লইয়া ঐ বাসায় গেল। সেখানে একটি ঘরে আমাকে শিবঠাকুরের কাছে বসাইয়া দেওয়া হইল। বাজিতপুর আসার পর হইতেই আসন করিয়া নিত্য নাম করিতে বসা হইত। সেই সময় এই শরীরের নানাভাব হইত। কখন হয়ত বসিয়া নাম করিতেছি তখন আসনসহ আপনাআপনি পাক খাইতে লাগিলাম। আমাকে যখন ঐ শিবঠাকুরের কাছে বসান হইল তখন আপনাআপনি আসন হইয়া গিয়া শরীরের দুই একবার পাক খাওয়া হইয়া গেল। ঐ গুরুদেব ইহা লক্ষ্য করিলেন। ইহার পর তিনি লোক মারফতে আমাকে খবর দিতে লাগিলেন যে তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ এবং ইচ্ছা করিলে তিনি আমাকে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন। আমি ঐ সব কথা শুধু শুনিয়াই যাইতাম। ইহার পরের বার তিনি যখন আবার ঐ শিষ্যের বাড়ীতে আসিলেন তখন তিনি ভোলানাথকে বলিলেন যে তিনি ভোলানাথের

বাসায় আসিয়া পূজা করিবেন। ইহা শুনিয়া আমি ভোলানাথকে বলিলাম যে উনি যখন এখানে আসিয়া পূজা করিবেন তখন তাঁহার খাবার আয়োজনও ত এখানে করিতে হয়। ভোলানাথ দেখিল যে ইহা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। তখন সে তাঁহার আহারের কথা বলিয়া আসিল এবং উহার যোগাড় করিয়া দিল। কিন্তু কাছারির কাজের জন্য নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। ভোলানাথ যখন কাছারিতে চলিয়া যায় তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি ত একা রহিলাম।" ঐ গুরুদেব আসিলে আমি কি করিব ?" উত্তরে ভোলানাথ বলিল, "কি আর করিবে ? তিনি যাহা চাহিবেন তাহা দিবে এবং যাহা করিতে বলিবেন তাহা করিবে।" যদিও এ শরীর ছোট একটি বৌ ছিল, কিন্তু ভোলানাথ ইহাকে ফেলিয়া যাইতে কোনই ভয় করিত না। যখন সে মফঃস্বলে যাইত তখনও আমার কাছে কোন লোক রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিত না। ইহাতে লোকে তাহাকে মন্দ বলিত। কিন্তু ভোলানাথ আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিল যে এ শরীর নিজকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।

যাহা হউক ভোলানাথ চলিয়া গেলে ঐ গুরুদেব আসিলেন। আমিও তাঁহার পূজার যোগাড় পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি পূজা করিতে লাগিলেন। আমি রান্না করিতে লাগিলাম। তাঁহার পূজা শেষ হইলে তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি ঘোমটা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে পূজার আসনে গিয়া বসিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। কারণ আমি ভোলানাথ হইতে আদেশ পাইয়াছিলাম যে ইনি যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব। আসনে বসিলে তিনি আমাকে আচমন করিতে বলিলেন। এ শরীর ত পূজা ইত্যাদি করে নাই কাজেই আচমন কিভাবে করিতে হয় তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি চৌকীর উপর বসিয়াই উহা কিভাবে করিতে হইবে তাহা হাত দিয়া দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। এদিকে হইল কি, পূজার আসনে বসার জন্য এ শরীরের ভাব হঠাৎ বদলাইয়া গেল। তখন যেভাবে আসন হয়

ঠিকভাবে আসন হইয়া গেল। তখন আর লজ্জাসরমের ভাব নাই। হাত দিয়াও নানাভাবে ক্রিয়া হইতে লাগিল। এইসব দেখিয়া গুরুদেব ভয় পাইয়া গেলেন এবং তখনই আমাকে আসন হইতে উঠিয়া আসিতে বলিলেন। সেইজন্যই ত বলা হয় যে জিনিষ যদি খাঁটি হয় তবে ভয়ের কিছুই নাই। ইহাকে আগুনে ফেলিলেও পুড়িবে না, বাঘের মুখে দিলেও বাঘ গিলিতে পারিবে না। যাহা হউক, এই সময় ভোলানাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেব আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরের বার যখন তিনি আসিলেন সেবারও তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ভোলানাথ তাহাকে নিয়া আমার কাছে আসিল। তিনি নানা কথা বলিতে বলিতে বলিলেন যে তাহার বগলাসিদ্ধি হইয়াছে এবং আরও এক দেবতা সিদ্ধি হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে সত্যের ভাব লইয়া থাকিলে সত্যের তেজও প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ বেলাও তাহাই হইল। যেই তিনি বলিলেন যে তাঁহার বগলাসিদ্ধি হইয়াছে তখন এ শরীর তেজের সহিত বলিল— "কি, বগলাসিদ্ধি হইয়াছে ? ইহা মিথ্যা কথা।" কখন ইনি কি কি কাজ করতে গিয়া বিফল হইয়াছেন তাহা একটির পর একটি করিয়া জোরে জোরে এই মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গুরুদেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। ভোলানাথ আমাকে চুপ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। পাছে আমার কথা বাহির হইতে কেহ শোনে এইজন্য ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 'চুপ' 'চুপ' বলিলে কি হইবে? এ শরীরের যাহা হইবার তাহা হইবেই। ভোলানাথ অনেক সময় জোর জবরদস্তি করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু উহাতে ফল হইত না। তখন ঐ গুরুদেব এ শরীরের কাছে বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার বগলা সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু হয় নাই এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে কি করিতে হইবে তাহা তিনি এ শরীরের কাছে জানিতে চাহিলেন। আবার মজাও এমন, তাঁহার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে এ শরীর হইতে মন্ত্র এবং পূজার যাহা বিধি তাহা সবই বলা হইয়া গেল।

এই সময় আরও একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে তাহাও বলিয়া ফেলি। অনেক সময় এ শরীর স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। কেন যে দেওয়া হইত না তাহা ত লোকে বুঝিতে পারে না। তাহাদের সহ্য করিবার শক্তি নাই দেখিয়াই ঐ সব করা হইত। একবার হইল কি? বাজিতপুরে একটি ছেলে ছিল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু কোন সন্তান হইয়াছিল না। ইহা দেখিয়া তাহার বাবা তাহাকে আবার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল। ছেলের কিন্তু এক স্ত্রী থাকিতে আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। একদিন তাহার বাবার পীড়াপীড়ি দেখিয়া সে মনে করিল যে আমি যখন পূজা করিয়া উঠিব সে তখন আমার পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ছেলে হওয়ার প্রার্থনা মনে মনে জানাইবে। তখন কিন্তু এ শরীরের পা স্পর্শ করা নিষেধ ছিল। সে ভোলানাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে আমার পা স্পর্শ করিয়াই ঐরূপ প্রার্থনা করিবে। একদিন আমি পূজা করিয়া উঠিয়াছি, সে অমনি আসিয়া আমার পা স্পর্শ করিল। যেইমাত্র স্পর্শ করা আর অমনি পড়া। মনে মনে যে প্রার্থনা জানাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল তাহা আর হইয়া উঠিল না। এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে তাহার আর হুঁশ নাই। ভোলানাথ তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল এবং যাহাতে সে ভাল হইয়া উঠে, সেজন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ছেলেটি ছিল আমিন্ এবং ভোলানাথের বন্ধু। অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে বলিল যে সে কি আনন্দে ডুবিয়া ছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। যদিও সে ছেলে হওয়ার প্রার্থনা জানাইতে পারে নাই, তথাপি আমাকে স্পর্শ করিবার সময় উহা তাহার মনে ছিল বলিয়া পরে তাহার ছেলেপেলে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাজিতপুর আসার পর হইতেই নিত্য নাম করিবার একটি খেয়াল হইয়াছিল। যে ঘরখানায় থাকা হইত তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইত। বাহিরের সঙ্গে তাহার একটা কুটারও যেন যোগ না থাকে তাহা দেখা হইত। সন্ধ্যাবেলা বাহির

হইতে ঘরের চারিদিকে ধূপ ঘুরাইয়া লইয়া আসা হইত। কারণ ইহা যে মন্দির, এখানে বসিয়া নাম করা হয়। তখন পর্য্যন্ত কিন্তু দীক্ষা হয় নাই! যদিও প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা জপ করিতে বসা হইত উহা আর কিছুই নয় শুধু 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলা মাত্র। এই সময় শরীরের যে যে অবস্থা হইত তাহা কিন্তু নামের গুণেই প্রকাশ হইত। এই সময় একদিন ভোলানাথ আমাকে বলিল, "আমরা শাক্ত, তুমি সর্ব্বদা 'হরিবোল' 'হরিবোল' বল কেন? ইহা ত ভাল নয়।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম "তবে কি বলিতে হইবে? 'জয় শিব শঙ্কর, বম বম হর হর' বলিব? এই শরীর ত মন্ত্র ইত্যাদি কিছুই জানে না, কাজেই যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিলাম।" ইহা শুনিয়া ভোলানাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ উহাই বলিও।" ইহার পর হইতেই 'জয় শিব শঙ্কর' নাম চলিতে লাগিল। কিন্তু যখন 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতাম তখন হইতেই এ শরীরের আসন ইত্যাদি হইতে থাকিত এবং উহা ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। 'জয় শিব শঙ্কর' নাম করার সময় উহা আরও প্রবল হইল। কতরকম যে আসন হইত—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, গোমুখী আসন একের পর এক হইয়া যাইত। মজাও এমন যে নাম করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়া আসন হইয়া গেল এবং মেরুদণ্ডের দিকে হট্ হট্ শব্দ হইয়া একেবারে সোজ হইয়া বসিলাম। এ বসার মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি নাই, কোন অস্বস্তিভাব নাই। এই অবস্থায় আর শরীরকে এদিক সেদিক করা যাইত না বা নোয়ান যাইত না। মনে হইত সব যেন স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর নাম আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত এবং একটা তন্ময় ভাব আসিয়া পড়িত। এইভাব কিছুদিন চলিল। এই বিষয়ে অনেক কথা আছে। যাহা প্রকাশ করা হইবে না এবং যাহা প্রকাশ করা যায় তাহারও সব বলা যাইবে না। তাই অনেক কিছু বাদ দিয়া এখন দীক্ষার কথাই বলিতেছি।

এ শরীরের দীক্ষা হয় ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলনযাত্রা দেখিতে ঐদিন অনেকেই খাওয়াদাওয়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ভোলানাথের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া উহা টানিতেছে এবং আমি কি করিতেছি তাহা দেখিতেছে। আজ যে ভাবে আমি ঘরের মেজে লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়াছি উহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন দীক্ষা হইলে যেরূপ যজ্ঞ এবং পূজা করিতে হয় তাহা আপনাআপনিই এ শরীর হইতে হইয়া গেল। যজ্ঞস্থালী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ার। ফুল, ফল, জল ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষরূপে বর্ত্তমান, যদিও সকলে ইহা দেখিতে পাইবে না; কিন্তু উহা যে সবই সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দীক্ষামন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থালীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং ঐ দীক্ষামন্ত্রের উপর পূজা এবং আহুতি ইত্যাদি হইল। অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাহা যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তাহার পর যখন কর ঘুরাইয়া দীক্ষামন্ত্র জপ আরম্ভ হইল তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে আমি জপ করিতেছি। এ শরীর ত কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ ইহাকে উহা দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনি কর ঘুরাইয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি যে সবই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যাইতেছে। পরে শরীরের আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনাআপনিই জপ হইয়া যাইত। এইভাবে এ শরীরের দীক্ষা হইয়া গেল।

সুধীরবাবু—দীক্ষামন্ত্রের ত স্ফুরণ হইল; গুরুর কি স্ফুরণ হইল না?

মা—হাঁ, তাহাও হইল।

সুধীরবাবু—গুরু কি প্রত্যক্ষ হইল ?

মা—হাঁ, তাহাও হইলেন।

সুধীরবাবু—ঐ গুরুর একটু বর্ণনা করুন।

মা—(হাসিয়া) আমি সর্ব্বদাই বলি যে ছোটবেলায় এ শরীরের গুরু ছিলেন বাবা-মা। পরে যখন বিবাহ হইল তখন বাবা-মাই বলিয়াছিলেন স্বামী গুরু। কাজেই বিবাহের পর স্বামীই হইলেন গুরু। তাহার পর-জগতের যাহা কিছু আছে, সকলেই এ শরীরের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পার যে আত্মাই গুরু, অথবা এ শরীরই এ শরীরের গুরু। তাহা ছাড়া পূজার কথায় ত আমি বলিয়া থাকি যে যখন কোন দেবতার পূজা করা হয় তখন এ শরীর হইতেই দেবতাকে বাহির করিয়া পূজা করা হয় এবং পরে এ শরীরের সঙ্গেই মিশাইয়া দেওয়া হয়। সেইভাবে গুরু সম্বন্ধেও তোমরা অনুমান করিয়া লইতে পার। এই মাত্র বলিলাম যে দীক্ষার সময় পূজা যজ্ঞ করিতে ফুল ফল যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সমস্তই এ শরীর হইতে প্রত্যক্ষভাবে বাহির হইয়াছিল; আর গুরু কি এ শরীর হইতে বাহির হইতে পারিলেন না? এ শরীরের দীক্ষা সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা ত বলা হইল। এখন বুঝিলে ত কিভাবে দীক্ষা হইয়াছিল?

সুধীরবাবু—হাঁ, বুঝিলাম।

মা—কি বুঝিলে?

সুধীরবাবু—কিছুই বুঝিলাম না। (সকলের হাস্য)। আমি যাহা শুনিলাম তাহা চিন্তা করিয়া দেখিব। পরে আবার ঐ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব।

নেপাল দাদা (নারায়ণ স্বামী)—আচ্ছা, মন্ত্র যখন তোমার মধ্য হইতে বাহির হইত তখন কি বুঝিতে পারিতে যে উহা কোন্ দেবতার মন্ত্র?

মা—না, তবে ঐ মন্ত্র পাইলেই ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা আসিত "এ কাহার মন্ত্র?" তখন স্পষ্টভাবে ভিতর হইতে উত্তর আসিত যে উহা অমুক দেবতার মন্ত্র। সেইজন্যই ত বলা হয় যে যদি প্রকৃত জিজ্ঞাসা ভিতর হইতে উঠে তবে উহা পূর্ণ হইতে দেরী হয় না। তোমাদের ভিতরে যে চাওয়ার ভাবটাই নাই। চাহিলে কি পাইতে বিলম্ব হয়?

সুধীরবাবু—কুসুম (নির্বাণানন্দ) বলে যে আপনার সাধনা সাধনাই

নয়; কারণ আমরা সাধনা করিতে গেলে আমাদের ভিতর হইতে যে বাধাবিঘ্ন আসে, আপনার মধ্যে ত সে সবকিছুই ছিল না।

মা—তাহা হইবে কেন? এ শরীরের মধ্যে যখন সাধনার খেলা আরম্ভ হয়—তখন এ শরীর কি দশজন লইয়া থাকে নাই? ভোলানাথের এক বিরাট পরিবারের মধ্যেই এ শরীর ছিল। সকল কাজই ত এ শরীর করিয়াছে। এ শরীর যখন সাধক সাজিয়াছিল, সাধকের মধ্যে যাহা কিছু থাকা প্রয়োজন সমস্তই তখন এ শরীরে প্রকাশ হইয়াছিল। তিলক, স্বরূপ ত্রিপুণ্ড্র—সবই এ শরীরে তন্ন তন্ন করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বাজিতপুরে একজন ছিল পরে সে জজ্ হইয়াছিল। সেও দীক্ষা দিত। আমার অবস্থার কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল যে আমার কণ্ঠি ধারণ করা উচিত। ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে কণ্ঠি কি ভিতরে না বাহিরে ধারণ করিতে হয়? আমার প্রশ্ন শুনিয়া সে বলিয়াছিল যে আমার কণ্ঠি ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। আসন ইত্যাদির কথা ত আগেই বলিয়াছি। উহার এক একটা আসন সিদ্ধি করিতে কাহারও হয়ত একটা জীবনই কাটিয়া যায়। কিন্তু এ শরীরের সাধক অবস্থায় দেখা গিয়াছে যে একের পর এক করিয়া আসন মুদ্রা হইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটিই পূর্ণভাবে হইয়াছে। তোমাদের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা ত বলা হইল।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মপথে "পক্‌দণ্ডী"

১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার (ইং ২৯।৭।৪৯)

আজ আশ্রমে যাইতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। আশ্রমে গিয়া দেখি যে গঙ্গাদিদির মায়ের শ্রাদ্ধ যেখানে হইতেছে মা সেখানে গিয়াছেন। আমার আশ্রমে পৌঁছিবার একটু পরেই মা হলঘরে আসিলেন। এই সময় সদালোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীমান বিষ্ণুরাম পাণ্ডে মাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে ধর্ম্মলাভের কোন সহজ সরল পথ

আছে কি না। শ্রীমান কুসুম বিষ্ণুর একটি প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া মাকে বলিল, "আমাদের পরীক্ষার বেলায় দেখা যায় যে পাঠ্যপুস্তক সমগ্রভাবে না পড়িয়াও প্রশ্নোত্তর জাতীয় চুম্বকাকৃতি পুস্তক সকল পাঠ করিয়া যেমন পরীক্ষায় পাশ করা যায় সেইরূপ ধর্ম্মলাভের কোন সহজ এবং সংক্ষিপ্ত পথ আছে কি না?" শ্রীমান কুসুমের কথা লইয়া কিছুক্ষণ অবান্তর আলোচনা এবং হাসাহাসি হইল। পরে মা বলিলেন, "হ্যাঁ ধর্ম্মপথেও Shortcut আছে। তিনি যদি আসিয়া হাত ধরেন তবেই ধর্ম্মলাভ সহজ হইয়া যায়।"

কুসুম ব্রহ্মচারী—কি করিলে তিনি হাত ধরেন?

মা—প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। কি করিলে তিনি আমার হাত ধরিবেন—এইরূপ ব্যাকুলতা যখন আসে, তখনই তিনি আসিয়া হাত ধরেন।

কুসুম ব্রহ্মচারী—এইরূপ ব্যাকুলতাই বা আসে কিরূপে?

মা—ব্যাকুলতা আসিতে হইলে শুদ্ধভাবের কর্ম্ম নিতে হয়—কারণ কর্ম্মের মধ্যেই আমরা আছি কিনা। যেভাবে সংসারের দশটা কাজ করিয়া যাইতেছ, সেইভাবেই শুদ্ধভাবের কাজ আরম্ভ করিতে হয়। সংসারে যেসব বন্ধন আছে তাহার উপর আরও একটি বন্ধন লইতে হয়, যাহাতে বন্ধন দ্বারা বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমাদের যে 'আমি', 'আমি' ভাবটি আছে এই 'আমি'র স্থানে 'তুমি' কে আনিয়া বসাইতে হইবে এবং সর্ব্বদা তাহার সহিত যোগ রাখিবার জন্য নাম, জপ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি লইয়া থাকিতে হইবে। এইভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার প্রকাশ হইয়া পরম শান্তি ও আনন্দলাভ হইয়া যাইবে। যেটুকু কর্ম্মশক্তির সমষ্টি লইয়া এই 'আমি' সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কর্ম্মশক্তিটুকু যে মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করা হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রকাশ হইবে। এই যে কিছু করিতে পারিতেছি না, 'কিছু হয় না' বলিতেছিস ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে চলার পথে আছিস। তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা তাঁহার কৃপা ভিন্ন হয় না। এই ব্যাকুলতা, অস্থিরতা দিয়াই ত তিনি জীবকে

তাঁহার দিকে ফিরাইয়া নেন। তাহা ছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের কত কত সংস্কার আছে। তাহার জন্যও কতরকম ভোগ করিতে হইবে। খেলিতে ত ভালই লাগে; কিন্তু এই খেলিতে গিয়া গায়ে যে কত ময়লা জমিয়াছে তাহা উঠাইতে একটু লাগিবে না? কাজেই এ পথে চলিতে গেলে শুষ্কতা, অস্থিরতা আসিবেই। অবশ্য সাধনে যদি কিছু কিছু অনুভূতি পাওয়া যায় তবে চলার পথে সুবিধা হয়; কিন্তু উহার আবার অসুবিধাও আছে। কারণ পথে আনন্দ পাইলে ত ঐখানে দাঁড়াইয়া যাইবে। সেইজন্য গীতা ফলের দিকে লক্ষ্য না করিতে বলিয়াছে। সেদিনও ত বলা হইতেছিল যে কর্ম্ম করিয়া গুরুকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার কাছে উহা জমা থাকিলে একদিন তিনি ফিরাইয়া দিবেনই দিবেন। যখন তিনি দেখিবেন যে তোমাকে উহা ফিরাইয়া দিলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না তখনই তিনি উহা তোমাকে ফিরাইয়া দিবেন। তিনি ইষ্ট কিনা তাই তোমার অনিষ্ট হইতে দিবেন না। জীবনের নানারূপ কষ্টভোগ ত আছেই—উহার সহিত যখন এ জাতীয় কষ্ট আসে তখন মনে করিতে হয় যে যাহা আমাকে জন্মজন্মান্তরে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হইত, তাহা এ জীবনেই ভোগ হইয়া যাইতেছে। পথে চলিতে গেলে ছায়াশীতল স্থান ছাড়া মরুভূমি ত পড়ে। তাই মনে করিতে হয় যে এখন মরুভূমির মধ্য দিয়াই ত চলিতেছি। ইহা ত আমাকে চলিতে হইতই, এমন যে হইয়া যাইতেছে উহাই ভাল। সংসারে তাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্যও তাপ সহা চাই। উহাই তপস্যা। ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে চাই বিশ্বাস ও ধৈর্য্য।

ধ্যানের পথে বিপদের আশঙ্কা

সুধীরবাবু মিঃ পেতিতের* কথা তুলিলেন। তাঁহার যে সমাধির মত অবস্থা হয় এইসব কথা বলিলেন। উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এ প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ এ পথে আছে। রাজার মন্ত্রী থাকিয়াও মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি খায় নাই। বিবেকানন্দের পুস্তক পড়িয়া এই পথে

*ইনি ফ্রান্সদেশীয় ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া এদেশে আসেন এবং মার বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইদানীং ঐ ধ্যান করার অভ্যাস হইতেই একটা রোগের মত অবস্থা হইয়াছে। অনেক সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। অনেক সময় চলাফেরা করে, উহাও কতকটা অজ্ঞানের অবস্থায়। ধ্যান যদি সহজ স্বাভাবিকভাবে হয় তবে ত উহা খুব ভাল অবস্থা। কিন্তু তা যদি না হয় তবেই এই জাতীয় রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ধ্যানের সময় যদি সাধক বলে যে তাহার জ্ঞান থাকে না তবে উহাতেই প্রমাণ হয় যে ধ্যান স্বাভাবিক পথে চলিতেছে না এবং উহা সাধককে একটা জড়ত্বের পথে লইয়া যাইতেছে। নিজের সত্তাকে সর্ব্বদাই সজাগ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। সেদিন কথা হইতেছিল না প্রাণের গতি দুই দিকে হয়—এক হইল বাহিরের দিকে, জগতের দিকে গতি, আর এক হইল ভিতরের দিকে। প্রাণের ভিতর দিকে গতি ধ্যানের আকার লয় কিন্তু এ ধ্যান করা বড় শক্ত। যদি ধ্যানের ছোঁয়া স্বাভাবিকভাবে আসিয়া যায় তাহা হইলে ত ভালই এবং উহার ফলে সংসারের আসক্তি অনেকটা ফিকা হইয়া যায়। কিন্তু তাহা যদি না হয় তবে এই ধ্যানই একটা জড়ত্ব অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রোগের আকারে দেখা দেয়। সেইজন্য আমি সকলকে জপ করিতে বলি। উহাতে ঐ জাতীয় ভয় অনেক কম এবং উহাই একসময় সাধককে সহজ ধ্যানের দিকে লইয়া যায়। জপের ফল যে কখনও খারাপ হয় না এ কথা বলা যায় না। তবে উহার আশঙ্কা কম। জপধ্যানও একত্র চলিতে পারে এবং জপ সঙ্গে থাকে বলিয়া জড়ত্ব আসার সম্ভাবনা কম।"

এইসব কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীমায়ের আহার্য্য প্রস্তুত উহা জানাইতে শ্রীমতী বুনী আসিয়া রোজকার মত হাজির হইল। মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাস্তবিক সঙ্গ কাহাকে বলে

১৪ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ৩০।৭।৪৯)।

আজ কথায় কথায় শ্রীমতী ভ্রমরের কথা উঠিল। প্রথমে ভ্রমরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে সে সংসারী না হইয়া ব্রহ্মচারিণীর

জীবন যাপন করিবে; কিন্তু পরে তাহার বিবাহ এবং সন্তানাদি হয়। শেষে যক্ষ্মারোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। সংসার আশ্রমে থাকিয়া সে মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চিঠি লিখিত। সেইসব কথা মা আজ বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "ভ্রমর একবার লিখিয়াছিল যে লোকে যেরূপ পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যায় সেও সেইরূপ জীবনের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়ে, স্বামী সকলকে ভালবাসিলেও মিছরির টুক্‌রার মত তাহার হৃদয়ে একটু স্থান আছে সেখানে সে আর কাহাকেও বসায় নাই।" অর্থাৎ সে এখন সংসারী হইলেও সে মাকে একেবারে ভুলিয়া যায় নাই। শ্রীমান কুসুম বলিতেছিল—ভ্রমর যদি ব্রহ্মচারিণীর জীবন ত্যাগ না করিত তবে তাহার অনেক উন্নতি হইত। ভ্রমরের কথা উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীমা একটি প্রশ্ন আমাদিগকে করিলেন। প্রশ্নটি হইল এই—একজন সর্ব্বদা ঠাকুরের সেবা করিতেছে, ঠাকুরের জন্য রান্না, ঠাকুরের ভোজন, শয়ন ইত্যাদি নিয়াই ব্যস্ত আছে; আর একজন সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছে—এই দুইজনের মধ্যে কে ঠাকুরের কাছে বেশী আছে? আমাদের অধিকাংশের উত্তর হইল—যে, সর্ব্বদা ঠাকুরের সেবা নিয়া আছে সে-ই ঠাকুরের কাছে বেশী আছে। মা বলিলেন, "যে কায়মনবাক্যে ঠাকুরের কাছে থাকে সে-ই ঠাকুরের কাছে বেশী থাকে। একজন হয়ত মন দ্বারা ঠাকুরের সঙ্গ করে আর একজন শরীর দ্বারা সঙ্গ করে। এই দুইজনের সঙ্গই প্রায় একরূপ। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া ঠাকুরকে নিয়া বসিয়া থাকার মধ্যে সংযম আছে। আবার ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকার লোভ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার কাজ লইয়া থাকাও সংযমের দরকার। তবে এমন যদি কেহ থাকে যে স্বভাবতঃই কুঁড়ে এবং তাহার বসিয়া থাকাই ভাল লাগে, এ হেন লোক ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকিয়া ঠাকুরের সঙ্গগুণ কিছুটা পায় সত্য কিন্তু পূর্ব্বে যে দুইজনের কথা বলা হইল তাহাদের চেয়ে এ ঠাকুরের কাছে থাকার ফলটা অনেক কম পায়। কিন্তু যে শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা ঠাকুরের সঙ্গ করে' সে-ই প্রকৃত সঙ্গ করে।"

কুসুম—ভ্রমর সংসার না করিয়া যদি তোমার কাছে থাকিত তবে তাহার কি বেশী মঙ্গল হইত না?

মা—তাহার সংসার না করিবার উপায় ছিল না এবং তুই কি করিয়া জানিস যে তাহার সংসার করিয়া মঙ্গল হয় নাই? যে যাহা করিতে বাধ্য হয় তাহাই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

অভিনয়ে গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ কিনা
১৫ই শ্রাবণ, রবিবার (ইং ৩১।৭।৪৯)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে মা তখনও হলঘরে আসেন নাই। নেপাল দাদার (নারায়ণ স্বামী) ঘরের সম্মুখে বসিয়া আছেন। আমি ঐখানে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মা শ্রীমান্ ভূপেন প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। কথা হইতেছিল যে লীলা বা অভিনয় করার সময় গৈরিক বস্ত্র পরা ভাল কিনা। ইতিপূর্বে কান্তিভাই ও শ্রীমান বিভূ ব্রহ্মচারী লীলার সময় গৈরিকবর্ণের চাদর ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া মা তাহাদিগকে উহা আর ছাড়িতে দেন নাই। গতকল্য যে লীলা হইয়াছিল তাহাতেও এই গৈরিক বস্ত্রের ব্যবহার করা নিয়া ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছে। আজ মা বোধহয় উহা উপলক্ষ্য করিয়াই কথা বলিতেছিলেন। শ্রীমান্ ভূপেন বলিতেছিল যে অভিনয়ের সময় গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার বিশেষ দূষণীয় নয়। কারণ যিনি ঐ সময় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সাধুর অভিনয় করেন তিনি অল্প সময়ের জন্যও নিজকে নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করেন। ইহা তাহার আত্মোন্নতির পক্ষে সহায়কই। মা বলিলেন, "ঐ ভাব তোমার থাকিতে পারে। তবে এ শরীরের কথা হইল এই যে গৈরিক বস্ত্র ভগবানের বস্ত্র। সর্ব্বাবস্থায় ইহার সম্মান রক্ষা করা উচিত। কাজেই এ বস্ত্র পরিয়া হাসি ঠাট্টা বা মিথ্যাচার প্রভৃতি অভিনয়ের ছলেও করা উচিত নয়। তবে লীলার সময় সাধু সাজিতে হইলে রংয়ের কাপড় পরিলেও চলিতে পারে। এ শরীরের যাহা খেয়াল আসিতেছে তাহা বলা হইতেছে।"

একটু পরেই মা হলঘরে গেলেন। সেখানে শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কাকে

(আত্মানন্দ) নিয়া অনেকক্ষণ কৌতুক করিলেন। ইহারা যে দেশের লোক সেখানে সকলেরই সমান অধিকার। ছুৎমার্গ বলিয়া তাহাদের দেশে কিছু নাই। আহার-বিহারে সমভাবে ব্যবহার পাওয়াই তাহাদের সংস্কার; কিন্তু কাশীর আশ্রমে নিষ্ঠার ভাবটা প্রবল। এখানে একজন মেয়ের পক্ষে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ নাই বলিলেই হয়। এইজন্যই শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কার আন্তরিক কষ্ট। সে ইহা সহ্য করিতে পারে না আবার মাকে ছাড়িয়াও যাইতে পারে না। মা এমনভাবে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন যে দেখিয়া মনে হইল তাহার দুঃখকষ্ট অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

মায়ের খেয়াল

এই সময় শ্রীমান্ কুসুম মাকে প্রশ্ন করিল, "মা, তোমার খেয়ালে যদি পাকা না হয় তাহা হইলে আমরা তোমাকে অনুরোধ করিয়া উহা বদলাইতে পারি কি?"

মা—একেবারেই নয়।

কুসুম ব্রহ্মচারী—তবে যে তুমি কখনও কোন কাজ করিতে বলিয়া পরে আমাদের অনুরোধে উহা বদলাইয়া দেও?

মা—আমার খেয়াল ঐরূপ থাকে বলিয়াই বদলাইয়া দেই, তাহা না হইলে কাহারও কথার জন্য এ শরীর হইতে যে কিছু করা হয় তাহা নয়।

কুসুম ব্রহ্মচারী—আমাদিগকে যে অনেক সময় বল, "আমাকে খেয়াল করাইয়া দিস্"—ইহারই বা অর্থ কি?

মা তখন অনেককেই খেয়াল করাইয়া দেওয়ার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উদাহরণস্বরূপ মা বলিলেন, "একজনকে বলিলাম যে আমাকে ১০টার সময় ঐখানে ডাকিয়া নিয়া যাস্।" ১০টা বাজিল যাহাকে ডাকিয়া নিতে বলিয়াছিলাম সে আসিল না বলিয়া যাওয়া হইল না। এখানে এমন কথা নয় যে ভুলের জন্য যাওয়া হইল না। আবার অনেক সময় যাহাকে ঐ কথা বলা হইয়াছিল সে না আসিলেও ১০টা বাজা মাত্র যেখানে যাওয়ার সেখানে রওনা হইয়া গেলাম।

অনেক সময় বলা হয় যে গানের পদগুলি আমার খেয়ালে আনিয়া দিস্ তাহা না হইলে হয়ত গান গাহিতে পারিব না। মজাও এমন গান করিতে করিতে দেখিতেছি যে গানের পদগুলি জ্বলজ্বল করিয়া আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে কিন্তু তবুও যতক্ষণ অন্যে ঐ পদ না বলিয়া দেয় ততক্ষণ উহা গাহিতে পারি না। এখানেও দেখিতেছ যে ভুলের সঙ্গে খেয়াল করিয়া দেওয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। এখন বল ত খেয়াল করিয়া দেওয়ার অর্থ কি?

আমি—তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা যুক্ত করার নামই তোমার খেয়াল করাইয়া দেওয়া।

মা—তুমি এভাবে অর্থ করিলে।

আরও দুই একজনকে মা ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে শ্রীমান্ কুসুম মাকে খেয়াল করাইয়া দেওয়ার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। মা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাবাজী ত বলিলই যে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা যুক্ত করিয়া দেওয়াই খেয়াল করাইয়া দেওয়া। তোমাদের যখন আলাদা জ্ঞান আছে, এ শরীর হইতে যখন তোমরা নিজকে আলাদা জ্ঞান কর তখন ত দুইটি আলাদা জিনিষের যোগ হইতেই পারে।

কুসুম ব্রহ্মচারী—খেয়াল অর্থ কি?

মা—এ প্রশ্ন ত করা হয় নাই। খেয়াল করাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন হইয়াছিল।

কুসুম ব্রহ্মচারী—এখন প্রশ্ন করিলাম।

মা—খেয়াল হইলে উত্তর দিব। (সকলের হাস্য)

স্বামী শঙ্করানন্দ—এই খেয়াল বুঝান বড় শক্ত। আমরা মন বুদ্ধির মধ্যে আছি কিনা কাজেই মন বুদ্ধির অতীত অবস্থা কি করিয়া বুঝিব?

বাটুদাদা—সেইজন্যই উপনিষদে বলিয়াছে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ বাক্য মন দ্বারা উহা বুঝা যায় না।

কুসুম ব্রহ্মচারী—যদি বুঝাই না যায় তবে আরও কথা বলা কেন?

মা—ও বলিয়া তোদের বুঝাইয়া দিলেও যে উহা বুঝা যায় না। (সকলের হাস্য) তোমরা সব কিছু মন বুদ্ধি দিয়া বোঝ বলিয়া একটা অভিমান আছে না? তাই উপনিষদে তোমাদিগকে বুঝাইতেছে যে যাহা দিয়া তোমরা বোঝ উহা দিয়া বুঝিবে না।

কুসুম ব্রহ্মচারী—মন বুদ্ধি নাই অথচ বুঝা হইতেছে এই বা কেমন?

মা—হাঁ, এরূপও হয়। মন বুদ্ধি না থাকিলেও বুঝা যায়। যেমন তোমাদের শাস্ত্রে বলে চোখ নাই তবুও দেখে, পা নাই তবু চলে ইত্যাদি। আজ এ বিষয়ের আলোচনার সময় নাই। ১২টা বোধ হয় বাজিয়াছে। বাস্তবিক দেখা গেল যে ১২টা বাজিবার অল্পই বাকি আছে। মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

জপ করার বিধি

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার (ইং ১।৮।৪৯)

আজ ১০টার সময় আশ্রমের হলঘরে যাওয়ার একটু পরেই শ্রীশ্রীমা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় বাটুদাদা বলিলেন যে তিনি এককালে ত্রাটক-সাধন করিতেন; কিন্তু উহা করিলে চোখের যন্ত্রণা হয় দেখিয়া উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি আবার ত্রাটক-সাধনা আরম্ভ করিবেন কি?

মা—সকল পথ সকলের জন্য নয়। সকল সাধনার উদ্দেশ্যই হইল মন স্থির করা, এক লক্ষ্য হওয়া। তাহা ত্রাটক দ্বারাই হউক, কি মনমালা, জপমালা অথবা করমালা দ্বারাই হউক। অর্থাৎ শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিয়াই হউক বা মালা বা করের সাহায্যে জপ করিয়াই হউক। তোমাদের বহু অগ্র আছে কিনা তাই একাগ্র হইতে হইবে। একাগ্র হইলে কি হইবে? না গাছের মূল প্রকাশ হইবে, অর্থাৎ গাছের যে কোন অংশ লইয়া একাগ্র হইলেই উহা

মূলে পৌঁছাইয়া দিবে। ত্রাটক-সাধনা করিলে উহা বেশ বুঝা যায়। কোন একটা বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখার অভ্যাস হইলেই ঐ স্থানে জ্যোতির প্রকাশ হয়। মালা জপ অথবা করে জপ করিলেও এইরূপ হইয়া থাকে।

আমি—করে জপ করিতে হইলে নাকি উহা ঢাকিয়া রাখিতে হয়?

মা—হাঁ, সকলের সম্মুখে জপ করিতে লজ্জা, সঙ্কোচ ইত্যাদি আসে। আবার ইহা নিয়া অন্যে ঠাট্টাও করিতে পারে। সেইজন্য গোপনেই জপ করা ভাল।

কুসুম ব্রহ্মচারী—একা একা জপ করিলে ত আর ঢাকিবার প্রয়োজন হয় না?

আমি—অনেক অশরীরী আত্মা আছে যাহারা হাত ঢাকিয়া জপ না করিলে জপের ফল লইয়া যায়।

কুসুম ব্রহ্মচারী—হাত ঢাকিয়া জপ করিলেই কি ঐ সব আত্মা জপের ফল নিতে পারিবেন না?

মা—হাত ঢাকিয়া জপ করিলে আবরণের জন্য জপের ফল লওয়া যায় না। হাত ঢাকিলে একটা ভাবও থাকে যে জপের ফল যেন অন্যে না লয়। এই ভাবটাই ঐ সব আত্মাদিগকে বাধা দেয়। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে আছে যে শরীরের কোন্ কোন্ স্থান স্পর্শ করিয়া জপ করিলে জপের ফল অন্যে নিতে পারে না। তবে কিছুটা ফল যে অন্যে পায় না এমন নহে। ভাগবত পাঠ সম্বন্ধে বলা হয় না যে, যেখানে পাঠ করা হয় সেই স্থান, শ্রোতা, পাঠক এবং ঐখানকার বায়ুমন্ডল সকলেই ভাগবত পাঠের ফল কিছুটা পায়। আবার যদি অন্য দিক হইতে দেখ তবে বলা যায় যে, যে সব আত্মা জপের ফল লইতে আসে তাহারা কে? তাহারাও ত তুমিই। সমগ্র লইয়াই ত তুমি। এইভাবে দেখিলে বলা যায় যে, যে কেহ জপের ফল লউক না কেন উহা তোমাতেই আসিতেছে।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

আজ সিদ্ধিমাতার মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনা করা হইবে। সেই উপলক্ষ্যে মাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন। স্বামী পরমানন্দকে পূর্ব্বাহ্নেই ১০্ টাকার ফল আনিতে মা বলিয়াছিলেন। ঐ ফল সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী বাক্

বিকালে কাশীখণ্ড পাঠের পর চারিদিক অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিল। সেইজন্য আজ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হলঘরেই হইল। এই কীর্ত্তনের সময় একজন সাধু আসিলেন। তিনি নাকি নাগুয়াতে এক নৌকায় ১৪ বৎসর আছেন। ফল এবং দুধ ব্যতীত কিছু আহার করেন না। আমাদের কীর্ত্তন শেষ হইলে যখন মৌন আরম্ভ হইল তখন ঐ সাধুটি নানাভাবে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলেন, পরে মুখ বন্ধ করিয়া একরূপ শব্দ করিয়া নাম করিলেন। উহা মুখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট বুঝা গেল। ইহার পর মুখ বন্ধ করিয়া যেভাবে নাম করিলেন তাহাতে নাম স্পষ্ট বুঝা গেল না। শেষে নিঃশব্দে শ্বাসের সঙ্গে নাম করিলেন। তিনি যখন এইরূপ করিতেছিলেন তখন শ্রীশ্রীমা বাটুদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমাদের পরাবাক্, পশ্যন্তীবাক্ ইত্যাদি কি সব আছে না? ইনি ইহাই নাম করিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ হইতেছে না। যদি বাক্ ঠিক্ ঠিক্ হইত তবে উহার প্রকাশটা অন্যরূপ হইত এবং ইনিও বদলাইয়া যাইতেন।"

সাধুটি চলিয়া গেলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ইনি পরাবাক্, পশ্যন্তীবাক্ কিভাবে দেখাইলেন?"

মা—যখন ইনি উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলেন, উহা হইল বৈখরী। পরে যখন মুখ বন্ধ করিয়া স্পষ্টভাবে নাম করিলেন, উহা হইল মধ্যমা। মুখ বন্ধ করিয়া অস্পষ্টভাবে নাম হইল পশ্যন্তী আর শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়া পরাবাক্ দেখান হইল। কিন্তু ইহা কিছুই হইল না শুধু একটা দর্শন হইল মাত্র। চেষ্টা করা একরকম, আর হওয়া অন্যরকম।

মন অর্থই মানিয়া লওয়া

ইহার পর অন্যান্য কথা হইল লাগিল। বাটুদাদা একসময় বুকের উপর পাথর রাখিতেন সেইসব আলাপ হইতে লাগিল। রামমূর্ত্তির কথাও উঠিল। বুকের উপর এইরূপ বোঝা রাখা যে অনেকটা শ্বাসক্রিয়ার সঙ্কেত জানার উপর নির্ভর করে তাহা বাটুদাদা বলিলেন! ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "দেখ, যে শ্বাস ভগবানে লাগাইতে হয় তাহা কিনা পাথরে লাগান হইতেছে। স্বভাবের দিকে না গেলেই অভাবের দিকে যাইতে হয়। আবার মজাও এমন যতই অভাবের দিকে যাইবে ততই নূতন নূতন অভাব জাগিবে। ইহাই অভাবের স্বভাব। একখানা কোঠা করিলে দুইদিন পর শুইবার জন্য একখানা খাট করিতে ইচ্ছা হইল। খাট হইলে বসিবার জন্য একখানা চেয়ারের দরকার পড়িল। বসার বন্দোবস্ত হইলে লিখিবার জন্য টেবিলের দরকার পড়িল, জিনিষ রাখিবার জন্য আলমারির দরকার হইল। জিনিষ যখন বেশী হইল তখন আবার উহা রাখিবার জন্য একখানা কোঠার দরকার পড়িল। এইভাবে অভাব বাড়িয়াই চলিল। এই অভাবের পথে চলার অর্থ হইল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা। অর্থাৎ ভগবানের দিকে না গেলেই মৃত্যুর দিকে যাইতে হয়। মৃত্যুকে ডাকিয়া আনাও যা আত্মঘাতী হওয়াও তাই। বাসনা বাড়াইয়া যাওয়ার অর্থই হইল বারবার জন্মগ্রহণ করা। জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

একটি ভদ্রলোক—মৃত্যু হইলে যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা মানিব কেন?

মা—জন্ম থাকিলেই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু থাকিলেই জন্ম আছে। আসল জিনিষ ত জন্ম মৃত্যুর বাহিরে। আচ্ছা তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তুমি ত শিশু ছিলে, নয় কি ?

ভদ্রলোক—হাঁ।

মা—এখন ত আর শিশু নয়, কাজেই বলিতে হইবে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ইহা ত আর বিশ্বাসের কথা নয়। ইহা প্রত্যক্ষ। তুমি

বলিতেছ যে তুমি মানিবে কেন? তুমি যে মানিতে বাধ্য। কারণ তোমরা মনের অধীনে আছ। মন অর্থই হইল মানিয়া লওয়া। আমার ত শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাই এইভাবে এলোমেলো বলি। মনের ধর্ম্মই হইল মানিয়া লওয়া। আবার মজাও এমন যে আমাদের মধ্যে নানা অবস্থা আছে, যেমন বিশ্বাসের অবস্থা, মানিয়া লওয়ার অবস্থা। অনেক অবস্থা আছে যখন বিশ্বাস করিতেই হয়। বিশ্বাসকে আমি অন্ধ বলি। ছোটোবেলায় যখন তোমরা ক, খ শিখ তখন ত অন্ধের মত তোমরা বিশ্বাস করিয়া লও এবং উহা লও বলিয়াই লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হও, অর্থ উপার্জন কর। সেইরূপ মানিবারও অবস্থা আছে। এই যে বলিতেছ 'আমি ইহা মানিব না', ইহাও কিন্তু একরূপ মানা। মানা এবং না মানা সবই মনের অবস্থা। তাই বলিতেছিলাম যে মন থাকিলেই মানিতে হইবে। কাজেই তাহাই মানা উচিত যাহা হইতে মনের বাহিরে, মানা না মানার বাহিরে যাইতে পারা যায়। ভগবানকে মানিয়া চলিলে অর্থাৎ ভগবানের দিকে মন লাগাইলে একদিন সকল তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন আর মানা না মানা থাকে না।

এই কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ১০।।টা বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

সায়ং সন্ধ্যা বাদ দেওয়া যায় কিনা

১৭ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ২/৮/৪৯)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে হলঘরে পাইলাম। মা আমাকে বলিলেন, "শোভন এবং তাহার এক ভক্তের নিকট চিঠি লেখা হইয়াছে। তুমি একবার উহা দেখিও। যদি মনে কর যে কিছু বদলান দরকার তবে তাহা বদলাইয়া দিও।" ইহার পর ডাঃ পান্নালাল আসিলেন। তিনি একখানা পুস্তক লইয়া আসিলেন। উহাতে নাকি উড়িয়াবাবার উপদেশসমূহ আছে। তিনি ঐ বই হইতে কিছু কিছু মাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এক জায়গায় উড়িয়াবাবা বলিতেছেন যে সায়ংসন্ধ্যা করিতেই হইবে। ঐ সময় কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া সন্ধ্যা বাদ দেওয়া

চলিবে না। ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ কথা ঠিক কিনা। মা বাটুদাদাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। বাটুদাদা বলিলেন যে সন্ধ্যা বেদের বিধান ইহা অবশ্যই করণীয়। মা বলিলেন, "গুরু যদি বাড়ীতে আসেন এবং শিষ্য যদি সন্ধ্যায় তাঁহার সেবা করিতে থাকে তবে অবশ্য তখন সন্ধ্যা না করিয়া পরে করিলে চলে। কারণ সন্ধ্যা হইতে গুরুর সেবা শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া অনেকের এইরূপ ভাবও আছে যে গুরু যদি বাড়ীতে আসেন তবে সন্ধ্যা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যাঁহার জন্য সন্ধ্যা করা তিনিই যখন সশরীরে উপস্থিত তখন আর সন্ধ্যার প্রয়োজন কি ? অবশ্য গুরু যদি সন্ধ্যা ইত্যাদি করিতে বলেন তখন উহা করিতেই হইবে।"

কীর্ত্তনে ভাবের অভিনয় করা উচিত নহে

ডাঃ পান্নালাল আবার ঐ পুস্তক হইতে পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে উড়িয়াবাবা বলিতেছেন যে ভাব না হইলে কীর্ত্তনে নৃত্য করা কি ভাবের কোন অভিনয় করা উচিত নয়। ইহা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, "তুমি বলিয়াছ যে কীর্ত্তনের সময় হাত তুলিয়া কীর্ত্তন করা ভাল, উহাতে নাকি গ্রন্থি খোলার সুবিধা হয়। যদি হাত তুলিলে গ্রন্থি খোলার সুবিধা হয় তবে দুই একটি লাফ দিলেও তা উহা হইতে পারে।" (সকলের হাস্য)

মা—(হাসিয়া) আমি যে ঐ কথা বলিয়াছিলাম তাহার কারণ আমি অনেককে কীর্ত্তনে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ঐরূপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই বলিয়াছিলাম যে যখন ভগবানের নাম করিতে আসিয়াছ তখন দেহ মন দিয়াই নাম করিতে হয়। তাহা ছাড়া উড়িয়াবাবা যাহা বলিয়াছেন তাহা ত সত্যই। লোক দেখাইবার জন্য কীর্ত্তনে ভাব করা ভাল নয়। উহাতে ক্ষতিই হয়।

ভগবৎ প্রেম প্রারব্ধ সাপেক্ষ কিনা

১৮ই শ্রাবণ, বুধবার (ইং ৩/৮/৪৯)

আজ সকালবেলা দেবশঙ্করবাবু, ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি হলঘরে

উপস্থিত ছিলেন। দেবশঙ্করবাবু মাকে প্রশ্ন করিলেন, ভগবৎ প্রেম প্রারব্ধ সাপেক্ষ কিনা। শ্রীশ্রীমা স্বামী শঙ্করানন্দকে এই প্রশ্নের জবাব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জটিলতা ও দ্রুততায় প্রশ্নটি আলোচনা করিয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে মার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভগবৎ প্রেম প্রারব্ধ বা কর্ম্ম সাপেক্ষ কিনা ইহার উত্তর ভিন্ন ভিন্ন পথের সাধক ভিন্ন ভিন্নভাবে দিয়া থাকেন। যাহারা ভক্ত তাহারা বলিবেন যে ভগবানের কৃপাতেই ভগবৎ প্রেম লাভ হয়। যাহারা কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলের উপর বিশ্বাস রাখেন তাহারা বলিবেন কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মফল পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক এমন একটি অবস্থা আছে যখন মনে হয় যে কর্ম্ম দ্বারাই সব হয়। এ অবস্থাতে কৃপা বা অন্য কিছু মানিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। কর, পাও এই হইবে তাহাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু এইভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে এক সময়ে কর্ম্মের মূল কি? কর্ম্ম কি? কর্ম্মফলদাতাই বা কে? এইসব প্রশ্ন মনে জাগে এবং উহার উত্তরও মিলিয়া যায়। ভক্ত যেমন সমস্তই কৃপা সাপেক্ষ বলিয়া ধরিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে উহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারে সেইরূপ কর্ম্মীও পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে শেষে কর্ম্মের মূল কোথায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যভাবে দেখিলে দেখা যায় যে এই যে ভগবান লাভের কর্ম্ম করা (কারণ কর্ম্ম বলিতে আমরা এই জাতীয় কর্ম্মের কথাই বলিতেছি) ইহাও ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। যদি এইসব কর্ম্ম করিবার জন্য আমরা গুরু বা শাস্ত্র মানিয়া লই তবে ত কৃপারই আশ্রয়গ্রহণ করা হইল। কাহারও অধীনতা স্বীকার করার অর্থই হইল তাহার কৃপা মানিয়া লওয়া। আর যদি গুরু বা শাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া এই পথে চলা যায় তবে তাহা হইলেও শুভকর্ম্মের চিত্তশুদ্ধির ফলে কর্ম্ম কি এবং উহার ফলদাতা কে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আপনা-আপনি মনে জাগে। অর্থাৎ ভগবানই প্রশ্নরূপে সাধকের মনে উদিত হন এবং প্রশ্নের সমাধান করিয়া

সাধককে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় লইয়া যান।"

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী—প্রশ্ন না করিয়াও তৃপ্তিলাভ হইতে পারে। যেমন এখানে অনেকেই আপনাকে প্রশ্ন করে না; কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করে।

মা—প্রশ্ন মুখে না করিলেও ভিতরে ভিতরে প্রশ্ন থাকে এবং উহা থাকে বলিয়াই উহার সমাধান শুনিয়া তৃপ্তিলাভ বোধ করে। ক্ষুধাই যদি না থাকে তবে আহারের তৃপ্তি কোথায় ? তবে কাহারও এমন হইতে পারে যে ভিতরে তেমনভাবে প্রশ্ন জাগে নাই অথচ প্রত্যহই সদালোচনা শুনা হইতেছে। ইহার ফলে তাহার দ্বন্দ্বের ভাব আরও বেশী হইয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং এই দ্বন্দ্বই বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করিয়া উহার সমাধানের পথ দেখাইয়া দিবে। যেমন কাহারও তেমন ক্ষুধা নাই কিন্তু সে যদি আহার করিয়াই যায় উহার ফলে ক্ষুধা বৃদ্ধি ত হয়ই না বরং অক্ষুধায় খাইয়া পেটের অসুখ বিষমভাবে হয়। অসুখ ঐরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিলেই সকলের দৃষ্টি ঐ অসুখের উপর পড়ে এবং তখন তাহার চিকিৎসা ভালভাবে আরম্ভ হয় এবং উহার ফলেই সে আরোগ্য লাভ করে। ইহাই হইল সৎসঙ্গের গুণ। যদি কাহারও আধ্যাত্মিক পথে চলিবার তেমন আগ্রহ না থাকে তবে সৎসঙ্গের প্র ভাবে ঐ পথে চলিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে এবং উহার ফলে তাহার নিজের স্বরূপের জ্ঞানও কালক্রমে লাভ হয়। এইসব কথা হইতে হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। আমরা মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিকালবেলা পাঠের পর শ্রীশ্রীমা কামাচ্ছায় এক বাড়ীতে গেলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকীৰ্ত্তন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মা কিছুক্ষণ চত্বরে বেড়াইয়া শেষে আসন গ্রহণ করিলেন। একটু পরেই মৌনের ঘণ্টা পড়িল। আশ্রমের উপরের বড় আলোটা নিভাইয়া দেওয়া হইল। আশ্রমের কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল। আকাশে দশমীর চাঁদ খণ্ডমেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছে। হু হু শব্দে বাতাস বহিতেছে। বর্ষার কুলপ্লাবনী গঙ্গা

বায়ুতাড়িত হইয়া অজগর সর্পের মত গর্জ্জন করিতে করিতে তীরবর্ত্তী সৌধমালার প্রস্তর গাত্রের উপর ঝাপাইয়া পড়িতেছে। সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিরাট্ চঞ্চল জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। আর উহার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শুনিলে উহাকে সমুদ্র বলিয়াই ভ্রম হয়। আশ্রমের চত্বরের উপরে মাকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। দেখিয়া মনে হয় ইহারা যেন ভবার্ণবের কাণ্ডারীকে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া কোন জ্যোতির্ম্ময় লোকের দিকে অভিযান করিতেছে। মাকে যে সব মালা পরান হয়েছিল উহা মায়ের সম্মুখে ইতস্ততঃ ছড়ান আছে। মা ঐ পুষ্পাসনে বসিয়া ইষৎ দুলিতেছিলেন। এইভাবে ১৫ মিনিট কাটিয়া গেল। মৌনভঙ্গের ঘণ্টা গুরুগম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল। শ্রীমান ভূপেন কোমলকণ্ঠে গান ধরিল—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম
শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম।"

ইহা মৌনভঙ্গের সূচনা। আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। কলকোলাহলে আশ্রমখানি আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। মাও আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। কাশীধাম, গঙ্গাবক্ষে, শান্ত-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে প্রতি রজনীতেই শ্রীশ্রীমাকে পুরোভাগে রাখিয়া আমাদের ধ্যান চলিতেছে। ইহার যে একটা সাময়িক মাদকতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৯শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার (ইং ৪/৮/৪৯)

আজ বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে নীচেই পাইলাম। আমি সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদার ঘরে গিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন সময় পাশের ঘর হইতে শ্রীশ্রীমা ঐ ঘরে আসিলেন। সাধনদাদাকে দেখিয়া বলিলেন, "আজ ত ভালই আছ। গতকাল রাত্রিতে তোমাকে কদমফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল। উহার সুগন্ধেই বুঝি তোমার শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে?"

খুকুনীদিদি—ভাল কবিরার জন্যই কি ঐ মালা দিয়াছিলে।

মা হাসিতে লাগিলেন। ইহার একটু পরেই মা হলঘরে গিয়া বসিলেন। দেবশঙ্করবাবু, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি হলঘরে উপস্থিত ছিলেন। আজ মাই সর্ব্বপ্রথম কথা উঠাইলেন। মা বাটুদাদাকে বলিলেন, "এমনও দেখিয়াছি যে ৫/৭ জনে যজ্ঞ করিতে বসিয়াছে; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজনই মন্ত্র বলিতেছে, বাকি যাহারা আছে তাহারা শুধু 'স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিতেছে।"

বাটুদাদা—হাঁ, এইভাবেই এদিকে বেশীর ভাগ যজ্ঞ করা হয়।

মা—এই আশ্রমে যজ্ঞ করিতেও একজনকে বিশেষভাবে গায়ত্রী মন্ত্রজপ করিতে রাখিলে পার, তাহা হইলে ছেলেপেলেরা যাহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতেছে, তাহাদের যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয় তবে ঐ মন্ত্রজপ হইতে তাহা কাটিয়া যাইবে। এখানে অবশ্য যাহারা যতবার আহুতি দেয় পরে তাহাদিগকে ততবার জপ করিতে হয়। এই জপের ফল তাহারা ব্যক্তিগতভাবে পায়। যজ্ঞে আহুতি দিয়াও অবশ্য তাহারা ফল পাইতেছে, কিন্তু ঐ ফল ষোল আনা তাহারা পায় না, অংশমাত্র পায়। তাহারা যে আলাদাভাবে জপ করে ঐ জপের ফল তাহারা ষোল আনাই পায়।

জপের সময় এবং জপ করার বিধি

কুসুম ব্রহ্মচারী—এই যে গায়ত্রী জপ করিতে হয়, তাহা কিভাবে হয়? শ্রীশ্রীমা বাটুদাদাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন।

বাটুদাদা—মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণই জপ।

কুসুম ব্রহ্মচারী—আমি শুনিয়াছি যে গুরু মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যাইতেছেন আমি শুধু শুনিয়া যাইতেছি এই ভাবটি মনে রাখিয়া মন্ত্র শুনিয়া যাওয়াই জপ।

বাটুদাদা—উহা এক প্রকার সাধনা হইতে পারে, কিন্তু উহা জপ নয়। মন্ত্রার্থ স্মরণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণই জপ।

ইহার পর সন্ধ্যা করিবার সময়ের কথা উঠিল। বাটুদাদা বলিলেন, "সন্ধ্যা করিবার তিনটি সময়—প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর এবং সায়ংকাল।"

মা—প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যাবেলা এগুলি সন্ধ্যার সময়

বলিয়া যেমন সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ মধ্যরাত্রিও ঐরূপ সন্ধির সময় বলিয়া সন্ধ্যার ব্যবস্থা আছে। আবার প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্নের মাঝের সময় সন্ধির সময় বলিয়া তখনও সন্ধ্যা চলিতে পারে। এইভাবে ভাগ করিলে দিনে ও রাত্রিতে মোট আটটি সন্ধ্যার সময় পাওয়া যায়।

বাটুদাদা—আমাদের শাস্ত্রেও সন্ধ্যার সময় আট ভাগে ভাগ করা আছে এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

মা—তাই নাকি? এ শরীরের ত শাস্ত্রজ্ঞান নাই কাজেই এলোমেলোভাবে যাহা এ শরীরের কাছে উপস্থিত হয় তাহাই বলিয়া দেওয়া হয়। যাক্ সে কথা। এই যে আট ভাগে ভাগ করিয়া সন্ধ্যার ক্ষণ বলা হইল ইহার প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ক্ষণের যে বিশেষ শক্তি আছে তাহা ত তোমাদের শাস্ত্রীয় বিধি হইতেও বুঝিতে পার; যেমন কোন যোগের সময় গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা। এখানেও কিন্তু ঐ ক্ষণ বা সময়ের কথা আসিয়া পড়ে। যদি ক্ষণ ধরিয়া ঠিক ঠিকভাবে জপ করিয়া যাওয়া যায় তবে এসব ক্ষণের শক্তি সাধকের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে আটটি সন্ধিক্ষণ বলা হইল, এগুলিকে শক্তির কেন্দ্র হিসাবে ধরা হইয়াছে। তাহা না হইলে সকল সময়েরই একটি বিশেষ শক্তি আছে। এই আটটি কেন্দ্রের যে কোনটি হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিলেই বৃত্ত পূর্ণ হইল। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে যাহার আহার নিদ্রা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ হয় নাই তাহার পক্ষে ক্ষণগুলির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিলাভ করা সম্ভবপর নয়। কারণ আহার নিদ্রাতে যদি সময়ের কতকটা অংশ নষ্ট হইয়া যায় তবে ত আর ক্ষণগুলি ধরিয়া কাজ হইল না। সেই জন্য বলা হয় যে যাহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে এবং যে ক্ষণ বিষয়ে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া আছে, তাহার নিকটই ক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহা না হইলে ঐসব শক্তি আংশিকভাবে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ণভাবে পাওয়া যাইবে না। ষট্‌চক্রের বেলায়ও এইরূপ জানিবে। যদিও শক্তির কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ছয়টি চক্রের কথা বলা হয় সত্য, কিন্তু ঐ ছয়টি

ছাড়াও অনেক চক্র আছে। তবে বিশেষভাবে শক্তির কেন্দ্র বলিয়া ঐ ছয়টির কথাই বলা হয়। এখন সাধনের ক্রম হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সাধক সাধনা করিতে করিতে যখন সকলের নীচের চক্রে বা কমলে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে ঐ কমলের কেন্দ্রের সহিত যোগ রাখিয়া প্রত্যেক পাপড়ির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আয়ত্ত করিতে হয়। এইভাবে যখন কমলের সকল পাপড়ির শক্তি অনুভূতিতে আসে তখন ঐ কমল হইতে উহার ঊর্দ্ধে অন্য কমলে গতি হয়। ইহা কেমন? না ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠার মত। সিঁড়ির এক ধাপ উঠিয়া গেলে সেখানে যাহা দেখিবার তাহা দেখা হইয়া গেল; পরে আবার সিঁড়ির অন্য ধাপে উঠা এবং দেখা। এইভাবে একটি একটি করিয়া সমস্ত কমল পার হইয়া যখন সহস্রারে আসা গেল তখন যাহা কিছু দেখিবার বা জানিবার তাহা দেখা এবং জানা হইয়া গেল। ইহার পর আবার বৃত্ত পূর্ণ করিবার জন্য বিলোম গতিতে যেখান হইতে আরম্ভ করা আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসা। তবে সহস্রারে আসিলেই যাহা কিছু জানিবার, বুঝিবার, লাভ করিবার ইত্যাদি বলিয়া বলা হয় তাহা হইয়া যায়।

আমি—মা, মনে হয় আজ তুমি অখণ্ড মহাযোগের কথা বলিতেছ। এ জাতীয় কথাই যেন গোপীবাবুর নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু একটা বিষয় আমার অস্পষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। যদি সহস্রারে আসিলেই যাহা কিছু লাভ হইবার তাহা হইয়া যায় তবে বিলোম গতিতে যেখান হইতে সাধন আরম্ভ করা যায় সেইখানে যাইবার প্রয়োজন কি?

মা—(হাসিয়া) মহাযোগ কিনা তাহা তোমরা জান; কিন্তু আমি ত বরাবর এই যোগের কথা বলিয়া আসিতেছি। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। এই যে একটি করিয়া কমল পার হইয়া আসার কথা বলা হইল, ইহা কিন্তু আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এইখানেই যত পরিশ্রম। যদি সহস্রারে বা মূলে পৌঁছান না যায় তবে কিন্তু সকলদিগের জ্ঞানলাভ হয় না। সেই জন্যই কেহ কেহ বলেন যে সহস্রারে না গেলে প্রকৃত

সাধনই আরম্ভ হয় না। সহস্রারে আসিয়া যাহা কিছু হয় তাহা কিন্তু স্বাভাবিক গতিতেই হয়। এখানে আয়াসের কোন প্রশ্নই নাই। এখান হইতে বৃত্ত পূর্ণ করিবার জন্য যে পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা ত স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায়। এই অবস্থায় জগৎগুরু অজ্ঞান রাজ্যে গিয়া অজ্ঞান দূর করিয়া থাকেন। এম, এ, পাশ করিয়া যেমন ক, খ পড়াইতে গেলে লোকের বিদ্যার হ্রাস হয় না সেইরূপ জগৎগুরুর অবস্থা লাভ করিয়া অজ্ঞান রাজ্যে ফিরিয়া গেলেও জ্ঞানের কোন হ্রাস হয় না। তোমাদের ব্যবহারিক জগতে যেরূপ হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক সেইরূপ হয়। ব্যবহারিক জগতে তোমরা কি কর? তোমরা প্রথমে অর্থকরী বিদ্যার জন্য লেখাপড়া শিখ। লেখাপড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পুনরায় আবার ঐ অর্থ দ্বারাই অন্যে যাহাতে বিদ্যালাভ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে সেজন্য স্কুল-কলেজ করিয়া দেও! ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া আবার ঐ বিদ্যা যাহাতে অন্যে লাভ করিতে পারে সে ব্যবস্থা করা যায়। ইহাই জগৎগুরুর কার্য্য।

(কুসুম ব্রহ্মচারীকে) এইসব কথার মধ্যে তোর প্রশ্নের ত সমাধান হইল না। এখন তো সময় শেষ হইয়া আসিল। এখনই আহারের জন্য ডাকিতে আসিবে। যেটুকু সময় আছে তাহার মধ্যেই তোর প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। এই যে তুই বললি যে জপ করা হইল গুরু যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহাই গুরুমুখ হইতে শুনিতেছি ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, ইহাও এক জাতীয় সাধনা। গুরু যিনি দীক্ষা দিয়াছেন, তিনি ত ভিতরেই আছেন এবং ঐ দীক্ষামন্ত্রও ভিতরেই আছে, জপ করিতে বসিয়া ভাবিতে হয় কি যে দীক্ষার সময় গুরু যেভাবে কানে মন্ত্র দিয়াছিলেন এখনও যেন আমি ঐভাবে বসিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতেছি। এইভাবে সাধন করিলে লোকের সময়ে শোনার দিকটা খুলিয়া যায়। তখন দূর শ্রবণই বল বা অনাহত ধ্বনিই বল বা কৃষ্ণের বাঁশিই বল, সবকিছু শুনা যায়।

কেহ কেহ আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের দিক লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে

চেষ্টা করে। এখানে শ্বাস-প্রশ্বাস, মন এবং মন্ত্র এই তিনটির যোগ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ত চলিতেছেই তাহার সহিত মন্ত্রকে যোগ করিতে হইবে। মন না থাকিলে এই যোগ হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে এবং উহার সহিত মন্ত্রও চলিতেছে; কিন্তু মন অন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে যে মনের সামান্য অংশ আছে বলিয়াই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র জপ হইয়া যাইতেছে। তাহা না হইলে শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র জপ কখনও চলিতে পারিত না। যাহাতে মন সর্ব্বাংশে শ্বাস ও মন্ত্রের সহিত যুক্ত হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। একবার যদি সর্ব্বাংশে যুক্ত হইয়া যায় তবে যাহা প্রকাশ হওয়ার তাহার প্রকাশ হইয়া যায়।

আবার যে বলা হয় যে মন্ত্রার্থ ধারণা করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়, তাহাও হইতে পারে। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে জপ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থ চিন্তা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। এ সময় করিতে হয় কিনা, মন্ত্রের যাহা অর্থ তাহা প্রথমে চিন্তা করিয়া নিয়া উহাই যে পূর্ণভাবে মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে এইরূপ ধারণা লইয়া জপ করিতে হয়। মন্ত্রকেই গুরুর বা ইষ্টের মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া উহা জপ করিয়া যাইতে হয়। জপ না করিয়া শুধু মন্ত্র শুনিয়া গেলে যেমন শুনার দিকটা খুলিয়া যায়, সেইরূপ জপ করিলে, জপের ফলে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। জপের ফলে শরীরে এইরূপ ঝঙ্কার হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন যে গ্রন্থির মধ্যে মন্ত্রটি নিবদ্ধ আছে সেই গ্রন্থির উপর আঘাত পড়ে। কাঠে কাঠে ঘষিলে যেমন কাঠ হইতে আগুন বাহির হয়, একখানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন সেই স্থান হইতে জল বাহির হয়, সেইরূপ জপ করিতে করিতে দেহের যে সব গ্রন্থি আছে তাহা খুলিয়া যায়। জপের ফলে এইসব গ্রন্থি হয় জ্বলিয়া যায় না হয় গলিয়া যায়।

এই সব কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীমতী বুনী মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিল। বেলাও তখন প্রায় ১২।টা। মা উঠিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে দিতে মায়ের আপত্তি

২০শে শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ৫।৮।৪৯)

যজ্ঞোপলক্ষ্যে আজও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভোজন করান হইল। আজ ভাইজীরও তিরোধান উৎসব। সেজন্যও কয়েকজন সাধুকে ভাণ্ডারা দেওয়া হইল। এইসব কারণে আজ পূর্ব্বাহ্নে কোন সদালোচনা হইল না। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর ভাইজীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) দাদা এবং নেপাল (ব্রহ্মচারী) দাদা ভাইজীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন। উহার পর আর কেহ কিছু বলিতেছে না দেখিয়া ডাঃ পান্নালাল ভাইজীর সম্বন্ধে মাকে কিছু বলিতে বলিলেন। মা কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া ডাঃ পান্নালাল নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া মার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "পিতাজী কেমন চতুরতা করিয়া নানাভাবে প্রশ্ন করিতে পারে। পিতাজী বেশ ভাল।"

ডাঃ পান্নালাল—ভাল হইলে আবার চতুরতা করিয়া প্রশ্ন করে কেমন করিয়া?

মা—সে কি? সরলভাবের মধ্যেও কি এই এই জাতীয় প্রশ্ন হয় না?

ডাঃ পান্নালাল যখন দেখিলেন যে কোন প্রকারেই মার নিকট হইতে ভাইজী সম্বন্ধে কিছু বাহির করা যাইতেছে না তখন তিনি মাকে বলিলেন যে মার নিকট তাহার একটি প্রার্থনা আছে এবং মা যদি উহা মঞ্জুর করেন তবেই তাহা প্রকাশ করিবেন।

মা—(হাসিয়া) পিতাজী, জানই ত এ শরীরের মাথার দোষ আছে। খেয়াল হইলে পিতাজী যাহা বলিবে তাহাই এ শরীর হইতে করা হইয়া যাইবে, আবার যদি খেয়াল না হয় তবে কিছুই করা হইবে না। কাজেই পিতাজীর কথামত এ শরীর যদি কিছু না করে তাহা হইলে পিতাজী তাহা সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিবে, এইভাব মনে রাখিয়া পিতাজী যে কোন প্রশ্ন করিতে পারে।

পটলদাদা—কেবল পা ছুঁইয়া প্রণামের কথা বলিলে মা তাহা রাখিবেন না।

ডাঃ পান্নালাল আরও দুই একবার মার নিকট হইতে এ কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন যে মা তাঁহার কথামত কাজ করিবেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। শেষে তিনি এই প্রার্থনা জানাইলেন যে আজিকার দিনে মা সকলকে চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে অনুমতি দিউন।

মা—পিতাজী, সে খেয়াল আসিতেছে না এই জন্য তোমার কথা রাখিতে পারিতেছি না।

ডাঃ পান্নালাল—কিন্তু পটলদাদার কথা ত রাখিলেন।

মা—পটলের কথায় যে পা ছুঁইতে নিষেধ করিতেছি তাহা নয়। পিতাজীকে ত আগেই কথা দিয়াছি যে এ শরীরের খেয়াল না হইলে পিতাজীর কথামত কাজ করা হইবে না। সেই অর্থে পিতাজীর কাছে যে কথা দিয়াছি তাহা রক্ষা করা হইতেছে।

ডাঃ পান্নালাল—(হাসিয়া) মাতাজী সাদাকে কাল এবং কালকে সাদা করিতে পারেন।

মা—ইহা পিতাজীরই গুণ। পিতার গুণ সন্তান পায় কিনা?

ডাঃ পান্নালাল—দিদিমা সাক্ষ্য দিবেন যে এই মাত্র আমাকে আপনি সরল বলিয়াছেন।

মা—দিদিমাকে সাক্ষ্য দিতে বলিতেছ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর এ শরীরকে দেখিয়া তাঁহার কত দুশ্চিন্তা হইত এবং এ শরীরকে গালাগালি দিতেও সর্বদা বলিত, "এ একেবারেই সিধা।" সেই জন্যই ত একদিন একটি কলসী কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া যখন দেখিলাম যে বেশ বাঁকা দেখাইতেছে, তখন তোমাদের দিদিমাকে ডাকিয়া বলিলাম যে আসিয়া দেখ আমি বাঁকা, সোজা নহি। (সকলের হাস্য)

ডাঃ পান্নালাল—(খুকুনীদিদিকে) দিদি আপনার পুস্তকে ত এরূপ লেখা নাই যে মা আগে ছায়াতে নিজের বাঁকা মূর্ত্তি দেখিয়া নিয়া

পরে দিদিমাকে ডাকিয়াছিলেন।

খুকুনীদিদি—কি করিয়া থাকিবে? ২৫ বৎসর পর মা যে এই কথা প্রথম বলিলেন। (সকলের হাস্য)

বাস্তবিক মা যখন কোন কথা বলেন তখন সে সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। তার কিছুটা প্রকাশ করিলেন, কিছুটা অপ্রকাশ রহিয়া গেল। পরে আবার ঐ ঘটনা বলিতে আরও কিছু নূতন করিয়া প্রকাশ করিলেন। মার কথা বলার ভঙ্গীই এইরূপ। এইভাবে কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। গঙ্গাদিদি আসিয়া মাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

২১শে শ্রাবণ, শনিবার (ইং ৬।৮।৪৯)

আজ মা হলঘরে আসিতে বেলা ১১।।টা করিয়া ফেলিলেন। সকালবেলা হইতেই নাকি মেয়েদের গোপন কথা চলিতেছে; কারণ আজ মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতা যাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা আসন গ্রহণ করিলে কথা হইতেছিল যে বৃষ্টির জন্য গতবারের মত এবারেও কাশীর পুরাতন বাড়ীগুলি পড়িয়া যাইতেছে। আমাদের আশ্রমটি নূতন হইলেও অনেক ঘরের মধ্যে জল পড়ে। ঐ জল পড়া বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টাও হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। খুকুনীদিদি এই সব কথা চিন্তাযুক্তভাবে মাকে বলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "সকল অবস্থাতে সমভাব রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। অমঙ্গলের ব্যাপারে উদ্বেগ নাই, মঙ্গলের ব্যাপারেও আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। সবই সমানভাবে দেখা।

ডাঃ পান্নালাল—আমি এক পুস্তকে পড়িয়াছি যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আমি সোজার কাছে সোজা আবার কুটিলের কাছে কুটিল।" এখানে সমভাব কোথায়?

মা—(হাসিয়া) পিতাজী, এখানে সমভাব দেখিতে পাইতেছ না? এ যে বিষম সমভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন কুটিলের জগতে তিনিও কুটিল অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে এক। আবার সরলদের জগতে তিনিও সরল। ইহাই ত সমতা হইল। (সকলের হাস্য) আবার দেখ

কুটিলের সঙ্গে কুটিলতা করিয়া তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতেছেন। কেন না কুটিল যখন দেখিবে যে তাহা অপেক্ষা আরও বড় কুটিল আছে, তখন কি শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত না হইয়া যাইবে না? এবং যাহার নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক নত করা যায় তাহার গুণ যে মস্তক নত করে তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কাজেই ভগবানের কাছে মস্তক নত করিয়া সে ভগবৎ গুণই পাইয়া থাকে। কাজেই কুটিলের সঙ্গে কুটিলতা করিয়া তাহার মঙ্গলই করা হইল। মঙ্গলময় ভগবান্ নানাভাবে সকলের মঙ্গল করিয়া সকলের প্রতি সমভাবই দেখাইতেছেন। তোমরাও বল যে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। সেই অর্থে ভগবান্ কুটিলের সঙ্গে কুটিল ব্যবহার করিয়া তাহার কুটিলতা নষ্ট করেন।

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন

ডাঃ পান্নালাল—ভগবান্ কি মিথ্যা কথা বলেন?

মা—ভগবান মিথ্যা কথা বলিবেন? কাহার কাছে বলিবেন? (সকলের হাস্য)

ডাঃ পান্নালাল—"অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" ইহা ত কৃষ্ণই বলিয়াছিলেন।

মা—তোমরাই না বল যে সমর্থের কোন দোষ নাই। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তাঁহার বিচার করিবে কেন?

আমি—শ্রীকৃষ্ণের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যুধিষ্ঠির যিনি ভগবানের আদেশে মিথ্যা কথা বলিলেন তাঁহার ঐ মিথ্যা কথা বলার জন্য নরক দর্শন হইল কেন?

মা—(ডাঃ পান্নালালকে) পিতাজী, বল যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল কেন?

ডাঃ পান্নালাল—এখানে পরীক্ষা হিসাবেও শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলিতে অনুরোধ করিয়া থাকিতে পারেন। কারণ যুদ্ধ করিবার জন্যই ত মিথ্যা কথা বলা। যুধিষ্ঠির নিজের স্বার্থের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিয়া পাপ করিলেন। সেই জন্যই তাঁহার নরক দর্শন হইল।

মা—(আমাকে) এই ত উত্তর হইল।

আমি—মা, এ উত্তর ঠিক হইল না। কারণ গুরু যদি আমাকে কোন আদেশ করেন তবে কি আমার উহা বিচার করিয়া দেখা উচিত যে তিনি উহা আমাকে পরীক্ষা করিতেই বলিতেছেন না অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলিতেছেন? নির্ব্বিচারে গুরুবাক্য পালন করিতেই শাস্ত্র বলে। তাহার পর গুরুবাক্যই যখন শাস্ত্রের মূল তখন ভগবানের কথা অনুযায়ী কাজ করিয়া যুধিষ্ঠির ত কোন অশাস্ত্রীয় কাজ করেন নাই যাহার জন্য তাঁহার পাপ হইল?

মা—এ সম্বন্ধে এ শরীরের কি মত তাহা না বলিয়াও এ কথা বলা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এই প্রশ্নটির সমাধান চলে। এ কথা সত্য যে ভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া মিথ্যা কথা বলাইলেন, সে ভগবান্ কি যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন না করাইয়া পারিতেন না? আবার এ কথাও ঠিক যে জাগতিক লাভের জন্যই ঐ মিথ্যা কথা বলা হইয়াছিল। বিষয় বাসনা থাকিলে জ্বালা থাকিবেই। ভগবান্ যুধিষ্ঠিরের বিষয় বাসনা পূর্ণ করিয়া উহার ফলস্বরূপ নরক দর্শনস্বরূপ একটু জ্বালা দিয়ে দিলেন। অনেক সময় ভগবান্ সামান্য ভোগ করাইয়াও লোকের বিষম ভোগ কাটাইয়া দেন। আবার তুমি যেভাবে বলিতেছ সে ভাবেও বলা যায় যে গুরুবাক্য বিনা বিচারে পালন করা শ্রেয়। গুরুবাক্য পালন করিতে যদি নরকভোগ হয় তাহাতেই বা দোষ কি? গুরুবাক্য যে আন্তরিকভাবে পালন করিতে চায় তাহার ফললাভের দিকে লক্ষ্য থাকে না। গুরুবাক্য পালন করিতে গিয়া যদি দুঃখ বা সুখ হয় উহা উভয়ই তাহার কাছে সমান। একটা বিষয়ে অনন্ত দিক থাকিতে পারে। কোন কার্য্যের ফল অতি বিষম থাকিতে পারে, এসব ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে ভগবান্ কার্য্যের ফলটিকে আগে দিয়া পরে কার্য্যটি আনিয়া উপস্থিত করেন। ইহাতেও ভোগ অনেকটা কমিয়া যায়। এই যে কথা বলিলাম ইহার অর্থ তুমি ভাল করে বুঝিবে না, কারণ যে ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলাম তাহা তোমার জানা নাই।

বেলা প্রায় ১টা বাজিল দেখিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

অনধিকারীর পক্ষে যোগাভ্যাসের কুফল

বিকালবেলা পাঠের সময় মা আর হলঘরে আসিলেন না। পাঠ সমাপন হইলে যখন আমরা উপরে গেলাম তখন দেখি যে মা চত্বরের উপর বেড়াইতেছেন। কয়েকজন সাধু মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা কিছুক্ষণ বেড়াইয়া হলঘরে আসিয়া বসিলেন। সাধুদের মধ্যে একজন মাঝে মাঝে মার কাছে আসেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী। তিনি একটি ছেলের কথা উল্লেখ করিয়া মাকে বলিলেন যে ছেলেটির মাথা খারাপ হইয়াছে। সে নিজকে একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছে। মা বলিলেন, "সাধন করিতে আসিয়া কাহারও কাহারও এইরূপ বিপদ হইতে দেখা যায়। নানা কারণেই ইহা হইতে পারে। যাহাদের দেহ যোগাভ্যাসের উপযোগী নয় তাহারা যদি যোগ করিতে যায় তবে এইরূপ হইতে পারে। পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাস করিলেও এইরূপ হইতে পারে। তাহা ছাড়া গুরুর নিকট হইতে যোগদীক্ষা লইয়াও এইরূপ হইতে পারে, যদি শিষ্যের আধার বুঝিবার অবস্থা গুরুর না থাকে। কারণ গুরু নিজে অনুভূতিসম্পন্ন হইলেই যে শিষ্যের অবস্থা বুঝতে পারিবে এমন নয়। তিনি হয়ত নিজে সাধন করিয়া কিছু অনুভূতি পাইলেন এবং পাইয়াই ঐ সাধন অন্যকে দিয়া দিলেন। কিন্তু সকল লোকের সংস্কার ত এক নয়। কাজেই গুরুর যদি শিষ্যের সংস্কার বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে তাহার দেওয়া শক্তিও শিষ্যের মধ্যে এই জাতীয় গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে পারে।"

ভগবানের নাম করিতে স্থানকালের বিচার করিতে হয় না

বাটুদাদা—মা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন আছে যে সন্ধ্যা করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসিয়া সন্ধ্যা কারতে বসিলে তাহার জপে মন বসে না; কিন্তু অন্য সময় বসিলে কতকটা সময়ের জন্য তাহার মন বসিয়া যায়। কিন্তু অন্যদিন যদি আবার ঐ সময়ে

জপ করিতে বসে তবে তখনও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেদিন হয়ত আর একটা সময়ে তাহার জপে মন বসিয়া যায়। এরূপ হয় কেন? এ অবস্থায় কি করা উচিৎ?

মা—এই যে জপে মনোযোগের কথা বলিলে ইহারও একটা কারণ আছে। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান বা সময়ে জপ করিতে গেলে কাহারও মন বসে কিন্তু ঐ স্থানে বা সময়ে অন্য একজনের মন বিক্ষিপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে কাহারও কাহারও মধ্যে কোন একটা সময়ে ঐরূপ অনুকূল যোগাযোগ সৃষ্টি হয় তখন সে কিছুক্ষণের জন্য ভগবানে মন লাগাইয়া রাখিতে পারে। কোন কোন স্থানে গেলেও ঐরূপ অনুকূল যোগাযোগ হইতে পারে। সকলেরই যে একস্থানে বা একসময়ে হইবে এরূপ নহে। তবে কথা এই যে যখনই যাহার ঐরূপ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সম্ভব হইলে তাহার তখনই ভগবানে মন লাগান উচিৎ। তখন আর স্থানকাল বিচার করিতে হয় না; কারণ ভগবানের নাম যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে লওয়া যাইতে পারে। আবার গুরু যদি জপের অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বলিয়া দেন তবে সে সময়ে ভাল লাগুক বা না লাগুক সেই সময়েই তাহার জপ করা উচিত। ভাল লাগিতেছে না অথচ জপ করা হইতেছে; ইহাও কিন্তু বৃথা নয়, কারণ এইরূপ অভ্যাসের যে একটা ফল থাকিবেই থাকিবে। যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বে ঔষধ খাইলেও উহার ফল পাওয়া যায়, না জানিয়া আগুনে পা দিলেও যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বে গুরুর আদেশ পালন করিলেও ফল পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ভাল লাগিতেছে না তবুও জোর করিয়া নাম করিতে হইতেছে—ইহাও এক প্রকার তাপ-সহা। ভগবানের জন্য তাপ-সহাকে আমি তপস্যা বলি।

একজন সাধু—নির্দ্দিষ্ট সময় জপ করা আর যখন ভাল লাগে তখন জপ করা—এই দুইটির মধ্যে কোনটি ভাল?

মা—দুই-ই ভাল। অবশ্য গুরুর আদেশ থাকিলে তাহা পালন করিতেই হইবে; কিন্তু এইরূপ যদি কোন আদেশ না থাকে তবে

নির্দ্দিষ্ট সময়ে জপ করিয়া এবং যখন ভাল লাগে তখন জপ করিয়া—এই দুইভাবেই ফল পাওয়া যায়। সকলের জন্য এক পথও নয়, এক বিধিও নয়। কখন কাহার নিকট যে ভগবানের প্রকাশ হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? এই যে মন লাগার কথা বলা হইল—ইহাও কিন্তু প্রকৃত মন লাগা নয়; কারণ একবার যদি প্রকৃতভাবে কাহারও মন লাগে তবে সে তখনই অমনা হইয়া যায়। এই যে মন লাগা বলা হইয়াছে—ইহা আর কিছুই নয়, শুধু ভগবানের নাম লইতে একটু ভাল লাগা। সেদিন বলিতেছিলাম না যে দিবারাত্রে চারিটি সন্ধির সময় আছে—প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যাকাল এবং মধ্যরাত্রি। ইহাদিগকে ভাগ করিয়া আবার আটটি সন্ধির সময় পাওয়া যায়। এইসব সময়ের প্রত্যেকটির অনুভূতি এবং আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন। আবার ঐ আটটিকে ভাগ করিয়া ষোলটি সন্ধির সময় করা যায়। এইভাবে ভাগ করিয়া দেখিবে প্রত্যেক সময়ই সন্ধির সময়। তাই যে কোন সময়ে জপ করা যায়, কারণ অখণ্ডভাবে জপ করাই হইল লক্ষ্য এবং যিনি অখণ্ডভাবে জপ করিতে পারেন তিনিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও আনন্দলাভ করিতে পারেন। এইসব কথা বলিতে বলিতে কীর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল। কীর্ত্তনান্তে ১৫ মিনিট মৌন থাকা হইল। রাত্রি ৯টা বাজিলে মা উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

২২শে শ্রাবণ, রবিবার (ইং ৭।৮।৪৯)

আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীমা ঐখানেই ছিলেন। তিনি কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম যে এক ব্যক্তি বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে রাত্রিতে পথ দিয়া চলিতেছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। ঐ আলোকে সে দেখিতে পাইল যে পথের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ। ঐ সময় বিদ্যুৎ না চমকিলে হয়ত সর্পাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইত।

ডাঃ পান্নালাল—মা, এ কেমন হইল? ভগবান্ একজনকে সাপের কামড় হইতে বাঁচাইলেন আবার অন্য একজন সর্পাঘাতেই প্রাণ হারাইল?

মা—কর্ম্মফল বলিয়া ত কিছু আছে। তাহা ছাড়া ভগবান যাহাকে যাহা কিছু করেন তাহা তাহার মঙ্গলের জন্যই। তাঁহাকে পরমপিতা, পরমমাতা এবং পরমবন্ধু বলা হয় না? তাই পিতা যেমন সন্তানকে কষ্ট দিয়া তাহার জ্ঞানলাভের সহায়তা করিয়া তাহার মঙ্গল করেন সেইরূপ ভগবান্ও কাহাকে কষ্টের মধ্য দিয়াই তাহার মঙ্গল করেন। তাঁহার সমস্ত বিধানই মঙ্গলময়। তবে তাঁহার হাতে চড়থাপ্পড় খাওয়াটাই শক্ত। যাহাকে সাপে কাটিয়া শেষ করিল শুনিলে তাহার পক্ষে ঐভাবে জীবন শেষ হওয়া ভাল ছিল বলিয়া ঐরূপ হইল, আর যাহাকে তিনি সাপের কামড় হইতে রক্ষা করিলেন তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাটাই মঙ্গলের কারণ।

ডাঃ পান্নালাল—যদি বলা হয় যে কর্ম্মফলের জন্য ঐরূপ হইল?

মা—একটা অবস্থা আছে যখন ঐরূপই মনে হয়। একজন যে সুখ ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া হয়ত বলিলে যে তাহার সুকর্ম্ম ছিল, তাই সে সুখভোগ করিতেছে। কাহারও দুঃখ দেখিয়া বলা হয় যে সে তাহার খারাপ কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। ঐ অবস্থায় সবকিছুই কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলরূপে দেখা যায়। আবার একটা অবস্থা যেখানে দেখা যায় যে যিনি কর্ম্মফল দিতেছেন এবং যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে—ইহারা আলাদা নয়। সাপরূপেও তিনি, যাহাকে দংশন করা হইল সেও তিনি এবং দংশনও তিনি। এই অবস্থাতে সবই তাঁহার লীলা বলিয়া দেখা যায়। এ অবস্থায় কর্ম্মও নাই, কর্ম্মফলও নাই। এ অবস্থায় মঙ্গল অমঙ্গলের কোন প্রশ্ন নাই।

ডাঃ পান্নালাল—সেদিন কথা হইতেছিল যে ভক্তের নিকট প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই, কারণ ভক্ত মনে করে যে যাহা কিছু পাইতেছে সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে পাইতেছে। সে ত নিজের জন্য কিছু করে না যে তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে।

মা—প্রারব্ধ অর্থ কি? যাহা পরে লাভ করা হইয়াছে। তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা তোমরা জান। এখানে ত এলোমেলো কথা। পরে যাহা লাভ করা যায় তাহাকেই আমি প্রারব্ধ বলি—অর্থাৎ পূর্ব্বে কর্ম্ম করিলে, ফল পরে পাইলে। যেখানে কর্ম্ম থাকে সেইখানেই লাভালাভ থাকে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে কর্ম্ম করে কে? কর্ম্মও তিনি করিতেছেন, ফলভোগও তিনি করিতেছেন। এগুলি তাঁহার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই। আবার ভক্তের নিকট প্রারব্ধ নাই, কারণ সবই যে প্রিয়তমের কাজ। কর্ম্মরূপে এবং কর্ম্মফলরূপে তাহার প্রিয়তমই যে নিজকে প্রকাশ করিতেছেন, সুখরূপেও তাহার প্রিয়তমের প্রকাশ, দুঃখরূপেও তাহার প্রিয়তমের প্রকাশ। এইভাবে দেখিলে সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল বলিয়া কিছু থাকে না। অবশ্য বিচার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। কিন্তু বিচার মন দিয়া করা হয় বলিয়া ইহা স্থায়ী হয় না; কারণ মন চঞ্চল কিনা তাই মন দিয়া কিছু ধরিলে তাহা স্থায়ী হয় না, কিন্তু যখন ইহা অনুভূতিতে আসে তখন বুঝা যায় যে যা আছে তাই আছে। যাহা কিছু হইয়া যায় তাহাই ঠিক।

মস্তক আঘ্রাণ করার অর্থ

এই সময় বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিলেন। তিনি প্রত্যহ মায়ের জন্য একছড়া মালা লইয়া আসেন। তিনি মাকে মালা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিলেন। পরে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন "মা, সেদিন পড়িলাম যে শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া অগস্ত্যমুনির নিকট যখন আসিলেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এই মস্তক আঘ্রাণের অর্থ কি? মাও ছেলেব মস্তক আঘ্রাণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আজকাল অবশ্য ইহা কতকটা লোপ পাইয়াছে।"

এইভাবে মস্তক আঘ্রাণ করার অর্থ কি মা তাহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে এক একজন এক একভাবে ইহার উত্তর দিল। পরে মা বলিলেন, "দেখ বলা হয় না

যে শরীরের মধ্যে মস্তকই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, কারণ শরীরের মূলই হইল এই মস্তক। গাছের মূলের সহিত যেমন গাছের সমস্ত ডালপালার যোগ আছে; সেইরূপ মস্তকের সহিতও সর্ব্বাঙ্গের যোগ আছে। কাজেই মাথা স্পর্শ করা হইলেই সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করা হয়। সেইজন্যই মাথায় আশীর্ব্বাদ করা হয়। মা যে সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করেন ইহা দ্বারা সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহই প্রকাশ হয়। মা সন্তানের অশুভ আঘ্রাণ দ্বারা টানিয়া লইয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দেন। এইভাবে সন্তানের সহিত তাহার একাত্মভাব স্থাপিত হয়। কোথাও যাত্রা করিবার সময় সন্তান যখন মাকে প্রণাম করে মা তখন সন্তানের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাহার সহিত একাত্মভাবের একটি যোগসূত্র রাখিয়া দেন। ইহা দ্বারা সন্তানের মঙ্গল হয়। আবার প্রণাম করিতেও লোকে মস্তক দ্বারাই প্রণাম করে। মস্তক উপুড় করিয়া লোকে যতখানি নিজকে শূন্য করিতে পারে, সে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ততখানিই মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। মস্তক দ্বারা গ্রহণই হইল সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা গ্রহণ। আবার দেখ মস্তক আঘ্রাণ করা ত একটা ক্রিয়া? ক্রিয়ামাত্রেরই একটা ফল আছে। উহাতে সন্তানের মঙ্গল হয়।

শিখা ধারণের প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্রী মহাশয়—মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখা হয় কেন?

মা—উপবীতের সময় যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখা হয় উহারও নানা অর্থ থাকিতে পারে। ঐভাবে শিখা রাখিলে উহা মুণ্ডিত মস্তকের নানা স্থান স্পর্শ করিয়া সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করাইয়া দেয় যে সে ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া টিকি রাখিলে উহা প্রত্যহই খুলিতে বা বাঁধিতে হয়। শিখা বাঁধিবার মন্ত্র আছে। কাজেই শিখা রাখিলে ব্রাহ্মণত্বের ভাবটা সজাগ থাকে। তাহা ছাড়া এ শরীরে খেয়াল হইতেছে যে ঐভাবে রাখিলে উহার নড়াচড়া হইতে দেহের ভিতর স্বাভাবিকভাবেও একটা ক্রিয়া চলতে থাকে।

কৌশল্যামাতা

এই সময় ডাঃ পান্নালাল আবার প্রণাম করার কথা উঠাইলেন। মা যে আমাদের প্রণাম করাকে পাউডারের কৌটা উপুড় করার সঙ্গে তুলনা করেন সেই সব কথা বলিতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এই সম্পর্কে দেরাদুনের কৌশল্যামাতার কথা আমার খেয়ালে আসিতেছে। যখন খেয়ালে আসিতেছে তখন বলিয়াই ফেলি। দেরাদুনে এক মাতাজী ছিল যাহার নাম আমি কৌশল্যা রাখিয়াছিলাম। তাহার বয়স তখন প্রায় আশী হইবে। তাহার তিনটি ছেলে। মাতাজীর অবস্থা খুব ভাল। সমস্ত আনন্দচক্ তাহাদেরই সম্পত্তি ছিল। মাতাজীকে লইয়া এ শরীর কতই তামাসা করিয়াছে। মাতাজীর অনেক সদ্‌গুণ ছিল। একদিন রাত্রিতে সে আমার কাছে আসিয়াছে। সেদিন তাহাকে বাড়ীতে না ফিরিয়া ঐখানে থাকিতে বলা হইল। আমার কথামত সে থাকিয়াও গেল। বুড়া হইয়াছিল বলিয়া জিনিষপত্র সাবধানে রাখিতে পারিত না। অনেক সময় সে তাহার থাকিবার ঘরের তাকের উপর টাকা পয়সা ফেলিয়া রাখিত। ঐ দিনও সে প্রায় এক হাজার টাকা ঘরের তাকের উপর ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। পরদিন যখন বাড়ী ফিরিয়া গেল, গিয়া দেখে যে তাহার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। আর ইহা নিয়া তাহার কত আফ্‌সোস! বুড়া হইলেও তাহার সাজিবার ইচ্ছা বেশ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা বড়লোক ত। এইসব কারণে সে মুখে পাউডার ইত্যাদি মাখিত। আমি যখন হরিদ্বারের ধর্ম্মশালায় ছিলাম সে একদিন আমার কাছে আসিল। তাহার থাকিবার ঘরে আমি গিয়া দেখি যে একটা টিনের সুন্দর বড় কৌটা তাহার ঘরে আছে। আমি উহা হাতে লইয়া উপুড় করিয়া দেখি যে উহা পাউডারের কৌটা। ইহা দেখিয়া আমি কৌশল্যা মাকে বলি, "এগুলি বুঝি তুমি মুখে মাখ এবং এইজন্যই তোমাকে এত ফরসা দেখায়?" আমার কথা শুনিয়া সে কাপড় দিয়া মুখ ডলিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "কোথায় মুখে মাখিয়াছি? তোমার সকলদিকেই দৃষ্টি।" (সকলের হাস্য) তাহার গুণের কথাও কিছু

কিছু বলি। তাহার তিনটি ছেলে ছিল; কিন্তু তাহার বড় সাধ হইল যে তাহার একটি মেয়ে হউক। তাহা হইলে সে মেয়েকে নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া বিয়ে দিবে। একটি মেয়ের জন্যে সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। সত্য সত্যই তিন ছেলের পর তাহার একটি মেয়ে হইল। মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল। কৌশল্যা নিজেও খুব সুন্দরী। মেয়েটিকে সে নানাভাবে সাজাইয়া রাখিত। লক্ষ টাকা কি তাহার বেশী ব্যয় করিয়া সে মেয়ের বিবাহ দিল। বিবাহের কিছুদিন পরই মেয়েটির মৃত্যু হইল; কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর জন্য তাহার যে খুব একটা শোক হওয়া তাহা হইল না, কারণ তাহার বাসনা ছিল যে মেয়ে হইলে সে তাহাকে সাজাইয়া বিবাহ দিবে। তাহা যখন হইয়া গেল তখন মেয়ের আর বিশেষ শোক নাই। এরূপ ভাবও বড় কম নয়।

এ শরীর যখন আনন্দচকে ছিল তখন বাড়ী হইতে বার বার আমাকে দেখিতে আসিত। বুড়া বলিয়া তাহার চলিতে ফিরিতে কষ্ট হইত; কিন্তু আমার কাছে যাতায়াত করিতে তাহার কোন কষ্ট নাই। দিনে রাত্রে ৫/৭ বার ত আমার কাছে আসিত আর বলিত, "তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। আবার যতবার আসিত ততবারই আমার জন্য কিছু না কিছু খাবার লইয়া আসিত। আমাকে ঐ সকল খাওয়াইয়া তাহার কত আনন্দ!

একদিন হইয়াছে কি, আমার জন্য বাদাম আর চিনি দিয়া চাপাটির মত খাবার তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু এসব করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। রাত্রি বেশী হইয়াছে দেখিয়া সে মনে করিল আজ আর মাতাজীর কাছে নাই বা গেলাম। এই মনে করিয়া আমার জন্য যে খাবার করিয়াছিল উহা হইতে সে কিছু কিছু নিজেই খাইয়া ফেলিল। আবার মজাও এমন, ঐ দিন আমার খেয়াল হইল যে একবার লক্ষ্মীর বাড়ীতে বেড়াইতে যাই। আমি যেখানে থাকিতাম সেখান হইতে লক্ষ্মীর বাড়ী অনেকটা দূরে ছিল। যাহা হউক খেয়ালবশে রাত্রিবেলা আমি লক্ষ্মীর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। তখন আশপাশের বাড়ী

হইতে অনেকেই লক্ষ্মীর বাড়ীতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। কৌশল্যা মাও আসিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পেটের থলথলে মাংস টিপিতে টিপিতে বলিতে লাগিলাম, "আমি এই পেট হইতে আমার বাদামের চাপাটি বাহির করিয়া নিব।" কৌশল্যা মা আমার কথা শুনিয়াই অস্থির হইয়া উঠিল আর বলিতে লাগিল, "হায় মা, হায় মা, আমি কি কাজ করিয়াছি! তোমার জন্য যাহা করিয়াছিলাম তাহার অতি সামান্যই আমি খাইয়াছি"—ইত্যাদি। (সকলের হাস্য)।

যখন কিষনপুরে থাকিতাম তখন ত আর বেশী আসিতে পারিত না, কারণ আনন্দচক হইতে অনেকটা দূরে; কিন্তু যখনই আসিত তখনই আমার জন্য নানারকমের খাবার তৈয়ার করিয়া আনিয়া আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া যাইত। সে চোখে ভাল করিয়া দেখিতে পারিত না। আমি ঐ খাবার হইতে দুই একটা পদ লুকাইয়া রাখিতাম। সে উহা খুঁজিয়া না পাইয়া উহা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া দুঃখ করিতে বসিয়া যাইত। তখন উহা আমি বাহির করিয়া দিতাম। এইভাবে তাহাকে নিয়া কত আনন্দ করিয়াছি। ইহার পর সে আমাকে খাওয়াইতে আসিয়া যদি কিছু না পাইত তবে আমিই উহা নিয়াছি বলিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিত। অল্পদিন হয় কৌশল্যা মা মারা গিয়াছে। অনেকে আছে যাহারা সংসার করিয়াও খুব ভাল অবস্থা লাভ করে। প্রণামের কথায় যখন পাউডারের কথা উঠিল তখন এই কৌশল্যা মার কথাই খেয়ালে আসিয়া গেল।

ডাঃ পান্নালাল—কে প্রণাম করিতে আসিয়া সবটা ঢালিয়া দেয় আর কে পাউডারের কৌটার মত সামান্য কিছু দেয় তাহা কি আপনি প্রণাম করার রকম দেখিয়াই বুঝিতে পারেন?

না—প্রণাম করার রকম কেন? তাহার অনেক পূর্বেই বুঝিতে পারি।

ডাঃ পান্নালাল—এত বড় বিষম কথা। (সকলের হাস্য) আচ্ছা, নিজে নিজে কি বুঝা যায় যে আমার প্রণাম করিতে নিজকে কতখানি খালি করিতে পারিতেছি?

মা—সর্ব্বদা বিচার করিয়া চলিলে তাহাও কিছু কিছু বুঝা যায়। সাংসারিক কামনা বাসনা কতখানি কমিয়াছে তাহা দিয়াই ধর্ম্মপথে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল তাহা বুঝিতে পারা। এইগুলিই হইল মাইল ষ্টোন্ (mile-stone), যতই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই জাগতিক কামনা বাসনা ফেকাসে হইয়া যাইবে। আর যদি এই সব বাসনা প্রবল থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে এই পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া হয় নাই। একদিকে যেমন বিচার করিয়া চলা ভাল, আবার অন্যদিকে নিজের কি উন্নতি হইল না হইল সেদিকে লক্ষ্য না দেওয়াই ভাল। গুরু আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন আমি শুধু তাহাই জপ করিয়া যাইব, ইহাতে আমার উন্নতি হউক বা না হউক—এই ভাবটা মনে রাখিতে হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদা চলার পথে থাকার চেষ্টাই ভাল। কারণ পথে চলিতে চলিতে যদি বার বার দাঁড়াইয়া কতখানি আসা গেল দেখা যায় তাহা হইলে অনবরত চলার পথে উহা বিঘ্নস্বরূপ হয়। কারণ দেখিতে গেলেই দাঁড়াইতে হইবে। উহাই চলার পথে অন্তরায়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২।। বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া সাধন ব্রহ্মচারীকে দেখিতে গেলেন। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আজ গঙ্গাদিদি আশ্রমের সকলকে খাওয়াইতেছেন। সেই উপলক্ষ্যে আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাহিরের লোকও কিছু কিছু দেখিলাম। বেলা ১২টার সময় আমরা আশ্রমে আহার করিতে বসিলাম। আমাদের আহার যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন শ্রীশ্রীমা আসিয়া আমাদের ভোজনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা খাবারের যে কোন একটা পদ আর একবার করে খেও।" মার কথা শুনিয়া কেহ দধি, কেহ বা ডাল, কেহ মালপুয়া একটু একটু করিয়া লইলেন। কিন্তু কেন যে মা ইহা বলিলেন এ কথা কেহই মাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

ঝুলন-পূর্ণিমা

২৩শে শ্রাবণ, সোমবার (ইং ৮/৮/৪৯)

আজ ঝুলনপূর্ণিমা। এদেশে ঝুলনপূর্ণিমাকে রাখীপূর্ণিমা বলে। মা যখন আজ হলঘরে আসিয়া বসিলেন তখন এদেশীয় ভক্তগণ মাকে সুন্দর সুন্দর মালা পরাইয়া হাতে রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রাখী মায়ের হাতে বাঁধা হইয়া গেল। রাখীগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। উহার মধ্যে একটি সবচেয়ে সুন্দর ছিল। মালা ও রাখীতে মাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। মালাগুলি মা তখন তখনই খুলিয়া ফেলিলেন। রাখীগুলি অল্প সময়ের জন্যই হাতে রহিল। পরে মা বলিলেন, "রাখীগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। হাত হইতে খুলিয়া এগুলি দেখি।"

ডাঃ পান্নালাল—আপনি রাখীগুলি খুলিয়া ফেলিবার জন্যই এ কথা বলিতেছেন। মা হাসিতে লাগিলেন। একটি একটি করিয়া রাখিগুলি হাত হইতে খুলিয়া মা ছেলেমেয়েদিগকে দিয়া দিতে লাগিলেন। যখন সবচেয়ে সুন্দর রাখীটি খুলিতে গেলেন তখন যে মহিলাটি উহা দিয়াছিলেন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা ঐ রাখীটা খুলিও না।" মা হাসিতে হাসিতে রাখীটা খুলিয়া উহা হাতে লইয়া বলিলেন, "এই রাখীটির নাম 'মেরা' (আমার)।" যে মহিলাটি ইহা দিয়াছিলেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ অন্যান্য রাখী খোলা হইতেছিল ততক্ষণ এ কিছু বলে নাই। কিন্তু যেই মাত্র তাহার দেওয়া রাখীটি খুলিতে গেলাম তখন বলিল, "মা, এ রাখীটি খুলিওনা।" অর্থাৎ রাখীটি আমাকে দিয়াও উহার মধ্যে তাহার নিজের একটু অংশ রাখিয়াছে। সেই জন্য রাখীটার নাম দিলাম 'মেরা' (আমার) (সকলের হাস্য)।

সকালবেলা আজ আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। আমিও অধিক সময় আশ্রমে ছিলাম না কারণ গোপীবাবু দুইজন লোককে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল।

আজ কয়েকদিন যাবৎ রাত্রিবেলা মাকে সাজাইয়া দোলনায় উঠাইয়া আশ্রমের মেয়েরা দোল দিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। আজ ঝুলনপূর্ণিমা বলিয়া রাত্রিতে ঝুলন উৎসবের বিশেষভাবে আয়োজন করা হইয়াছে। কন্যাপীঠের দোতালার হলঘরটিতে ফুল পাতা দিয়া ছোট একটি কুঞ্জের মত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে সুন্দর একখানি কাঠের দোলনা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দোলনাখানির উপর রেশমের বিচিত্র একখানি ছোট শয্যা। শ্রীশ্রীমা পীতাম্বর বেশে উহার উপর বসিয়াছেন। মায়ের গলায় এবং হাতে ফুলের মালা। মস্তকে একটি স্বর্ণাভ মুকুট ঝলমল করিতেছে। ভক্তগণ মনোরম পুষ্পমাল্য এবং রাখী দিয়া মাকে প্রণাম করিতেছেন। মা আসনের উপর হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন। মুখখানি দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, কন্যাপীঠের কুমারীগণ মায়ের দোলাখানি ধীরে ধীরে দোলাইয়া ঝুলনের গান করিতেছে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। দেখিয়া মনে হইল যেন শ্রীবৃন্দাবনের একটি কুঞ্জের দৃশ্য সহস্র সহস্র শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করিয়া কাশীর গঙ্গাতটে নিজকে প্রকট করিয়াছে। গঙ্গার আজ আর সরোষ গর্জ্জন নাই। পূর্ণিমার চাঁদ শুভ্র খণ্ডমেঘের সূক্ষ্ম উত্তরীয় অম্বর পথে উড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া যেন ঐ দৃশ্য দেখিতেছে। ধীরে ধীরে মেয়েদের গান চলিতেছে। আমরা সকলেই অনিমেষ লোচনে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকাইয়া আছি। শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ নিজ হাতে সকলকে রাখী বাঁধিয়া দিয়া শেষে দোলনার উপর শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার উঠিয়া বসিয়া গান আরম্ভ করিলেন। সকলেই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ গেলে মা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঐ ঘরের মধ্যেই পা চারি করিয়া হাত তালি দিয়া গান করিতে লাগিলেন। আঁখি যুগলভাবে যেন ঢুলু ঢুলু। ভাল করিয়াও যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। দেহ হইতে পীতবাস খুলিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের অবাধ গতির জন্য ঘরের মাঝখানে জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। খুকুনীদিদি সতর্কনয়নে মাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, পাছে মা পড়িয়া যান।

এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া মা আবার দোলনায় গিয়া বসিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ১২।।টা বাজিয়াছে। এইবার ঝুলন উৎসব শেষ হইল। আমরা মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রায় ২টার সময় শুনিতে পাইলাম, কে যেন আমাকে বাহির হইতে ডাকাডাকি করিতেছে। কপাট খুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখি যে আশ্রমের সুধাংশুদাদা প্রসাদ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। শুনিতে পাইলাম যে শ্রীশ্রীমায়ের আদেশেই এত রাত্রে তিনি প্রসাদ লইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গুরুকে চিনিয়া নিবার উপায়

২৪শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ৯।৮।৪৯)

আজ আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি অনেকেই হলঘরে উপস্থিত ছিলেন। মার নিকট প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে ডাঃ পান্নালাল যাহা করিয়া থাকেন আজও বোধ হয় তিনি তাহা করিয়াছেন অর্থাৎ উড়িয়াবাবার উপদেশ হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইয়া মাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আজ বোধ হয় গুরু সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল। গুরুকে কিভাবে চিনিয়া নিতে হইবে তাহা বুঝাইতে গিয়া ঐ পুস্তকে লেখা ছিল যে যাহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা জন্মে এবং যিনি কিছুই গ্রহণ করেন না—তাঁহাকেই গুরু করা উচিত। ডাঃ পান্নালাল প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না এই বা কেমন? উত্তরে মা বলিলেন, "তোমরা হয়ত দেখিতেছ যে তিনি কিছু গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ গুরুর) দিক হইতে কিছুই গ্রহণ বর্জ্জন নাই। তোমাদের শাস্ত্রে বলে না যে চক্ষু নাই অথচ দেখিতেছেন, কান নাই অথচ শুনিতেছেন, পা নাই অথচ চলিতেছেন—ইহাও সেইরূপ।"

ডাঃ পান্নালাল—এরূপ লক্ষণ দিয়া গুরু ধরা ত বড় শক্ত। আমি যদি দেখি যে কেহ কিছু গ্রহণ করিতেছেন তবে কেমন করিয়া বুঝিব যে তিনি গ্রহণ করিতেছেন না ?

মা—যখন গুরু কাহাকেও গ্রহণ করেন তখন তাঁহার স্পর্শ তিনি হৃদয়ে রাখিয়া যান। তাহার পক্ষে এ সব প্রশ্ন উঠে না।

কুসুম ব্রহ্মচারী—কেমন করিয়া বুঝিব যে গুরু হৃদয়ে স্পর্শ রাখিয়া গেলেন ?

মা—সকল কথা সকল সময়ে বলা আসে না।

মহাপুরুষের পা স্পর্শ করিবার ফলাফল, শক্তিপাত
২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার (ইং ১১।৮।৪৯)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া মাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলাম। স্বামী সদেবানন্দ প্রভৃতি অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নানা কথার মধ্যে শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়ের দেহত্যাগ সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছে তাহা প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী মাকে বলিলেন। গুজবটি এই—রামঠাকুর মহাশয় যখন কলিকাতাতে আসিয়াছিলেন তখন একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করেন। ইহাতে নাকি ঠাকুর মহাশয় তাহাকে বলেন যে সে এই কাজ করিয়া তাঁহার এবং ঠাকুরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই নাকি ঠাকুরের দেহত্যাগ হয়। আমি মাকে বলিলাম যে এই গুজব আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী—এইভাবে পদলেহন করিয়া কাহারও প্রাণান্ত ঘটান যায় কি ?

মা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তবে কেহ কেহ যে শ্রীশ্রীমায়ের পদলেহন করিয়াছে—এ কথা মা বলিলেন। পদতল যে শরীরের একটা বিশিষ্ট স্থান এ কথাও মা বলিলেন।

আমি—মা, তুমি বলিয়াছ যে মস্তকই শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ, কারণ এ দেহের মূল নাকি মস্তকে। যদি তাহা হয় তবে কাহারও অনিষ্ট করিতে গিয়া লোকে তাহার মস্তক স্পর্শ না করিয়া পা স্পর্শ করিবে কেন ? মূলে আঘাত করিলেই ত ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

মা—শক্তির বাহির হইবার পথ চাই ত ? তোমরা বল না যে

গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বাহির হইয়াছেন। এই যে পা স্পর্শ করা হয় ইহারও নানারকম আছে। রান্না করিতে গিয়া আগুনে কড়াই চাপাইয়া যদি তেল গরম করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ছেৎ করিয়া কেমন একটা শব্দ হয় না ? জলগুলিও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। সেইরূপ সাধনের অবস্থায় শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সতেজ হয়। লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সবই সতেজ হইয়া উঠে। কাজেই এই অবস্থায় হঠাৎ পা স্পর্শ হইলে গরম তেলে জল পড়ার মত দেহের উপর একটা ক্রিয়া হইয়া যায়। এ শরীরের সাধন অবস্থায় যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতেই এ সব কথা বলিতে পারি। কিন্তু এ সব অবস্থাও অনন্ত, কাজেই ইহার কত কথাই বা বলা যায় ? তবুও দুই একটা কথা বলিতেছি। সাধনের অবস্থায় দেহ বা পা স্পর্শ করিলে যে স্পর্শ করে এবং যাহাকে স্পর্শ করে উভয়েই একটা ধাক্কা পায় এবং উভয়েরই ইহা ক্ষতির কারণ হয়। কারণ এই অবস্থায় দেহের গতিটা তীব্র থাকে কিনা, তাই ঐ তীব্র গতিতে বাধা পাইলে উভয়েরই ক্ষতি হয়। যেমন জোরে মোটর গাড়ী চালাইয়া গিয়া যদি কোন জিনিষের উপর পড়া যায় তাহা হইলে যেমন গাড়ী ও ঐ জিনিষের ক্ষতি হয়, ইহাও সেইরূপ। আবারও এমন হয় যে একটা দেয়ালের উপর একটা ঢিল ছুড়িয়া মারিলে ঢিলটা দেওয়ালে লাগিয়া পুনরায় যে উহা ছুড়িয়া মারিয়াছিল তাহার গায়েই আসিয়া লাগে; দেওয়ালের কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় না, সেইরূপ অনেক সময় সাধককে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু যে স্পর্শ করে ধাক্কাটা তাহার উপরই আসিয়া পড়ে। ইহার মধ্যেও কিন্তু অনেক অবস্থা আছে। লোকের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বলিয়া তিনটা গুণ আছে না ? সাধনের অবস্থায় এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে তাহার উপরও স্পর্শের ফল কতকটা নির্ভর করে। রজঃ গুণ প্রবল থাকিলে ক্রোধের প্রকাশ হইতে পারে। যদিও ইহা ঠিক ক্রোধ নয় তবে প্রকাশের ভঙ্গীটা এইরূপই বটে। যদি সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে তবে যাহাকে স্পর্শ করা যায় তাহার দেহের উপর আঘাত লাগিলেও ক্রোধের কোন প্রকাশ

মা—যখন গুরু কাহাকেও গ্রহণ করেন তখন তাঁহার স্পর্শ তিনি হৃদয়ে রাখিয়া যান। তাহার পক্ষে এ সব প্রশ্ন উঠে না।

কুসুম ব্রহ্মচারী—কেমন করিয়া বুঝিব যে গুরু হৃদয়ে স্পর্শ রাখিয়া গেলেন ?

মা—সকল কথা সকল সময়ে বলা আসে না।

মহাপুরুষের পা স্পর্শ করিবার ফলাফল, শক্তিপাত
২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার (ইং ১১।৮।৪৯)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া মাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলাম। স্বামী সদেবানন্দ প্রভৃতি অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নানা কথার মধ্যে শ্রীযুক্ত রামঠাকুর মহাশয়ের দেহত্যাগ সম্বন্ধে যে গুজব রটিয়াছে তাহা প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী মাকে বলিলেন। গুজবটি এই—রামঠাকুর মহাশয় যখন কলিকাতাতে আসিয়াছিলেন তখন একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করেন। ইহাতে নাকি ঠাকুর মহাশয় তাহাকে বলেন যে সে এই কাজ করিয়া তাঁহার এবং ঠাকুরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই নাকি ঠাকুরের দেহত্যাগ হয়। আমি মাকে বলিলাম যে এই গুজব আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী—এইভাবে পদলেহন করিয়া কাহারও প্রাণান্ত ঘটান যায় কি ?

মা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তবে কেহ কেহ যে শ্রীশ্রীমায়ের পদলেহন করিয়াছে—এ কথা মা বলিলেন। পদতল যে শরীরের একটা বিশিষ্ট স্থান এ কথাও মা বলিলেন।

আমি—মা, তুমি বলিয়াছ যে মস্তকই শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ, কারণ এ দেহের মূল নাকি মস্তকে। যদি তাহা হয় তবে কাহারও অনিষ্ট করিতে গিয়া লোকে তাহার মস্তক স্পর্শ না করিয়া পা স্পর্শ করিবে কেন ? মূলে আঘাত করিলেই ত ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

মা—শক্তির বাহির হইবার পথ চাই ত ? তোমরা বল না যে

গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বাহির হইয়াছেন। এই যে পা স্পর্শ করা হয় ইহারও নানারকম আছে। রান্না করিতে গিয়া আগুনে কড়াই চাপাইয়া যদি তেল গরম করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ছেৎ করিয়া কেমন একটা শব্দ হয় না ? জলগুলিও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। সেইরূপ সাধনের অবস্থায় শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সতেজ হয়। লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সবই সতেজ হইয়া উঠে। কাজেই এই অবস্থায় হঠাৎ পা স্পর্শ হইলে গরম তেলে জল পড়ার মত দেহের উপর একটা ক্রিয়া হইয়া যায়। এ শরীরের সাধন অবস্থায় যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতেই এ সব কথা বলিতে পারি। কিন্তু এ সব অবস্থাও অনন্ত, কাজেই ইহার কত কথাই বা বলা যায় ? তবুও দুই একটা কথা বলিতেছি। সাধনের অবস্থায় দেহ বা পা স্পর্শ করিলে যে স্পর্শ করে এবং যাহাকে স্পর্শ করে উভয়েই একটা ধাক্কা পায় এবং উভয়েরই ইহা ক্ষতির কারণ হয়। কারণ এই অবস্থায় দেহের গতিটা তীব্র থাকে কিনা, তাই ঐ তীব্র গতিতে বাধা পাইলে উভয়েরই ক্ষতি হয়। যেমন জোরে মোটর গাড়ী চালাইয়া গিয়া যদি কোন জিনিষের উপর পড়া যায় তাহা হইলে যেমন গাড়ী ও ঐ জিনিষের ক্ষতি হয়, ইহাও সেইরূপ। আবারও এমন হয় যে একটা দেয়ালের উপর একটা ঢিল ছুড়িয়া মারিলে ঢিলটা দেওয়ালে লাগিয়া পুনরায় যে উহা ছুড়িয়া মারিয়াছিল তাহার গায়েই আসিয়া লাগে; দেওয়ালের কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় না, সেইরূপ অনেক সময় সাধককে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু যে স্পর্শ করে ধাক্কাটা তাহার উপরই আসিয়া পড়ে। ইহার মধ্যেও কিন্তু অনেক অবস্থা আছে। লোকের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বলিয়া তিনটা গুণ আছে না ? সাধনের অবস্থায় এই 'তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে তাহার উপরও স্পর্শের ফল কতকটা নির্ভর করে। রজঃ গুণ প্রবল থাকিলে ক্রোধের প্রকাশ হইতে পারে। যদিও ইহা ঠিক ক্রোধ নয় তবে প্রকাশের ভঙ্গীটা এইরূপই বটে। যদি সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে তবে যাহাকে স্পর্শ করা যায় তাহার দেহের উপর আঘাত লাগিলেও ক্রোধের কোন প্রকাশ

হয় না এবং যে স্পর্শ করে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে দেহে দূষিত গুণ প্রবেশ করে বলিয়া সাধকের দেহে বিদ্যুৎ স্পর্শের ধাক্কার মত একটা ধাক্কা অনুভব হয়। ইহার ফলে সাধক হয়ত কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বিকল হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেহ ঢলিয়া পড়িয়া যায়। আবার অনেক সময় দেহটা ঠিক থাকিলেও বিকল ভাবটা কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েকদিনের জন্য থাকে। সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। আবার সাধক এমনভাবে স্থিত থাকিতে পারে যে ঐ অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়িতে পারে। যেমন কোন আঘাত পাইলে আমরা কতকটা অজ্ঞাতসারেই "উঃ" বলিয়া উঠি, সেইরূপ সাধক ঐ অবস্থায় অজ্ঞাতসারে কিছু বলিয়া ফেলিতে পারে। এই অবস্থায় তাহার মুখ হইতে যে কথা বাহির হইবে তাহা ফলিতে বাধ্য। চমকিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হয়, সেইরূপ সাধকের দেহ স্পর্শ করিলে যেমন তাহার দেহে ধাক্কার মত একটা লাগে আবার ঐ স্পর্শের ফলে শক্তিপাতও হইতে পারে। অবশ্য শক্তিপাত হইতে হইলে যে সকল সময়েই ধাক্কা লাগিবে এমন কোন কথা নয়। কেহ হয়ত কোন মহাত্মাকে প্রণাম করিল, প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিপাত হইয়া গেল। এই শক্তিপাত দৃষ্টি দ্বারা হইতে পারে, হাত দিয়া স্পর্শ করিলে হইতে পারে, ফুল, ফল, কাপড় ইত্যাদি যাহা দেওয়া যায় তাহা হইতেও হইতে পারে। কাহারও নিকট চিঠি লিখিয়া হইতে পারে; আবার ব্যারামের ভিতর দিয়াও হইতে পারে। যেমন কেহ চিঠি লিখিল যে অমুকের অসুখ হইয়াছে এবং সে খুব যন্ত্রণা পাইতেছে। চিঠিখানা কিন্তু আমার কাছেও লেখা হয় নাই, অন্যের কাছে লেখা হইয়াছে। সে নিজেই উহা পড়িতেছে, কিন্তু যেইমাত্র অসুখের সংবাদ আমার কানে আসিল অমনি শক্তিপাত হইয়া গেল। আবার কোনরূপ উপলক্ষ্য না লইয়াও এই শক্তিপাত হইতে পারে।

আমি—এই যে শক্তিপাতের কথা বলিলে ইহা কি কোন একটা অবস্থা হইতে হয়, না এমন কেহ কেহ আছেন যাহাদের নিকট প্রণতঃ

হইলেও শক্তি পাওয়া যায় ?

মা—(হাসিয়া) দেখ, রসগোল্লা যদি কোন জায়গায় রাখা যায় তবে তাহা হইতে রস আপনিই গড়াইয়া পড়ে এবং ঐখানে পিঁপড়া আসিয়া জোটে। আবার এমনও খেয়াল হইতে পারে যে এখন যদি কেহ স্পর্শ করে তবে ঐ স্পর্শের কোন ফল সে পাইবে না। এই অবস্থায় কেহ যদি পা স্পর্শ করে তবে সে উহার কোন ফলই পায় না। এইরূপ কত রকমই হয়। এ শরীরের একটা সময় ছিল যখন কেহ শরীরকে প্রণাম করিলেই হাতটি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে উপরে উঠিয়া যাইত।

মাকে প্রণাম করা এবং সিন্দুর দেওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম

ডাঃ পান্নালাল—মা, আমি একটা প্রশ্ন করিতে চাই।

মা—বল।

ডাঃ পান্নালাল—আপনি যে আমাদিগকে পা স্পর্শ করিতে দেন না তাহা কি আমাদিগকে রসগোল্লা হইতে বঞ্চিত রাখার জন্য? (মা হাসিতে লাগিলেন)।

ডাঃ পান্নালাল—কি জন্য আমাদিগকে পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেন না?

মা—পিতাজী; ইহা এ শরীরের খেয়াল। এই যে পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম ইহাও এ শরীরের বেলায় মাঝে মাঝে হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন পা স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। পরে আবার স্পর্শ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। পরে আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখন ত আর এ শরীরকে সিন্দুর পরাইয়া দেওয়া হয় না, কিন্তু এমন ছিল যখন এ শরীরকে সিন্দুর দিয়া লাল করিয়া দিত। তখন কপালে এবং সিঁথিতে সিন্দুর দিত আবার সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া উহা হইতে কিছুটা নিজেরা তুলিয়া নিত। ঐ সিন্দুর তুলিতে শুধু যে সিন্দুর নিত তাহা নয় সঙ্গে সঙ্গে এ শরীরের চুল ও উপড়াইয়া নিত। বাংলা দেশেই ত এ সব বেশী ছিল। ইহা দেখিয়া ইহারা নিয়ম করিল যে মায়ের কপালে বা মাথায় সিন্দুর দেওয়া যাইবে না, মায়ের

হাতের পাতায় সিন্দুর দিতে হইবে। ইহার ফল এই হইল যে মাথায় ত সিন্দুর দিতই আবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের পাতায় সিন্দুর দিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া নিয়ম করিল যে সিন্দুর মায়ের মাথায় বা হাতে দিয়া কাজ নাই, শুধু পায়ে দিলেই হইবে। ইহার ফলে শরীরের চার জায়গায় সিন্দুর পড়িতে লাগিল—কপালে, সিঁথিতে, হাতের পাতায় এবং পায়ে। শেষে স্থির নিয়ম করা হইল যে মায়ের শরীরের কোন স্থানেই সিন্দুর দেওয়া চলিবে না, সিন্দুর দিতে হইলে একটা রেকাবীতে দিতে হইবে এবং ঐ রেকাবী আমার সম্মুখে রাখা হইত। ইহার ফল আরও চমৎকার হইল। লোক আমার শরীরের চার জায়গায় সিন্দুর দিতই, অধিকন্তু রেকাবীতে সিন্দুর দিতে লাগিল। (সকলের হাস্য) এদিকে যখন চলিয়া আসিলাম তখন হইতেই সিন্দুর দেওয়া কমিয়া গেল। এখনও বাংলা দেশে গেলে কেহ কেহ সিন্দুর দিয়া থাকে।

পা স্পর্শ করিয়া প্রণামের ব্যাপারও এইরূপ। লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া যখন পায়ে প্রণাম করিত তখন তাহাদের নখের স্পর্শে পা চিঁড়িয়া অনেক সময় রক্ত পড়িত। ইহা দেখিয়া অনেকেই চিন্তা করিতে লাগিল যে এই পা ছুঁইয়া প্রণাম করা বন্ধ করা যায় কিনা। আগরপাড়া হইয়া যখন পুরীতে গেলাম তখন পরমানন্দ এবং শিশিরের বাধা সত্ত্বেও দুই একজন পা ছুঁইয়া ফেলিত। একদিন রাত্রে শুনিতে পাইলাম যে পরমানন্দ না খাইয়া আছে। তাহার ঐ না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে তাহার গুরু ব্রহ্মজ্ঞ মা হইতে এই প্রেরণা পাইয়াছে যে যদি কেহ কোন দিন আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করে তবে সেদিন উপবাসী থাকিবে। সেই জন্য সে ঐ দিন না খাইয়া আছে কারণ ঐ দিন কেহ আমাকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়াছিল, ঐ পা স্পর্শের জন্য পরমানন্দকে হয়ত ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন না খাইয়া থাকিতে হইয়াছে। ঐভাবে পা ছুঁইয়া প্রণাম করা বন্ধ হইয়া যায়। পরে অবশ্য পরমানন্দ ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের আদেশেই তাহার উপবাস করিবার নিয়ম ছাড়িয়া দেয়।

এই সব কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২।। বাজিয়া গেল। আজও ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন। এই জন্যই বোধ হয় মা হলঘরে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া আমি মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মপথে ক্ষুধাবৃদ্ধির উপায়

২৭শে শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ১২।৮।৪৯)

আজ সকালে আশ্রমে যাইতে পৌনে এগারটা বাজিয়া গেল। হলঘরে মা বসিয়াছিলেন এবং ডাঃ পান্নালাল কি একটা বহি হইতে পড়িয়া মাকে শুনাইতেছিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া বসিলে যে অংশটি পড়া হইতেছিল উহা আবার পড়িয়া আমাকে শুনাইতে বলিলেন। ডাঃ পান্নালাল বলিলেন, "এই পুস্তকখানা একজন মহাত্মার লেখা। তাঁহার বক্তব্য এই যে যদি কাহারও ধর্ম্মের দিকে ক্ষুধা না হয় তবে তাহার এদিকে না আসাই ভাল। শুধু লোকের অনুকরণ করিয়া বা বহি পড়িয়া বৈরাগ্যের পথে আসিলে ক্ষতিই হয়। সাংসারিক কামনা বাসনা থাকিলে উহাই সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণ করা উচিত, পরে বৈরাগ্যের উদয় হইলে ধর্ম্মপথে আসা ভাল। এ পথে যদি ক্ষুধা না থাকে তবে ভগবানের নাম করাই বৃথাই হয়।" এ সম্বন্ধে মায়ের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে মা বলিলেন, "উহা একদিকের কথা। যে অবস্থায় থাকিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে, ওখানে ঐরূপই মনে হয়। এ শরীরের সাধন অবস্থায় ইহা দেখা গিয়াছে। তবে এ শরীরের কথা এই যে ভগবানের নাম করা কোন অবস্থায়ই বৃথা যায় না। ঐ সব কথা যে বলা হইয়াছে উহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যখন যেদিকে যাইবে, সেদিকে পূর্ণভাবে যাইতে চেষ্টা করিবে। দুই নৌকায় পা দিতে নাই।"

ডাঃ পান্নালাল আবার পড়িতে লাগিলেন। ঐ মহাত্মা বলিতেছেন যে যদি ধর্ম্মের দিকে কিছু কিছু ক্ষুধা থাকে তবে উহা বৃদ্ধি করা যায়। বৃদ্ধি করিবার উপায় হইল—সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ, মনন করা, প্রার্থনা করা। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করা ভাল, তাহা হইলে নিদ্রার মধ্যে উহার ক্রিয়া হইতে থাকে। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "এই

উদ্দেশ্যেই আশ্রমে নিয়ম করা হইয়াছিল যে নিদ্রা যাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। গুরু যেভাবে যাহাকে জপাদি করিতে বলিয়াছেন সেভাবে ত জপ করিতে হইবেই। তাহা ছাড়া নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে শুইয়া শুইয়া ১০৮ বার জপ করিতে হইবে। অথবা যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ বিছানায় বসিয়া বসিয়া জপ করা। তাহা হইলে নিদ্রার মধ্যেও উহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। আবার কাহারও যদি কোন একটা বিশেষ সময়ে যেমন মধ্যরাত্রি, জপ করতে ভাল লাগে তবে ঐ সময়ে জপ করা উচিত। এইরূপ করিতে করিতে হয়ত ঐ সময়ে শক্তিটা তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে এবং একবার যদি উহার প্রকাশ হয় তবে ঐ সময়ে আর জপ না করিয়া থাকা যায় না। যেমন তোমাদের সিনেমা দেখিবার জন্য অনেক সময় মনটা আইঢাই করে, সেইরূপ ঐ সময়ে জপে বসিবার জন্যও মনটা আইঢাই করিবে। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে যেমন জপ করা বলা হইল, সেইরূপ ঐ সময়ে গুরুতে আত্মসমর্পণও অভ্যাস করা চলিতে পারে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে গুরুকে প্রণাম করিয়া সারাদিন ভালমন্দ যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা গুরুকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া এবং ঐভাবে সমর্পণ করিয়া গুরুর চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়া। সারাদিন তোমা দ্বারা যে সব কাজ হইবে তাহা যেন গুরুর পূজা হিসাবেই হয়। অথবা তুমি যেন তাঁহার যন্ত্র হিসাবে সারাদিন কাজ করিতে পার। এইভাবে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়া চলিলেও একসময় গুরুর প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। গুরুর প্রকাশ হওয়া অথবা গুরুকে পাওয়াই হইল নিজকে পাওয়া। তাই গুরুকে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ফিরিয়া পাওয়া।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

শক্তিপাতের হেতু

২৮শে শ্রাবণ, শনিবার (ইং ১৩।৮।১৯৪৯)

আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে মনে ইচ্ছা যে কেহ মাকে প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই মাকে শক্তিপাত

সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কারণ একবার যদি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, উহা অতি সাধারণ হইলেও উহা লইয়াই সকালবেলাটা কাটিয়া যায়। উহাতে বাধা দিয়া নূতন কোন প্রসঙ্গ উঠানো সমীচীন মনে হয় না। শ্রীশ্রীমা ঠিক ১০টার সময়েই হলঘরে আসিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করা মাত্রই আমি মাকে বলিলাম "মা, আজ শক্তিপাত সম্বন্ধে তোমার নিকট আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মা—কথা তোল, যদি কিছু আসে তবে বলা হইয়া যাইবে।

আমি। সেদিন শক্তিপাত সম্বন্ধে তুমি বলিয়াছিলে যেন নানাভাবেই এই শক্তিপাত হইতে পারে, যেমন স্পর্শ দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা, কাহাকেও ফুল, ফল কিংবা কাপড় দান দ্বারা। আবার কোন উপলক্ষ্য না লইয়াও এই শক্তিপাত হইতে পারে।

মা—হাঁ।

আমি—এখন প্রশ্ন হইল যে এই শক্তিপাত কেন হয় এবং কখন হয়? ইহা কি কোন ক্রম হিসাবে হয়, না এ বিষয়ে ভগবানের ষোল আনাই স্বাতন্ত্র্য?

মা—বীজ হইতে গাছ হওয়ার কথা বলা হয় না? বলা হয় যে বীজ পুরাতন হইলে উহা হইতে গাছ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া উহা নষ্ট হয় না। উহা মাটিতে পড়িয়া সার হইয়াই গাছ উঠার সাহায্য করে। হয় বীজ গাছ হইয়া ফুল ফল দিবে, না হয় উহা মাটিতে সার হইয়া গাছের পুষ্টি সাধন করিবে।

আমি—বীজ অর্থ কি শক্তি নয়? গুরুর নিকট হইতে বীজরূপে আমরা কি শক্তি লাভ করি না?

মা—বীজকে শক্তি বলিতেও পার। গুরুর নিকট হইতে বীজ পাওয়াকে তুমি শক্তিপাতও বলিতে পার। আবার বীজ নাই কোথায়? সকল জিনিষের মধ্যেই সকল জিনিষ আছে। সেই হিসাবে বীজ তোমার মধ্যেই আছে। এখানে শক্তিপাতের অর্থ হইল তোমার ভিতর যে অভাব আছে তাহার পূরণ করা, বীজ হইতে গাছ হইতে হইলে যেমন কতকগুলি শক্তির দরকার, যেমন মাটির শক্তি, জলের শক্তি,

সূর্য্যের কিরণের শক্তি ইত্যাদি। সেই রূপ তোমার ভিতর যে বীজ আছে তাহার জাগরণও শক্তিপাত হইতে হইয়া যায়। বীজ মাটিতে পড়িলে উহা হইতে গাছ হইয়া বাহির হইবার জন্য যে জায়গার প্রয়োজন তাহা যেমন মাটির মধ্যে বীজ নিজেই করিয়া লয় সেইরূপ শক্তিপাত হইলে উহা হইতেই অভাব পূরণের জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা আসিয়া থাকে।

আমি। মা, আমার প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। আমার প্রশ্ন হইল, যে শক্তিপাত হইয়া আমাদের অভাব পূর্ণ হয় উহা কি আমাদের কর্ম্মসাপেক্ষ? অর্থাৎ জাগতিক কর্ম্ম করিতে করিতে উহার বিফলতা দেখিয়া যখন আমরা ভগবৎমুখ হই তখনই কি শক্তিপাত হয়, না আমরা ভগবৎ বিমুখ থাকিলেও শক্তিপাত হয়?

মা। পাত্র যদি না থাকে তবে শক্তিপাত কোথায় হইবে? শক্তিধারণ করিবার আধার ত চাই।

আমি। তাহা যদি হয় তবে ত শক্তিপাত কর্ম্মসাপেক্ষ। কিন্তু তুমি এই মাত্র বলিলে যে বীজ যেমন গাছ হইবার জন্য তাহার স্থান নিজেই মাটির মধ্যে করিয়া লয়, সেইরূপ ঐ শক্তিপাত হইতেও এ শক্তি ধারণ করিবার আধারও সৃষ্ট হইতে পারে এবং ঐভাবে শক্তিপাত হইলে উহা যে ভগবানের খেয়াল বা স্বাতন্ত্র্য হইতে হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি।

মা। হাঁ, কর্ম্মের অপেক্ষা রাখিয়াও শক্তিপাত হয় আবার ভগবানের স্বাতন্ত্র্য হইতেও শক্তিপাত হয়।

আমি। মা, জাগতিক কর্ম্মের স্বভাবই হইল অভাব জাগাইয়া রাখা। জাগতিক সুখের জন্যই আমরা জন্ম জন্মান্তর হইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। এইভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইতে যাইতে কখন আমাদের সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসে যখন আমরা ভগবৎ মুখ হইতে পারি এবং যে অবস্থায় শক্তিপাত হইতে পারে?

মা। এই যে কর্ম্ম কর্ম্ম বলিতেছ এই কর্ম্মের মূল কোথায়? মূলতঃ সেই এক সত্তাই। জাগতিক যে সব কর্ম্ম হইতেছে ইহার

মূলও ত সেই ভগবান্। তবে জানিও এই যে কর্ম্মের গতি, এই গতির মধ্যেই এমন একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় পৌঁছিলে, আপনা হইতেই একটা অতৃপ্তির ভাব, ভগবানের জন্য একটা অভাব বোধ জাগিয়া উঠে এবং এই অবস্থায়ই শক্তিপাত হয়।

আমি। এই ভাবে যদি দেখা যায় তবে শক্তিপাত যে কর্ম্ম সাপেক্ষ এ কথার কোন অর্থ নাই, কারণ ইহাকে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য বলা চলে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। বাস্তবিকই ত তাহাই।

মা। তোমরা জিনিষটা ব্যক্তিগতভাবে দেখ বলিয়া ইহা তোমাদের নিকট আলাদা আলাদা বলিয়া মনে হয়। কর্ম্ম বলিতে তোমরা নিজ নিজ কর্ম্ম বুঝ এবং সেই ভাব হইতেই বল যে আমি এইভাবে কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ভগবানের কৃপা পাইয়াছি। আবার যাহার কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য নাই, সে মনে করে তাহার যাহা কিছু হইতেছে উহা সকলই ভগবানের কৃপার জন্য। ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি ছাড়া যদি কর্ম্মকে দেখা যায় তখন বুঝা যায় যে, যে কর্ম্মের জন্য ভগবানের শক্তিপাত হইয়াছে, সে কর্ম্মও ভগবানেরই কর্ম্ম। এইভাবে দেখিলে কর্ম্ম ও কৃপার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না, এখন তুমি শক্তিপাত সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার সমাধান পাইলে ত?

আমি। হাঁ।

শক্তিলাভের উপায়

আমি। এই মাত্র যে শক্তিপাতের কথা বলা হইল ইহা ভগবানের বা পূর্ণের শক্তিপাত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা ছাড়া শক্তিপাত ত দেবতা হইতেও হইতে পারে?

মা। হাঁ, দেবতা হইতেও শক্তিপাত হইতে পারে। দেখ না, অনেকেই ঘুম হইতে উঠিয়া মাটিতে পা দিবার সময় মাটিকে প্রণাম করে। এই প্রণামের উদ্দেশ্য কি? মাটি বা পৃথিবীকে মা বলিয়া জ্ঞান করে বলিয়াই মাকে পা দিয়া স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রণাম করিয়া লয় এবং এই প্রণামের ফলে একদিন পৃথিবীর শক্তিলাভ হয়। কারণ যে দিন তোমাদিগকে প্রণামের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম

যে কাহারও চরণে নিজকে শূন্য করিয়া ঢালিয়া দিতে পারিলেই সেখান হইতে শক্তি পাওয়া যায়। কেহ আবার বিছানায় শুইবার পূর্ব্বে বিছানাকে প্রণাম করিয়া লয়। এখানেও ঐ একই উদ্দেশ্য। এইভাবে খণ্ড খণ্ড শক্তিলাভ হয়। প্রণাম করিয়া যেরূপে শক্তিলাভ করা যায় আবার দৃষ্টি দিয়াও সেইরূপে শক্তিলাভ করা যায়। কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, বা যে কোন দেবতা বল, তাঁহার কাছে নিজকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকিলেই তাঁহাদের শক্তি তোমার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। দুই ভাবেই শক্তিলাভ করা যায়—এক হইল কর্ম্ম করিয়া আর হইল আত্মসমর্পণ করিয়া।

শক্তিলাভ করা এক কথা আবার ঐ শক্তির ব্যবহার করা অন্য কথা। দেখ না অনেকে ডাক্তারি পাশ করে কিন্তু কেবল ঐ জন্যই তাহাকে ডাক্তার বলা যায় না। সেইরূপ দেবতার শক্তিলাভ করিলেই দেবতা হওয়া যায় না। পূর্ণভাবে যখন ঐ শক্তিলাভ হয় তখনই দেবত্ব হয় এবং ঐভাবে দেবত্বলাভ করিয়াই উহা ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সাধনের অবস্থা সম্বন্ধে তাহাই। কোন একটা অবস্থা পূর্ণভাবে লাভ হইলেই তবে অন্য অবস্থায় যাওয়া যায়। সেই দিন তোমাদিগকে বলিতেছিলাম না যে দৃষ্টি দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা, যে কোন উপলক্ষ্য লইয়াই শক্তিপাত হইতে পারে। পূর্ব্বে এ শরীরের ঐরূপই হইত। এ শরীর যখন বিদ্যাকুটে ছিল তখন একটি ছেলের অসুখ হইয়াছিল। এ শরীর আপনা হইতেই ঐ রোগীর সেবা করিতে গেল। ছেলেটির ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল। এ শরীর গিয়া তাহার মাথায় জলপটি দিতে লাগিল এবং এমনভাবে দিল যে ছেলেটি উহাতে বেশ আরাম পাইল। ইহার পর তাহার রোগের যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেই সে তাহার মাকে বলিত, "বৌঠানকে (বধূঠাকুরাণী) ডাকিয়া আন।" তাহার মা যে তাহার সেবা করিত তাহা তাহার পছন্দ হইত না। আর একদিন হইল কি; তাহাকে ঐভাবে জলপটি দিতে দিতে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া দেওয়া হইল। আমাকে ঐরূপ দেখিয়া উহারা ত অমঙ্গলের আশঙ্কায় অস্থির! কারণ উহারা ছিল নীচ জাতির,

আর এ শরীর ব্রাহ্মণ হইয়া ঐ ছেলের পা স্পর্শ করিল ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিবে কেন? অথচ ভয়ের জন্য কিছু বলিতেও পারে না। এ শরীর যে কেবল মাথা হইতে পা স্পর্শ করিল এমন নয়, আবার ঐ ছেলের পায়ের কাছে বসিয়া কি সব জপ করিতে লাগিল। আরও কি হইল জান? শূন্যে হাত পাতিয়া কিছু গ্রহণ করা হইল এবং উহা ঐ ছেলের মুখে দিয়া তাহাকে উহা গিলিতে বলা হইল। সেও তাহাই করিল। ইহার ফলে তাহার রোগ ভাল হইয়া গেল। ছেলেটির ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল কিনা তাই হাত পাতিয়া কুইনাইনের শক্তি গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ছোট ঐ ছেলেটিকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আমি—মা, তুমি কি শুধু কুইনাইনের শক্তি দিলে, না সঙ্গে সঙ্গে আরও কোন শক্তি দিলে? (সকলের হাস্য)।

মা। ঐ কুইনাইনের শক্তির সঙ্গে আরও যাহা যাইবার তাহাও গেল। ফল তাহার ভালই হইল। এইভাবে স্পর্শ করিয়া তখন রোগ ভাল করা হইত। এই ছেলেটি, ঊষার মেয়ে এবং কানুকে (ভোলানাথের এক আত্মীয়) এইভাবে ভাল করা হইয়াছিল। কানু যে শেষপর্য্যন্ত 'মা', 'মা' নাম করিতে পারিয়াছিল তাহাও কিন্তু ঐভাবে শক্তি দেওয়ার জন্য। যদিও তখন স্পর্শ করিয়া রোগ ভাল করা হইত কিন্তু উহা এমন ভাবে করা হইত যাহাতে লোকে ইহা বুঝিতে না পারে। ধর না, এ সেই রোগীর কাছে বসিয়া আছে, ঐখান হইতে উঠিবার সময় টলিতে টলিতে গিয়া রোগীকে স্পর্শ করিল! লোকে দেখিল যে রোগীর চুলগুলি সরাইবার জন্য যেন এ শরীর এরূপ করিল। যাহা করা হইত তাহা কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নয়।

স্পর্শ করিয়া যেমন রোগ সারান হইয়াছে আবার স্পর্শ না করিয়াও রোগ ভাল করা হইয়াছে। কারণ রোগীই বা কে? রোগ রূপেও ত তিনি। তাই ইচ্ছামাত্র রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে। তবে ঐ যে বলিলাম শূন্যে হাত পাতিয়া শক্তি গ্রহণ করা হইয়াছিল উহার অর্থ হইল এই যে, শক্তি যে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া আছে তাহারই একটা

প্রকাশ ঐ ঘটনা হইতে হইয়া গেল।

আবার মুখের কথা দিয়াও রোগ সারাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় হয়ত বলিয়া ফেলা হইয়াছে যে রোগী ভাল হইয়া যাইবে। আবার যাহাতে ঐ কথা সত্য হয় এজন্য এ শরীরের নানা ক্রিয়াও আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে। আবার নিজে কথা না বলিয়া অন্যের মুখ দিয়াও রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে কথা বাহির করা হইয়াছে। মজাও এমন যে, যে রোগী ভাল হইবে না তাহার আরোগ্য হওয়ার কথা অন্যেও বলিতে পারিত না। কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হইত, "বল ত এ ভাল হইবে কিনা?" ইহার উত্তরে সে বলিতে পারিত না যে এ নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহাতেই বুঝা যায় যে যাহা হইবার তাহা নিশ্চয়ই হইবে।

এখন ত এসব কথা বলা হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তখন এমন একটা ভাব ছিল পাছে কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ে সেইজন্য যেন একটা সশঙ্কিত অবস্থা। মনে হইত এ শরীর হইতে কিছু প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা এ শরীর না থাকাই ভাল; অবশ্য এ অবস্থায়েও অহং ভাব ছিল না; কিন্তু তবুও ঐরূপ সমস্ত লুকাইবার একটা ভাব।

দেবশঙ্করবাবু। এরূপ কেন হইত?

মা। ইহাও স্বাভাবিক। ঐ অবস্থায় এইরূপই হয়। পাছে লোকে ভগবানের দিকে না তাকাইয়া মনে করে যে এ শরীর হইতেই এইসব শক্তি প্রকাশ হইতেছে। সেজন্যই গোপন করিবার এই চেষ্টা, তাহা ছাড়াই এই ছিদ্র পথে সাধকের অহঙ্কার আসিয়াও পড়িতে পারে বলিয়াও সাধকের গোপন করিবার একটা ভাব জাগিতে পারে। আবার এমনও হইয়াছে যে এ শরীর হইতে যাহা কিছু প্রকাশ হইতেছে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপও নাই। এ শরীর ত গরীবের ঘরেই আসিয়াছে কাজেই একখানা কাপড় ছাড়া সেমিজ, জামা ইত্যাদি কিছুই পরা হইত না। তবুও এ শরীর এমন ভাবে কাপড় পরিত যে উহা দেখিয়া সকলে বলিত, "কেমন করিয়া কাপড় পরিতে হয় তাহা ওর কাছ থেকে শিখে আয়।" পুরুষের মধ্যে ত বাহির হওয়া হইতই না। এমন কি

রান্নাঘরে চুলার উপর কিছু আছে এদিকে আমি অন্য এক ঘরে আছি, যদি রান্নাঘরে যাইতে কোন পুরুষের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত তবে বরং চুলার উপর যাহা আছে তাহা পুড়িয়া ছাই হউক তবুও অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া যাওয়া যাইত না। যাহাদের মধ্যে এ শরীর থাকিত তাহাদের এইরূপ অভ্যাস ছিল, কিন্তু এ শরীরেরই যখন একটা বিশেষ অবস্থা চলিত তখন প্রায় উলঙ্গ হইয়াই সকলের সম্মুখে বসিয়া আছি। কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা নাই। আবার ঐভাব কাটিয়া গেলে পূর্ব্বের অবস্থা। এইরূপ কত অবস্থাই গিয়াছে তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়, কারণ এসব অবস্থাও অনন্ত।

দেবশঙ্করবাবু। আপনার বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বের অবস্থা হইতে উন্নত বলিয়া মনে করিতে পারি কি?

মা। তাহা তোমরা জান। অনেকে ত বলে, "পূর্ব্বে ইহার কেমন সুন্দর অবস্থা ছিল, এখন আর উহা নাই!" আমি বলি, যে যাহা বলে আমি তাহাই। তোমরা যদি উন্নত মনে কর তবে উন্নত, যদি মনে কর যে পূর্ব্বের অবস্থা হইতে পতন হইয়াছে তবে তাহাই। এক কালে এ শরীর শিশু ছিল তাহার পর ইহার মধ্যে সাধক, দেবত্ব, অবতারত্ব ইত্যাদি কত কিছুর প্রকাশ হইল তাহার পর আবার যাহা ছিল তাহাই আছে।

আমি। তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে দৃষ্টি ইত্যাদি কোন উপলক্ষ্য লইয়া যেমন শক্তিপাত হয় আবার কোন উপলক্ষ্য ছাড়াও শক্তিপাত হইতে পারে। ইহা হয় কেমন করিয়া?

মা। (হাসিয়া) কেন? ভগবান ত সর্ব্বত্রই আছেন এই ভাব হইতেই যে কোন স্থানে শক্তি ফুটাইয়া তোলা যায়।

আমি। সেদিন আরও বলিয়াছিলে যে রসগোল্লা হইতে রস যেমন আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। এই যে অনবরত শক্তিক্ষরণ ইহা জগৎগুরুর অবস্থা হইতে হয়, না কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে হয়?

মা। কোন ব্যক্তি হইতে ইহা হইবে? সেই জন্যই ত বলা হয় যে ভগবানের কৃপা সর্ব্বত্রই বর্ষণ হইতেছে। এই যে বর্ষণ, ইহা

হইতেছে পাত্র পূর্ণ হইয়া উপ্‌ছাইয়া পড়ার মত। এখানে দেওয়ার কোন প্রশ্নই নাই। আবার আমরা ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছি বলিয়া এবং আমাদের অভাব আছে বলিয়াই বলা হয় যে শক্তিপাত হইল। এক অবস্থা হইতে দেখিলে মনে হয় যে তাঁহার কৃপা অনন্ত ধারায় সর্ব্বদাই অনবরত পড়িতেছে, আবার অন্য অবস্থায় বলা হয় যে, কোন বিশেষ স্থান হইতে শক্তি বা ভগবৎ কৃপা পাত হইল।

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে ১২।। বাজিয়া গেল।

দেহস্পর্শ হইতে শক্তির আদান-প্রদান

২৯শে শ্রাবণ, রবিবার (ইং ১৪।৮।১৯৪৯)

আজ সকালবেলা হইতেই বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে তাই আশ্রমে যাইতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। মা হলঘরেই বসিয়াছিলেন। বাটুদাদা, ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ আলোচনা যে হইতেছিল তাহা মনে হইল না। কিছুক্ষণ পর বাটুদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি অসমান শক্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তি একে অপরকে স্পর্শ করে তবে ইহাতে এই দুইজনের কোন লাভ বা ক্ষতি হয় কি?

মা। যদি অশুদ্ধগুণ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাব সম্পন্ন অপর কাহাকেও স্পর্শ করে তবে উভয়ের মধ্যে গুণের আদান-প্রদান হয়, যদি না ঐ গুণ প্রবেশ করিবার পথ না বন্ধ থাকে। অর্থাৎ যাহার অশুদ্ধগুণ তাহার অশুদ্ধগুণের কিছুটা শুদ্ধগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে আর যাহার শুদ্ধগুণ ঐ শুদ্ধগুণের কিছুটা অশুদ্ধগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা যে কেহ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া দেয় তাহা নয়। ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। আবার এমন অবস্থাও আছে যাহাতে অপরের কোন খারাপ গুণ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। অবশ্য ইহা সাধারণ নয়। সাধারণতঃ লোকের শুদ্ধ এবং অশুদ্ধগুণ দুই-ই গ্রহণ করিবার পথ খোলা থাকে।

বাটুদাদা। তাহা হইলে ত খুব সাবধান হইয়া থাকা দরকার।

মা। হাঁ, তবে সাবধানে থাকাও সহজ নয়। এই সাবধান থাকার

জন্য নূতন করিয়া বন্ধন গ্রহণ করিতে হয় এবং ঐ বন্ধন রাখিয়া চলাও সহজ নয়। লোক লজ্জা ইত্যাদি নানা বাধাই আসিয়া পড়ে।

সকল আশ্রমেই ধর্ম্মলাভ হইতে পারে

ইহার পর ডাঃ পান্নালাল একটি হিন্দী পুস্তক হইতে মাকে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। পুস্তকে লেখা ছিল যে, যে অবস্থায় আছে উহা ছাড়িয়া তাহার অন্য অবস্থায় যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ কেহ যদি সংসার আশ্রমে থাকে তবে উহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহা পড়িয়া ডাঃ পান্নালাল বলিলেন, "মা, একথাগুলি কি ঠিক হইল?"

মা। তোমাদের কাছেই শুনা যে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, (সকলের হাস্য) কথা হইল যাহা ধর্ম্মলাভের অনুকুল তাহাই গ্রহণ করা উচিত, উহা গৃহস্থ আশ্রমেরই হউক, কি সন্ন্যাসই হউক। সংসার করিয়া যে ধর্ম্মলাভ হয় না একথা ত ঠিক নয়। যদি কেহ মনে করে যে পিতামাতার সেবা করাই তাহাদের পরম ধর্ম্ম এবং ঐ ভাব হইতে সে যদি ঠিক ঠিক করিয়া যায় তাহা হইলে ঐ অবস্থায়ও তাহার ভগবানের প্রকাশ হইতে পারে। ভগবান লাভের যাহা অনুকুল নয় তাহাই ত্যজ্য। বিবাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা ত শাস্ত্রেই আছে। সেইজন্য স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নী বলা হয়। তন্ন তন্ন করিয়া ঋষিরা সমস্ত অবস্থার জন্যই ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন। অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া যায় সত্য, কিন্তু বনে গিয়াও আবার সংসার পাতিয়া বসে। ইহা ত ভাল নয়। এইসব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ঐ পুস্তকে বলা হইয়াছে যে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। তবে তাঁহার ডাক যদি আসে তবে আর এসব কথা টিকে না।

তত্ত্বপ্রকাশের দৃঢ়তা অনুভূতি সিদ্ধ নাও হইতে পারে

৩০শে শ্রাবণ, সোমবার (ইং ১৫।৮।১৯৪৯)

আজও সকালবেলা আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। আজ অনেক লোক আসিয়াছে। ডাঃ পান্নালাল নিত্য যাহা করেন

আজও তাহা করিতেছেন, অর্থাৎ কোন সাধুর লেখা হিন্দী পুস্তক হইতে মাকে পড়িয়া শুনাইতেছেন আর প্রশ্ন করিতেছেন। মাকে কি প্রশ্ন করা হইয়াছিল জানি না তবে মাকে বলিতে শুনিলাম—

"এই যে লোকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিতে জোরের সহিত বলে, তাহা নানা কারণে হইতে পারে। এক হইতে পারে যে, সে কোন বিষয় অনুভূতিতে পাইয়াছে, সেইজন্য উহা প্রকাশ করিতে দৃঢ়তার সহিত কথা বলিতেছে। আবার মানুষের মধ্যে বিচার বুদ্ধি আছে ত? সেইজন্য কাহারও কাছে কিছু যদি বিচার সিদ্ধ হয় তবে উহা প্রকাশ করিতেও দৃঢ়তা আসিতে পারে। আবার কেহ কিছু পুঁথি-পুস্তক পড়িয়াও উহা বলিতে গিয়া জোর দিয়া বলিতে পারে। কাজেই কেহ কিছু জোরের সহিত বলিলেই যে উহা অনুভব সিদ্ধ হইবে তাহা বলা যায় না। যে ধরিতে জানে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে কোথা হইতে এই দৃঢ়তা আসিতেছে। এই তিন প্রকার উক্তির মধ্যেই কিন্তু আনন্দের আভাস আছে; কিন্তু অনুভবসিদ্ধ কোন বিষয়ের যে আনন্দ উহা বিচারসিদ্ধ আনন্দ হইতে ভিন্ন। আবার বিচারসিদ্ধ বিষয়ের আনন্দ সাধারণ পুঁথি-পুস্তক হইতে লাভ করা জ্ঞানের আনন্দ হইতে ভিন্ন। এগুলি ধরা বড় শক্ত।"

ডাঃ পান্নালাল আবার পুঁথি হইতে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। পুস্তকে লেখা ছিল যে কুণ্ডলিনী শক্তি যে মূলাধার সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া বলা হয় তাহা ঠিক নয়। কেবল মূলাধার কেন, সমস্ত চক্রের মধ্যেই ঐ শক্তির কিছু কিছু ক্রিয়া হয়, তাহা না হইলে জীবনযাত্রা সম্ভব হইত না। এই পর্য্যন্ত পড়িয়া ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কথাগুলি কি ঠিক?"

মা। বিলকুল ঠিক। (সকলের হাস্য)।

ডাঃ পান্নালাল। কিন্তু আমরা ত শুনিয়াছি যে এই শক্তি সাধারণের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়ই থাকে।

মা। যাহারা বলে যে এই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে তাহারাও ঠিক কথাই বলে।

ডাঃ পান্নালাল। আপনার এই জাতীয় কথাই আমরা বুঝিতে পারি না—যে যাহা বলে সবই ঠিক!

মা। তবে কি বলিব? যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যে যে অবস্থায় থাকিয়া যাহা বলিতেছে ঐ অবস্থায় সে অন্য কিছু বলিতে পারে না তখন কি আমি বলিব যে সে মিথ্যা কথা বলিতেছে?

ষট্‌চক্র সম্বন্ধে আরও কিছু ডাঃ পান্নালাল মাকে পড়িয়া শুনাইলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনা হইল না।

কিভাবে কাশীর যজ্ঞের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন কাশীর আশ্রমে সাবিত্রীযজ্ঞ আরম্ভ হয় তখন এই যজ্ঞাগ্নি কিভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল সেই কথা মা বলিলেন। মা বলিলেন, "এখানকার যজ্ঞের জন্য ঢাকা হইতে আগুন আনা হইয়াছিল। আজ ২২।২৩ বৎসর যাবৎ ঢাকায় যজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করা হইতেছে এবং ঐ অগ্নি দিয়াই যে এখানে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে এইরূপ স্থির করিয়াই ঢাকা হইতে অগ্নি আনা হইয়াছিল। বাটুকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কিভাবে যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হইতে পারে, তখন সে বলিল যে অরণি দিয়াই যজ্ঞের আগুন করার বিধি; কিন্তু আমার খেয়াল হইয়াছিল যে ঢাকার যজ্ঞের আগুন দিয়াই এখানে যজ্ঞ আরম্ভ করা হইবে। যাহা হউক, বাটুর ঐ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "দেখ, আরও এক কাজ করা যাইতে পারে। ঢাকার যজ্ঞের আগুন এবং অরণির আগুন পাশাপাশি রাখিয়া এই দুই আগুনের সম্মিলিত শিখা হইতেও যজ্ঞের আগুন লওয়া যাইতে পারে।" ইহা শুনিয়া বাটু বলিল যে ঢাকার যজ্ঞের আগুন দিয়াই যজ্ঞ করিলে চলিবে। এদিকে কমলাকান্তের ইচ্ছা যে অরণি দিয়া কিভাবে আগুন জ্বালানো হয় তাহা সে দেখে এবং বাটু যখন বলিয়াছে যে অরণি দিয়া যজ্ঞের আগুন প্রস্তুত করাই শাস্ত্রীয় বিধি তখন সে বাজার হইতে অরণি কিনিয়া আনিল। অরণি কিনিয়া আনা হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। যজ্ঞেশ্বর কি লীলা করেন তাহাই দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম। এদিকে

বাটু প্রভৃতি যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে মণ্ডলী প্রভৃতি দিতে লাগিল। ঢাকা হইতে বাল্‌তিতে করিয়া যে যজ্ঞের আগুন আনা হইয়াছিল উহা বাল্‌তি সহ তামার পাত্রে রাখা হইল। অরণিটিও উহার কাছে রাখা হইল। এদিকে মণ্ডলী ইত্যাদি করিতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল দেখিয়া আমি উপরে চলিয়া গেলাম। বাটুও শুইতে গেল। কমলাকান্ত অরণিটি ভিজা দেখিয়া উহা শুকাইবার জন্য উহা একটা আংটার উপর রাখিয়া দিল। ভোর রাত্রে দেখা গেল যে অরণিটির মাঝখানের কতক অংশ পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া আছে। যখন আংটার উপর ঐ কাঠটি রাখা হয় তখন দেখা গিয়াছিল যে উহার তলদেশে যে সামান্য আগুন আছে তাহা অরণির মোটা কাঠখানাকে গরম করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। অথচ ঐ আগুনই কাঠখানাকে পুড়িয়া কাল অঙ্গার করিয়া দিল। আমারও খেয়াল ছিল যে কি ভাবে যজ্ঞের আগুন করা হয় তাহা দেখিতে হইবে। কাজেই কেহ আমাকে ডাকিবার পূর্বেই আমি যজ্ঞঘরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই বাটু বলিয়া উঠিল, "মা, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। অরণি দিয়া আর যজ্ঞের আগুন করা যাইবে না; কারণ আগুনের আঁচ লাগিয়া উহা দোষযুক্ত হইয়াছে। এখন ঢাকার যজ্ঞের আগুন দিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।"

এই সকল কথা যখন হইতেছিল তখন কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) দাদা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মা তাঁহাকে দগ্ধ অরণিটা আনিতে বলিলেন। উহা আনা হইলে দেখা গেল যে অংশ দগ্ধ হইয়াছিল কমলাকান্ত দাদা উহা এক ছুতারের সাহায্যে পরিস্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে এইভাবে পরিস্কার করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে ইহা দিয়া আবার যজ্ঞাগ্নি করা যাইবে। মা তাহাকে কাঠখানি ভাল করিয়া রাখিয়া দিতে বলিলেন এবং যজ্ঞের শেষ আহুতির দিন ঐ কাঠটিও আহুতি দিতে বলিলেন।

ব্রহ্মচারী কমলাকান্তের কথা

এই সময় কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীর কথা মা উঠাইলেন। কমলাকান্ত দাদা অতি সরল লোক। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত।

আজ ২৩।২৪ বৎসর যাবৎ তিনি সাধু জীবন যাপন করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা যখন শা'বাগে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সে সময় কমলাকান্ত দাদা স্কুলে পাঠ করিতেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি মায়ের কাছে আসিতে আরম্ভ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ সত্ত্বেও কোন অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া ধর্মজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি মায়ের নির্দ্দেশমত বিভিন্ন আশ্রমে ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। সরল প্রকৃতির জন্য সকলেই কমলাকান্ত দাদাকে স্নেহ করে। কমলাকান্ত দাদাকে লক্ষ্য করিয়া মা আমাকে বলিলেন, কমলাকান্ত সম্বন্ধে যে সব কথা আছে তাহা তুমি কি শুনিয়াছ?"

আমি। কিছু কিছু শুনিয়াছি।

এই সময় কেহ কেহ এইসব কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; মা বলিতে লাগিলেন—"ঢাকার আশ্রম যখন প্রথম করা হইল তখন সেখানে জলের বড় অভাব ছিল। রমনা কালী বাড়ীর সম্মুখে একটা পুকুর ছিল, ঐ পুকুর হইতেই জল আনা হইত। ও পুকুরও আশ্রম হইতে অনেকটা দূরে। যে যখন অবসর বা সুবিধা পাইত সেই পুকুর হইতে জল লইয়া আসিত। একদিন কমলাকান্তেরও জল আনিতে ইচ্ছা হইল। সে একটা বেতের ধামা লইয়া জল আনিতে গেল। এক ধামা জল মাথায় করিয়া আনিতে আনিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল।

"আর একবার কে যেন আমাদের ফটো তুলিতে আসিয়াছে। এ শরীরের ভোলানাথের এবং আরও দুই একজনের ফটো তোলা হইল। একটা গাছের নীচে এই ফটো তোলার আয়োজন চলিতেছে। এখানে বসিবার জন্য চেয়ারের দরকার। ভোলনাথ কমলাকান্তকে চেয়ার আনিতে বলিবেন মনে করিয়া যেই 'কমলাকান্ত' বলিয়া ডাক দিয়াছেন অমনি কমলাকান্ত আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ছুটিয়া গিয়া একটা পাঁঠা আনিয়া হাজির করিল। (সকলের হাস্য)

কমলাকান্তের রকমই এই। তাহার আদেশ পালনের এতই আগ্রহ যে কি আদেশ হইল তাহা শুনিবারও তাহার অবকাশ থাকে না।

"আর একবার খিচুরী রাঁধিতে কমলাকান্ত খিচুরীর মধ্যে কর্পূর দিয়াছিল কারণ ভোগের জিনিষের মধ্যে কর্পূরও ছিল। পূজাদি করিতে কমলাকান্ত উহা পূর্ণাঙ্গ ভাবে করিতে চেষ্টা করে। কিছুই সে বাদ দিবে না। অথচ গতবার বাসন্তীপূজার সময় কমলাকান্ত ভোগ না দিয়াই প্রতিমা বিসর্জন করিয়াছিল।"

"কমলাকান্ত যখন এ শরীরের কাছে প্রথম আসিয়াছিল তখন তাহার ম্যালেরিয়া জ্বর এবং মৃগী রোগ ছিল। ঐ মৃগীরোগের ফিটের সময় কখন কখন দাঁত লাগিয়া তাহার জিহ্বা কাটিয়া যাইত এবং মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিত। একদিন আমরা কোথায়ও যাইব। কমলাকান্তকে গাড়ী আনিতে বলা হইয়াছে, সে এক দৌড়ে গিয়া গাড়ী আনিয়াই মৃগীরোগে অজ্ঞান হইয়া আশ্রমে পড়িয়া গিয়াছে। দাঁত লাগিয়া তাহার জিহ্বা কাটিয়া গিয়াছে। আমি যখন গাড়ীতে উঠিতে যাই তখন কমলাকান্তকে ঐ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখি। খেয়ালবশে যাইবার সময় তাহাকে পা দিয়া স্পর্শ করিয়া যাই। উহার পর হইতেই কমলাকান্তের আর মৃগীরোগ হয় নাই। মটরীর (ভোলানাথের ভগ্নী) ফিটের ব্যারাম ঠিক এই ভাবেই ভাল হয়।"

উপবাসের উদ্দেশ্য

৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার (ইং ১৬।৮।১৯৪৯)

আজ বেলা ১০।। টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা কন্যাপীঠের নীচের বারান্দায় বসিয়া আছেন। ঐখানে ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। আজ জন্মাষ্ঠমী বলিয়া মেয়েরা হলঘর সাজাইতেছে। সেইজন্য মা এখানে বসিয়াছেন। মার কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর বাটুদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেদিন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন ত আনন্দ করার দিন। কাজেই সেদিন লোকে ভাল খাইবে, পরিবে এবং আমোদ আহ্লাদ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া লোকে সেদিন উপবাস করে কেন?

মা—এ প্রশ্নের উত্তর ত আচার্য্য দিবে।

আশ্রমে যে যজ্ঞ হইতেছে উহার আচার্য্যপদে বাটুদাদা আছেন।

বাটুদাদা—আচার্য্য জানে না বলিয়াই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

মা—এ প্রশ্নের উত্তর অনেক দেওয়া যায়। এ শরীরের এখন যাহা খেয়াল আসিতেছে তাহাই বলিতেছে। তোমরা বৎসরের সকল দিনই ত একভাবে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিতেছ। উহা হইল একভাবের আনন্দ, উহা হইতে অন্যভাবে আনন্দ লাভ করিবার জন্যই এই উপবাস। উপবাস কিনা তাহাকে লইয়া বসিয়া থাকা। এদিনে এই সঙ্কল্প করিতে হয় কি আজ আর জাগতিক কোন রসের বস্তু গ্রহণ করা হইবে না। আজ ভগবানকে লাভ করিবার যে আনন্দ সেই আনন্দ লাভেরই চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাব হইতেও ভগবানের জন্মদিনে উপবাস করা হইতে পারে। ইহা হইল একদিকের কথা।

আবার অষ্টমী তিথিরও একটা গুণ থাকিতে পারে এবং ঐ দিনে ফলাদি যাহা খাওয়া হয় তাহারও একটা গুণ থাকিতে পারে। এই সব গুণের দিকে লক্ষ্য করিয়াও তোমার প্রশ্নের জবাব চলিতে পারে।

তাহাছাড়া যেমন কোন যোগ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, কারণ উহার একটা আলাদা ফল আছে। সেই হিসাবে ভগবানের জন্মদিনেরও একটা বিশেষ প্রভাব থাকিতে পারে এবং সেই প্রভাব অনুভব করিবার জন্য উপবাসাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকিতে পারে।

উপবাস করিতে গিয়া অনেকের অবশ্য কষ্ট হয়; কিন্তু এই কষ্টও অনেকে ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করে। কারণ ইহা ত ভগবানের জন্যই করা হইতেছে। তাহার জন্য যদি প্রাণও যায় তাহাতেই ক্ষতি কি? রোজকার মত খাওয়া দাওয়া করিলে, এই বিশেষ দিনে ভগবানের স্মৃতি সর্ব্বদার জন্য নাও থাকিতে পারে; কিন্তু উপবাসের ক্লেশই সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেয় যে কি জন্য উপবাস করা হইতেছে। আবার উপবাসের দিনে কেহ যদি কোন কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে

তবে তাহার উপবাসের কষ্টও কম বোধ হয়। যদি ঐ কাজ কোন সাংসারিক কাজ হয় তবে সে মাত্র না খাওয়ার ফলটুকুই লাভ করে। আর ঐ কাজ যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে হয় তবে উপবাসের পূর্ণ ফল পায়।

আবার অনেকের উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং বমির ভাব ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এই জন্য কেহ কেহ উপবাসের দিন সামান্য কিছু আহার করিয়া ভগবানের নাম জপ ইত্যাদি করে।

ডাঃ পান্নালাল—উপবাসের দিন সামান্য কিছু আহার করিয়া নাম জপাদি করা ভাল, না একেবারে না খাইয়া শরীরিক গ্লানিতে "উঃ আঃ" করা ভাল?

মা—সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। তাঁহার জন্য কষ্ট ভোগ করারও একটা ফল আছে। তোমরা মৌনী মাকে ত জান? তাহার উপবাস করিতে বড় কষ্ট হয়। একবার সে শিবরাত্রির উপবাস করিতেছে। রাত্রিতে উপবাসের জন্য তাহার খুব কষ্টও হইতেছিল। এমন সময় সে দেখিতে পাইল যে, যাঁহার জন্য উপবাস করা তিনি আসিয়া তাহার (মৌনী মার) সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহাতে তাহার সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং সে এমনি ঘুম দিল যে পরদিন উঠিতে তাহার অনেক বেলা হইল। উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভগবানকে লইয়া থাকা। এইজন্য আমি সেই আহারকেই সাত্ত্বিক বলি যাহা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। নিরামিষ খাইলেই যে সাত্ত্বিক আহার হইল এমন নহে। যদি নিরামিষ খাইয়া আহারের জন্য মনে মনে একটা গর্ব বোধ হয় তবে বিশেষ লাভ হয় না। যদিও নিরামিষ আহারের কিছুটা গুণ পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের জন্য অনেক অবগুণও ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। সেইজন্যই বলা হয় যে যাহা আহার করিলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক আহার। উপবাস সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। ভগবানকে পাইয়া বসিয়া থাকাই হইল উপবাসের উদ্দেশ্য। একবার যদি ভগবানের নামের রস পাওয়া যায় তবে আহারাদির রস বা জাগতিক রস ফেকাসে হইয়া যায়।

এ শরীরের উপর দিয়া যখন সাধনার খেলাগুলি চলিতেছিল তখন মনে হইত যে জাগতিক সুখভোগ করিবে আবার নিজকে সাধকও বলিবে, ইহা ত হইতে পারে না। আহার বিহার চলিতে থাকিবে আবার সঙ্গে সঙ্গে সাধনাও চলিবে, এরূপ সাধনা—সাধনাই নয়। বাস্তবিক সাধকের অবস্থা বিশেষে এইরূপই মনে হয়। তাঁহার জন্য সর্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশের দিকে সাহায্য হয়। আর জাগতিক দিকে যতটা টান থাকিবে তাহার প্রকাশেরও তত বিলম্ব হইবে।

সাধনের অবস্থায় আহারাদির প্রয়োজনও কমিয়া যায়। তোমরা যে মনে কর যে রীতিমত আহার না করিলে শরীরের বল হ্রাস হয়—ইহা সকল সময় সত্য নয়। অতি অল্প আহারে শরীরের শক্তি হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিও হইতে পারে। অতিরিক্ত আহার হইতেই অধিকাংশ রোগ হয়।

ডাঃ পান্নালাল—অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা গাছের একটা পাতা এবং একটু জল খাইয়াও অনেক দিন কাটাইয়া দেন। ইহা হয় কেমন করিয়া ?

মা—ইহাকে দ্রব্য গুণ বলিতে পার। হয়ত পাতার ঐরূপ কোন গুণ আছে অথবা ঐ পাতাকে একটা উপলক্ষ্যও বলিতে পার। আমরা যখন কৈলাস যাইতেছিলাম একদিন আমাদের এক ডাণ্ডীওয়ালাকে একটা সাপে দংশন করিল। সাপটি দেখিতে কাল। সাপটিকে যেন এখনও চোখে দেখিতেছি। ডাণ্ডীওয়ালাকে দংশন করিলে এ শরীরের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল যে উহাকে অমুক গাছের পাতার রস খাওয়াইয়া দেও। তাহাই করা হইল। ডাণ্ডীওয়ালার আর কোন ক্ষতি হইল না। অথচ যে গাছের পাতার রস খাওয়ানো হইল উহা সাপের বিষের ঔষধ নয়, কাজেই এখানে বুঝিতে হইবে যে ঐ গাছের পাতা উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানই ডাণ্ডীওয়ালাকে রক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহে শক্তির প্রকাশে লোকের ভীতি

ইহার পর অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। কি একটা কথায় ডাঃ পান্নালাল বলিলেন, "মায়ের সংস্পর্শে না আসাই ভাল। একবার

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মার কাছে শুইতে আসেন কারণ তাহার স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন। আর মা তাহাকে হরিনাম করাইয়া সমস্ত রাত্রি নাচাইয়া ছাড়িলেন।"

মা—পিতাজী তোমার কথায় একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে। যখন শা'বাগে এ শরীর এবং ভোলানাথ ছিল তখন ভোলানাথ অনেক সময় এ শরীরের কাছে আসিতে ভয় পাইত। ভয়ও সামান্য নয়। অনেক সময় ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ ভয় পাওয়াও একটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ ঐ সময়ে এ শরীরের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাও একেবারে বদলাইয়া যাইত। যেমন লালবাতি এবং নীলবাতির মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, সেইরূপ এ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও মূর্তির মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিত না। শরীরের এইরূপ ঘন ঘন পরিবর্তন দেখিয়া ভোলানাথ বলিত তোমার কাছে থাকিতে আমার ভয় হয়।" তখন আবার তাকে সান্ত্বনা দিতে বলা হইত, "ভয় কিসের"? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারার পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তাহার ভয় দূর হইত। মেয়েছেলেরাও সেই সময় এ শরীরের কাছে থাকিতে ভয় পাইত। তাহারা বলিত, "দিনের বেলায় তোমার কাছে থাকা যেমন তেমন কিন্তু রাত্রিবেলা তোমার কাছে থাকিতে গা ছম্ ছম্ করে।" এই যে ভয় করা বা গা ছম্ ছম্ করা ইহারও কারণ আছে। বাস্তবিক ঐ সময় শরীরে একটা শক্তির খেলা হইত। যাহারা কাছে থাকিত তাহাদের যদি এই শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকিত তবে অবশ্য তাহারা এই শক্তি হইতে অনেক কিছু লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের গ্রহণের পথটা বন্ধ থাকিত বলিয়া এই শক্তি গিয়া ঐ বন্ধ দরজায় আঘাত করিত। এই আঘাত হইতেই তাহাদের ভয়ের সৃষ্টি হইত।

খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই

আবার অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় মা বলিলেন—"খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই। অনেক সময় কাহাকেও কিছু খারাপ কথা বলিলে ঐ খারাপ কথা তাহার অনিষ্ট না করিয়া

উহা যে বলে তাহার কাছে ফিরিয়া আসে। আবার কখন কখন ঐ খারাপ কথা সত্য হইয়া যায়। এ শরীর যখন মামাবাড়ীতে ছিল তখন এই জাতীয় একটা ঘটনা হইয়াছিল। কালীপূজা হইতেছিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে। কালীপূজা হইতে সাধারণতঃ অনেক রাত্রিই হয়। ঐ বাড়ীতে একটা বৌ আসিয়াছিল। সে তাহার ছোট মেয়ে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকলেই প্রসাদ পাইয়া ঐ বৌকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহাকে প্রসাদ নিতে বলিল; কিন্তু কেহই তাহার মেয়েকে ঐ সময়ের জন্য রাখিতে চাহিল না। কারণ সারাদিনের খাটুনি, তাহাতে আবার এত রাত্রি হইয়াছে। কাজেই সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত। ইহাতে বৌটির মনে মনে রাগ হইল, সে তাহার মেয়ে লইয়াই প্রসাদ পাইতে বসিল। প্রসাদ পাইয়া যখন হাত মুখ ধুইতে উঠিল তখন আর অন্ধকারে ঘটি খুঁজিয়া পায় না। মেয়েটিকে কোল হইতে নামাইয়া সে ঘটি খুঁজিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মেয়েও কোল হইতে নামিবে না। তখন রাগের মাথায় 'তুই মর' বলিয়া মেয়েটিকে জোর করিয়া মাটিতে রাখিয়া সে ঘটি খুঁজিতে গেল; ঘটি লইয়া আসিয়া দেখে যে মেয়েটি আর সেখানে নাই। তখন সে চীৎকার দিয়া উঠিল। ঐ চীৎকারে বাড়ীর লোকজন জাগিয়া উঠিল এবং লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে মেয়ের খোঁজ করিতে লাগিল। এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। শেষে দিনের আলোকে দেখা গেল যে এক জঙ্গলের মধ্যে মেয়ের গায়ের জামা আর মাথার খুলিটা পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই লোকে খারাপ কথা মুখে আনিতে নিষেধ করে। কারণ যদি স্বস্তি মুহূর্তে ঐ কথা বলা হইয়া যায় তবে উহা সত্য হইতে বাধ্য।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২।। টা বাজিয়া গেল। মা উঠিলেন, আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আশ্রমে জন্মাষ্ঠমী উৎসব

সন্ধ্যার পর আমরা সকলে হলঘরে গিয়া বসিলাম। হলঘরখানি অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং তাঁহার

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মার কাছে শুইতে আসেন কারণ তাহার স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন। আর মা তাহাকে হরিনাম করাইয়া সমস্ত রাত্রি নাচাইয়া ছাড়িলেন।"

মা—পিতাজী তোমার কথায় একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে। যখন শা'বাগে এ শরীর এবং ভোলানাথ ছিল তখন ভোলানাথ অনেক সময় এ শরীরের কাছে আসিতে ভয় পাইত। ভয়ও সামান্য নয়। অনেক সময় ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ ভয় পাওয়াও একটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ ঐ সময়ে এ শরীরের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাও একেবারে বদলাইয়া যাইত। যেমন লালবাতি এবং নীলবাতির মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, সেইরূপ এ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও মূর্তির মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিত না। শরীরের এইরূপ ঘন ঘন পরিবর্তন দেখিয়া ভোলানাথ বলিত তোমার কাছে থাকিতে আমার ভয় হয়।" তখন আবার তাকে সান্ত্বনা দিতে বলা হইত, "ভয় কিসের"? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারার পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তাহার ভয় দূর হইত। মেয়েছেলেরাও সেই সময় এ শরীরের কাছে থাকিতে ভয় পাইত। তাহারা বলিত, "দিনের বেলায় তোমার কাছে থাকা যেমন তেমন কিন্তু রাত্রিবেলা তোমার কাছে থাকিতে গা ছম্ ছম্ করে।" এই যে ভয় করা বা গা ছম্ ছম্ করা ইহারও কারণ আছে। বাস্তবিক ঐ সময় শরীরে একটা শক্তির খেলা হইত। যাহারা কাছে থাকিত তাহাদের যদি এই শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকিত তবে অবশ্য তাহারা এই শক্তি হইতে অনেক কিছু লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের গ্রহণের পথটা বন্ধ থাকিত বলিয়া এই শক্তি গিয়া ঐ বদ্ধ দরজায় আঘাত করিত। এই আঘাত হইতেই তাহাদের ভয়ের সৃষ্টি হইত।

খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই

আবার অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় মা বলিলেন—"খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই। অনেক সময় কাহাকেও কিছু খারাপ কথা বলিলে ঐ খারাপ কথা তাহার অনিষ্ট না করিয়া

উহা যে বলে তাহার কাছে ফিরিয়া আসে। আবার কখন কখন ঐ খারাপ কথা সত্য হইয়া যায়। এ শরীর যখন মামাবাড়ীতে ছিল তখন এই জাতীয় একটা ঘটনা হইয়াছিল। কালীপূজা হইতেছিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে। কালীপূজা হইতে সাধারণতঃ অনেক রাত্রিই হয়। ঐ বাড়ীতে একটা বৌ আসিয়াছিল। সে তাহার ছোট মেয়ে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকলেই প্রসাদ পাইয়া ঐ বৌকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহাকে প্রসাদ নিতে বলিল; কিন্তু কেহই তাহার মেয়েকে ঐ সময়ের জন্য রাখিতে চাহিল না। কারণ সারাদিনের খাটুনি, তাহাতে আবার এত রাত্রি হইয়াছে। কাজেই সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত। ইহাতে বৌটির মনে মনে রাগ হইল, সে তাহার মেয়ে লইয়াই প্রসাদ পাইতে বসিল। প্রসাদ পাইয়া যখন হাত মুখ ধুইতে উঠিল তখন আর অন্ধকারে ঘটি খুঁজিয়া পায় না। মেয়েটিকে কোল হইতে নামাইয়া সে ঘটি খুঁজিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মেয়েও কোল হইতে নামিবে না। তখন রাগের মাথায় 'তুই মর' বলিয়া মেয়েটিকে জোর করিয়া মাটিতে রাখিয়া সে ঘটি খুঁজিতে গেল; ঘটি লইয়া আসিয়া দেখে যে মেয়েটি আর সেখানে নাই। তখন সে চীৎকার দিয়া উঠিল। ঐ চীৎকারে বাড়ীর লোকজন জাগিয়া উঠিল এবং লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে মেয়ের খোঁজ করিতে লাগিল। এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। শেষে দিনের আলোকে দেখা গেল যে এক জঙ্গলের মধ্যে মেয়ের গায়ের জামা আর মাথার খুলিটা পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই লোকে খারাপ কথা মুখে আনিতে নিষেধ করে। কারণ যদি স্বস্তি মুহূর্তে ঐ কথা বলা হইয়া যায় তবে উহা সত্য হইতে বাধ্য।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২।। টা বাজিয়া গেল। মা উঠিলেন, আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আশ্রমে জন্মাষ্ঠমী উৎসব

সন্ধ্যার পর আমরা সকলে হলঘরে গিয়া বসিলাম। হলঘরখানি অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং তাঁহার

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মার কাছে শুইতে আসেন কারণ তাহার স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন। আর মা তাহাকে হরিনাম করাইয়া সমস্ত রাত্রি নাচাইয়া ছাড়িলেন।"

মা—পিতাজী তোমার কথায় একটা কথা খেয়ালে আসিতেছে। যখন শা'বাগে এ শরীর এবং ভোলানাথ ছিল তখন ভোলানাথ অনেক সময় এ শরীরের কাছে আসিতে ভয় পাইত। ভয়ও সামান্য নয়। অনেক সময় ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। এইরূপ ভয় পাওয়াও একটা অসম্ভব কিছু নয়, কারণ ঐ সময়ে এ শরীরের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাও একেবারে বদলাইয়া যাইত। যেমন লালবাতি এবং নীলবাতির মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, সেইরূপ এ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও মূর্তির মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিত না। শরীরের এইরূপ ঘন ঘন পরিবর্তন দেখিয়া ভোলানাথ বলিত তোমার কাছে থাকিতে আমার ভয় হয়।" তখন আবার তাকে সান্ত্বনা দিতে বলা হইত, "ভয় কিসের"? এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারার পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তাহার ভয় দূর হইত। মেয়েছেলেরাও সেই সময় এ শরীরের কাছে থাকিতে ভয় পাইত। তাহারা বলিত, "দিনের বেলায় তোমার কাছে থাকা যেমন তেমন কিন্তু রাত্রিবেলা তোমার কাছে থাকিতে গা ছম্ ছম্ করে।" এই যে ভয় করা বা গা ছম্ ছম্ করা ইহারও কারণ আছে। বাস্তবিক ঐ সময় শরীরে একটা শক্তির খেলা হইত। যাহারা কাছে থাকিত তাহাদের যদি এই শক্তি গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকিত তবে অবশ্য তাহারা এই শক্তি হইতে অনেক কিছু লাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের গ্রহণের পথটা বন্ধ থাকিত বলিয়া এই শক্তি গিয়া ঐ বন্ধ দরজায় আঘাত করিত। এই আঘাত হইতেই তাহাদের ভয়ের সৃষ্টি হইত।

খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই

আবার অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় মা বলিলেন—"খারাপ কথা মুখে আনিতে নাই। অনেক সময় কাহাকেও কিছু খারাপ কথা বলিলে ঐ খারাপ কথা তাহার অনিষ্ট না করিয়া

উহা যে বলে তাহার কাছে ফিরিয়া আসে। আবার কখন কখন ঐ খারাপ কথা সত্য হইয়া যায়। এ শরীর যখন মামাবাড়ীতে ছিল তখন এই জাতীয় একটা ঘটনা হইয়াছিল। কালীপূজা হইতেছিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে। কালীপূজা হইতে সাধারণতঃ অনেক রাত্রিই হয়। ঐ বাড়ীতে একটা বৌ আসিয়াছিল। সে তাহার ছোট মেয়ে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকলেই প্রসাদ পাইয়া ঐ বৌকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহাকে প্রসাদ নিতে বলিল; কিন্তু কেহই তাহার মেয়েকে ঐ সময়ের জন্য রাখিতে চাহিল না। কারণ সারাদিনের খাটুনি, তাহাতে আবার এত রাত্রি হইয়াছে। কাজেই সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত। ইহাতে বৌটির মনে মনে রাগ হইল, সে তাহার মেয়ে লইয়াই প্রসাদ পাইতে বসিল। প্রসাদ পাইয়া যখন হাত মুখ ধুইতে উঠিল তখন আর অন্ধকারে ঘটি খুঁজিয়া পায় না। মেয়েটিকে কোল হইতে নামাইয়া সে ঘটি খুঁজিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মেয়েও কোল হইতে নামিবে না। তখন রাগের মাথায় 'তুই মর' বলিয়া মেয়েটিকে জোর করিয়া মাটিতে রাখিয়া সে ঘটি খুঁজিতে গেল; ঘটি লইয়া আসিয়া দেখে যে মেয়েটি আর সেখানে নাই। তখন সে চীৎকার দিয়া উঠিল। ঐ চীৎকারে বাড়ীর লোকজন জাগিয়া উঠিল এবং লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে মেয়ের খোঁজ করিতে লাগিল। এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। শেষে দিনের আলোকে দেখা গেল যে এক জঙ্গলের মধ্যে মেয়ের গায়ের জামা আর মাথার খুলিটা পড়িয়া রহিয়াছে। এই জন্যই লোকে খারাপ কথা মুখে আনিতে নিষেধ করে। কারণ যদি স্বস্তি মুহূর্তে ঐ কথা বলা হইয়া যায় তবে উহা সত্য হইতে বাধ্য।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২।। টা বাজিয়া গেল। মা উঠিলেন, আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আশ্রমে জন্মাষ্ঠমী উৎসব

সন্ধ্যার পর আমরা সকলে হলঘরে গিয়া বসিলাম। হলঘরখানি অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং তাঁহার

বাল্যলীলার কোন কোন ঘটনা পুতুলের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। কংসের বাড়ী, কংস কারাগার, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইতেছেন, নন্দ ঘোষের প্রাসাদ, গোষ্ঠলীলা, কালিয়দমন, গোবর্ধন পর্বত প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা এই সব সাজাইয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্যও একটি বিশিষ্ট আসন হইয়াছে। উহাও ফুলপাতা দিয়া সাজানো হইয়াছে। মৌনের পর রাত্রি ৯টা হইতে কীর্তন আরম্ভ হইল। একটি গুজরাটী মহিলা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে কীর্তন করিলেন। শুনিলাম এইভাবে কীর্তন করা তাহাদের নাকি দেশাচার। প্রায় এক ঘণ্টা তাহার গান চলিল। পরে আমাদের ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীরা কীর্তন গান করিলেন। রাত্রি ১২টার সময় শ্রীশ্রীমা নিজে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রাত্রি সাড়ে ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম। রাত্রি ৩টার সময় আশ্রম হইতে লোক আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ বাসায় দিয়া গেল। আরও একদিন রাত্রি ২টা কি ২।।টার সময় বাসায় বসিয়াই মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়াছি। এত রাত্রে কেন আমাদিগকে প্রসাদ পাঠাইয়া দেওয়া হয়—একথা যোগেশ (ব্রহ্মচারী) দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমরা কি করিব? এ যে মায়ের আদেশ।"

৪ঠা ভাদ্র রবিবার (ইং ২১।৮।৪৯)

আজ বেলা ১১টার সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া দেখি ডাঃ পান্নালাল হিন্দী পুস্তক পাঠ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের বিষয় পাঠ হইতেছিল, একে ত পুস্তকখানা হিন্দীতে লেখা তাহাতে আবার হিন্দী ভাষাভাষী লোক দ্বারা উহার পাঠ, কাজেই আমার পক্ষে উহা অনুধাবন করা খুবই শক্ত ছিল। তবে মনে হইল যে এইভাবে এই শক্তির উদ্বোধনের কথা বলা হইতেছে। এক হইল নিজ পুরুষকার দ্বারা শক্তিকে মূলাধার হইতে উদ্বোধন করিয়া তোলা, উহা করিলেই শক্তি ঊর্ধ্বগতি হইয়া সহস্রার মধ্যে গিয়া মিলিবে। আর দ্বিতীয় হইল সহস্রার হইতে যে শক্তিধারা

নামিয়া আসিতেছে তাহাকে ধারণ করা। এই সব কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "দুই ভাবেই ঘরে প্রবেশ করা যায়। একটা হইল দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করা, আর হইল দরজার কাছে নিজকে শোয়াইয়া ফেলা। প্রথমটি হইল পুরুষকারের পথ, দ্বিতীয়টি হইল সমর্পণের বা নিজকে মুছিয়া ফেলার পথ, আর কুণ্ডলিনী শক্তির যে জাগরণের কথা বলা হয় উহার প্রকৃত অর্থ কি? এই শক্তি ত নিত্য জাগ্রত, কিন্তু ইহা আমাদের বোধের মধ্যে নাই বলিয়া আমরা উহাকে সুপ্ত মনে করি। যখন আমাদের আবরণ কাটিয়া যায় তখন কুণ্ডলিনী শক্তি আমাদের বোধের মধ্যে প্রকাশিত হয় ইহাকেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে।

শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানাবস্থা

আবার পাঠ চলিতে লাগিল; কিন্তু মায়ের দিকে চাহিয়া দেখি যে মা স্থির হইয়া গিয়াছেন। সাধারণ আসনেই বসিয়া আছেন কিন্তু মেরুদণ্ডটি সোজা হইয়া স্থির হইয়া আছে। দুইটি করতল দুই হাঁটুর উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। চক্ষু মুদিত। ডাঃ পান্নালালের দৃষ্টি যখন মায়ের দিকে আকৃষ্ট হইল তখন তিনি পাঠ বন্ধ করিলেন। আমরা সকলেই মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মা প্রস্তর মূর্তির মত বসিয়া আছেন। শ্বাস বহিতেছে কি না ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। মা দুই একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন কিন্তু উহা দৃষ্টি শূন্য। অধরের কোণে হাসির রেখা ফুটিতে না ফুটিতেই যেন মিলিয়া গেল, এইভাবে প্রায় একঘন্টা কাটিয়া গেল। খুকুনী দিদি খবর পাইয়া তাহার অসুস্থ দেহ লইয়া হলঘরে আসিলেন। হলঘরে আমরা ৩০।৪০টি লোক বসিয়াছিলাম। সকলেই অনিমেষ লোচনে মাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মালা লইয়া আসিয়াছেন। মাকে একটি করিয়া মালা দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ম, কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি আর ঐ মালা মায়ের গলায় দিতে সাহসী হইলেন না। মালা হাতে করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় মাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ঘন্টার পর মায়ের এই ভাবটি যেন

কাটিয়া গেল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। যেভাবে বসিয়া ছিলেন উহার একটু পরিবর্তন করিয়া হেলিয়া বসিলেন। ডাঃ পান্নালালকে বলিলেন, "পিতাজী পাঠ বন্ধ করিয়াছ কেন? পড়িতে থাক।" এই অবসরে শাস্ত্রী মহাশয় মায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। এতদ্দেশীয় অন্য একটি স্ত্রীলোকও মাকে মালা দিল এবং কতকগুলি ফল মায়ের সম্মুখে রাখিল। ডাঃ পান্নালাল আবার পড়িতে লাগিলেন। উপস্থিত কেহই ঐ পাঠে মনোনিবেশ করিল বলিয়া মনে হইল না। সকলের দৃষ্টিই মায়ের দিকে। শ্রীশ্রীমা ধ্যানস্থ না থাকিলেও তিনি যে সাধারণ ভাবে নাই তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

ত্রাটক সাধনার একটা দিক

ডাঃ পান্নালালের কি একটা কথায় মা বলিলেন, "তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে একাগ্র হইয়া দৃষ্টি রাখ, ডাঃ পান্নালাল কিছুক্ষণ মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে মা তাঁহাকে আকাশের দিকে চাহিতে বলিলেন। ডাঃ পান্নালাল তাহাই করিলেন।

মা। কিছু দেখিতেছ?

ডাঃ পান্নালাল। না।

মা। ইহা ত অতি সাধারণ জিনিষ। কোন একটা ফটোর দিকে একা- ভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া যদি আকাশের কিংবা দেওয়ালের দিকে তাকাও তবে ঐ ফটোর মূর্তি জ্যোতির্ময় আকারে আকাশে কিংবা দেওয়ালে দেখিতে পাইবে। তবে একাগ্রতা দৃঢ় না হইলে কিন্তু কিছুই হইবে না। এই শরীরের উপর দিয়া যখন সাধনার ক্রিয়াগুলি চলিতেছিল তখন হঠাৎ এই অনুভূতিটা হয়। ভোলানাথের সঙ্গে বসিয়া কথা বলিতে বলিতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি যে ভোলানাথের মূর্তিই জ্যোতির্ময়রূপে আকাশে বসিয়া আছে। ভোলানাথ ঠিক যেভাবে মাটিতে ছিল সেই ভাবেই আকাশে রহিয়াছে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ঐরূপ দেখি। ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কিছু দেখিতেছে কি না। সে বলিল সে কিছুই দেখিতেছে না। (ডাঃ পান্নালালকে) ঘরে বসিয়া ইহা অভ্যাস করিয়া দেখিতে পার। ইহাতে

মনের একাগ্রতা বাড়ে। কেহ কেহ কাল বিন্দু দিয়া ইহা অভ্যাস করে। মন একাগ্র হইলে বিন্দুটি কিন্তু আর কাল থাকে না। তখন উহাও জ্যোতির্ম্ময় দেখায়। একাগ্র মনে জানলার শিকগুলির দিকে তাকাইয়া যদি সাদা দেওয়ালের দিকে তাকাও তবে ঐ সাদা দেওয়ালের মধ্যে জ্যোতিঃ আকারে শিকগুলি দেখিতে পাইবে। ফটোর দিকে এক দৃষ্টি রাখিয়া যদি জপ করিয়া যাও তবে কেবল যে ঐ ফটোর মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ হয় এরূপ নহে, আরও অনেক কিছু দেখা যায়; কিন্তু এই সব দর্শনের বিষয় গোপন করিতে হয়। যদি গোপন না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলা যায় তবে যাহার নিকট প্রকাশ করা যায় সে ঐ শক্তির অংশ লাভ করে। ফলে আরও অগ্রসর হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ আর অগ্রসর হইতে পারে না, তবে দেহ যদি কিছু পূর্ণভাবে লাভ করে তবে প্রকাশ করিলে আর কোন ক্ষতি হইবার কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না। কারণ তখন ত আর দুই থাকে না। তখন প্রকাশ করার অর্থ নিজের কাছেই বলা।

ধ্যানের ছোঁয়াচ লাগা

শ্রীশ্রীমা এই সব কথা বলিতে বলিতে বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর ধ্যান লাগিয়া গিয়াছে।" মাকে মালা পরান অবধি শাস্ত্রী মহাশয় যে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন—ইহা আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে তিনি বুঝি এইভাবে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত, কারণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত একাসনে স্থির ভাবে বসিয়া থাকা অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়কে মা বার বার লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং অন্যকেও উহা লক্ষ্য করিতে বলিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল যে নিশ্চয়ই শাস্ত্রী মহাশয়ের ধ্যানে কিছু বিশেষত্ব আছে। আমি এই সব চিন্তা করিতেছি—এমন সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং তিনি মাকে প্রণাম করিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "কি বাবা, ধ্যান বুঝি লাগিয়া গিয়াছিল"?

শাস্ত্রী মহাশয়। ধ্যান আর আমাদের হয় কই? এখানে যে সব

কথা হইতেছিল তাহা শুনিতে পাইতেছিলাম, তবে শরীরটা স্থির হইয়াছিল।

মা। হাঁ।

শাস্ত্রী মহাশয়। আপনাকে মালা পরাইয়া যখন আসনে আসিয়া বসিলাম তখন সবই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। মনে একটা আনন্দের ভাব আর দেহটা স্থির।

মা। (হাসিয়া) এ শরীরের ছোঁয়াচ বোধহয় তোমার লাগিয়া গিয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয়। বোধহয় তাহাই।

এই কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মা আবার চুপ করিলেন। আজ যেন মায়ের কেমন ঢুলু ঢুলু ভাব। কথা যাহা বলিতেছেন তাহাও যেন অসঙ্গভাবে। আজ আর বিশেষ কথা হইবে না মনে করিয়া আমি মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। তখন বেলাও ১২টা ৩০মিঃ।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং উহার অনুভূতি
৭ই ভাদ্র বুধবার (ইং ২৪।৮।১৯৪৯)

আজ বেলা ১০টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন পর্য্যন্ত মা হলঘরে আসেন নাই। ইহার একটু পরেই মা হলঘরে আসিলেন। লোক সংখ্যাও তখন খুব কম। শ্রীশ্রীমা আসন গ্রহণ করা মাত্র আমি বলিলাম, "মা, সেদিন কুণ্ডলিনী জাগরণের অর্থ বলিতে তুমি বলিয়াছিলে যে, চৈতন্য শক্তি যাহা নিত্য জাগ্রত আছে উহা বোধের মধ্যে আসার নামই হইল কুণ্ডলিনী জাগরণ। ইহাই যদি কুণ্ডলিনী জাগরণের অর্থ হয় তবে ইহার সহিত ষট্‌চক্রের সম্বন্ধ কি? কারণ যে কোন পথেই সাধন করা যাক না কেন, সেই পথেই চৈতন্য শক্তির প্রকাশ হইতে পারে। তাহা হইলে কি বুঝিব যে, যে পথেরই সাধক হউক না কেন সকলেরই ষট্‌চক্রের সহিত পরিচয় থাকিবে?

মা। ঠিক তাহা নয়। অনেকে যেমন মূর্তি ধরিয়া সাধন করে সেইরূপ কেহ কেহ এই ষট্‌চক্রের পথেও সাধন করে। এখানে

তাহারা মূর্ত্তির ধ্যান না করিয়া চক্রের ধ্যান করিতে করিতে যেমন উহা জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হয় সেইরূপ চক্রের ধ্যানেও বিভিন্ন কমলসহ চক্রকে ও জ্যোতির্ম্ময়রূপে দেখা যায়। কোন চক্রের পর কোন চক্র আসিবে তাহা গুরু শিষ্যকে বলিয়া দেন এবং শিষ্যও গুরুর আদেশ মত সাধন করিতে করিতে স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি লাভ করে। আবার মজাও এমন যে সাধক এক এক স্তরে উঠিয়া কোথায় জ্ঞানের স্থান, কোথায় ভক্তির স্থান এবং কোথায় কর্ম্মের স্থান তাহাও দেখিতে পারে। চক্র বলিতে যদিও সচরাচর ৬টি চক্রের কথাই বলা হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আরও অনেক চক্র আছে। উহার অনুভূতিও ভিন্ন ভিন্ন। তাহা ছাড়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রের মধ্যে যে ফাঁক আছে উহারও কিন্তু অনুভূতি আলাদা। এই পথে চলিলে সাধক মাত্রই উহা অনুভব করিতে পারিবে বলিয়া উহার আর বর্ণনা করা হয় নাই। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা এই চক্রের সাধন করে তাহাদের সকলেরই অনুভূতি একরূপ হয় না। সাধনা অনন্ত বলিয়া অনুভূতিও অনন্ত।

আমি। মা, তুমি বলিলে যে চক্রের ধ্যান করিতে করিতেই চক্রগুলি প্রকাশ হয়, কিন্তু এমন কি হয় না যে, কেহ কিছু ধ্যান না করিয়া শুধু গুরুদত্ত মন্ত্রই জপ করিয়া গেল এবং ঐভাবে জপ করিতে করিতেই তাহার চক্রগুলিই প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল?

মা। হ্যাঁ, তাহাও হয়। গুরু যদি তাহাকে ঐ ষট্‌চক্রের সাধনা দিয়া থাকেন। তবে চক্র ধ্যান না করিলেও চক্রগুলি তাহার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিবে। গুরু হয়ত শুধু লক্ষ্য বলিয়া দিলেন, সাধক সাধনা করিতে করিতে একটির পর একটি করিয়া স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার জানিও যে প্রত্যেকটি স্তরের সহিতই লক্ষ্যের যোগ আছে বলিয়া পূর্ণ লক্ষ্যটি যে কোন স্তরে অনুভূতির মধ্যে আসিয়া যাইতে পারে। তখন আর তাহাকে একটির পর একটি করিয়া অগ্রসর হইতে হয় না। তখন সে ঐখানে যাহা কিছু পাইবার তাহা পাইয়া যায়।

আমি। আচ্ছা, কাহারও যদি কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়, আবার চৈতন্য শক্তি যদি কাহারও অনুভূতির মধ্যে আসিতে আরম্ভ করে তখন তাহার ভিতরে ও বাহিরে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

মা। ভিতরের লক্ষণ বলিতে পার যে তাহার নিকট তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিবে। এই ষট্‌চক্রের কমলের কথা বলা হয়, এই কমলের প্রত্যেক দলেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে। এই সব শক্তি সাধকের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কেবল প্রকাশ কেন? সে তখন তদাকারেই পরিণত হইতে থাকিবে। শিব বল, বিষ্ণু বল বা কোন দেবতা বল তাহাও ঐ শক্তি হিসাবে তাহার মধ্যে ফুটিতে থাকিবে এবং ঐ সব শক্তির বিকাশ হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ হয় তাহা তোমাদের সঙ্গেই আছে।

আমি। যখন এই সব চৈতন্য শক্তি প্রকাশ হইতে থাকে তখন কি সাধকের অহং জ্ঞান থাকে?

মা। যতক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ঐ সব শক্তি আরও হইতে থাকে তখন অহং জ্ঞান থাকে, কারণ ঐগুলি ক্রিয়ার শক্তি কি না। এই অহং জ্ঞানের ক্রিয়া দ্বারা শক্তি অর্জনও হইতেছে আবার ক্রিয়াও চলিতেছে।

আমি। রাম ঠাকুর মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত ত তোমার কথার বিরোধ দেখা যাইতেছে।

মা। না, বিরোধ হইবে কেন? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা পরে শুনিব। এখন যাহা বলিতেছি তাহা শুন। সাধক যখন ক্রিয়া শক্তি অর্জন করিয়া চলে তখন তাহার অহং জ্ঞান থাকে এবং ঐ জ্ঞান লইয়াই সে ক্রিয়া করে। যেমন সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া অগাধ জলে ডুবিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেও যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের শক্তির ক্রিয়া অনুভব করা যায়; মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি কিন্তু তবুও ঢেউ আসিয়া যেমন দেহটি উলট-পালট করিয়া দিয়া যায়, সেইরূপ যদিও সমস্ত শক্তিই ঐ পূর্ণ লক্ষ্য হইতে আসিতে[illegible] কিন্তু ঐ পূর্ণ লক্ষ্যে অহং জ্ঞান ডুবিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শক্তির খেলা নানাভাবে অনুভব করা যায়। কখন হয়ত শক্তি শুধু তাপই দিয়া গেল, কখন হয়ত একটু স্পর্শ দিয়া দাগ রাখিয়া

গেল। কখন হয়ত ঐ শক্তি একেবারেই জ্বালাইয়া দিয়া গেল। শক্তির কাজই হইল যে যাহা জ্বলিবার তাহা জ্বালাইয়া দিবে। জ্ঞান পথেই চল, কি ভক্তি পথেই চল, কি কর্ম্মের পথেই চল, চৈতন্য শক্তি বিকাশ হইয়া হয় তোমাকে জ্বালাইয়া কিংবা গলাইয়া তোমাকে স্বরূপে স্থির করিয়া দিবে। ইহাই হইল চৈতন্য শক্তির পূর্ণ জাগরণ। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। এই অবস্থায় অহং বলিয়া কিছু থাকে না। সাধনের যে কোন পথ দিয়া এই অবস্থায় পৌঁছিলে সাধক তখন একের মধ্যেই অনন্তের খেলা দেখিতে পাবে। জগতের যত রকম সাধনা আছে বা উহার যত রকম অনুভূতি আছে, সমস্তই সে নিজের মধ্যে পাইয়া যায়। কারণ তখন দ্বিতীয় যে আর কেহ নাই। ইহাকেই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগুণরহিতও বলে, কারণ যতক্ষণ ত্রিগুণের মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণ দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যায়। গুণাতীত হইলেও দ্বন্দ্ব চলিয়া যায়, বিরোধ চলিয়া যায়। বিরোধ কিনা বিশিষ্ট ভাবের রোধ।

আমি। তাহা হইলে, মা, এরূপ বলিতে পারি কি? যতক্ষণ চৈতন্য শক্তি খণ্ডখণ্ডভাবে ততক্ষণই অহং জ্ঞান থাকে; কিন্তু চৈতন্য শক্তির যখন পূর্ণ প্রকাশ হয় তখন আর অহং জ্ঞান থাকে না।

মা। হাঁ, তাহা বলিতে পার। এখন বল রাম ঠাকুর কি বলিয়াছেন?

আমি। রাম ঠাকুর মহাশয়ের বামাচরণ নামে এক শিষ্য ছিলেন এবং তিনি নাকি ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিলেন। একবার তাঁহার পাটনা থাকাকালীন তিনি এক সাধুর কথা শুনিতে পান, যিনি স্পর্শ মাত্রই শিষ্যের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ করিয়া দিতে সমর্থ ছিলেন। বামাচরণবাবুর কয়েকজন বন্ধু এই সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাধুর আশ্চর্য্যশক্তি প্রত্যক্ষ করেন। বন্ধুদের বিভিন্ন অনুভূতির কথা শুনিয়া বামাচরণ বাবুর মনে বড় অভিমান হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ পাটনা হইতে চট্টগ্রাম চলিয়া আসেন, সেই সময় রামঠাকুর মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বামাচরণবাবু অভিমান সুরে বলেন, "বাবা আমি এতদিন হইল আপনার

নিকট নাম পাইয়াছি এবং যথাবিধি নাম করিয়াও যাইতেছি কিন্তু আপনি আমার কিছু করিলেন না। আর পাটনায় এক সাধু আসিয়াছেন যিনি স্পর্শ মাত্রই শিষ্যদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়া দিতেছেন। বামাচরণ বাবুর কথা শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "বামাচরণ আমার কুণ্ডলিনী জাগে না।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া বামাচরণ বাবু অবাক হইয়া ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর তখন বলিলেন, "আমার কথার অর্থ বুঝি বুঝিতে পারিলে না? কথার অর্থ হইল যে 'আমি' এবং 'আমার' জ্ঞান থাকিতে কুণ্ডলিনীর জাগরণ কোথায়? যিনি বলিতেছেন যে "আমার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে জানিও তাহার কুণ্ডলিনী জাগে নাই।"

মা। (হাসিয়া) বাবাজী এখানে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ জাগরণের কথাই বলিতেছে। আমিও বলিয়াছি যে শক্তির পূর্ণ জাগরণ হইলে 'আমি' 'আমার' জ্ঞান থাকে না। তবে এটুকু আমি আরও যোগ করিয়া দিয়াছি যে চৈতন্য শক্তির পূর্ণ জাগরণের পূর্ব্বে নানাভাবে উহার স্পর্শ আসিতে পারে এবং ঐ সব স্পর্শের জন্যই সাধক নানাভাবে বদলাইয়া শেষে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পৌঁছে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে সাধনের এই সব অনুভূতি সমস্তই গুরুর ইচ্ছায় হয়। দীর্ঘদিন সাধন করিয়া কেহ কিছু অনুভব করিতে না পারিলে যে অশান্তি ও চঞ্চলতার প্রকাশ হয় উহাও গুরুর ইচ্ছায়ই হয়। গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্যই এই অশান্তির পথ বাছিয়া দিয়াছেন। তাহার যে ছট্‌ফটানি হইতেছে উহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, সে উহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। কারণ গুরু তাহাকে যে পথ দিয়াছেন সেই পথে যা যা প্রকাশ তাহাই ত হইবে? তাহার মঙ্গলের জন্যই এই কঠোর পথ। একদিন হয়ত যে কোন সময়ে পূর্ণ লক্ষ্য পৌঁছিয়া যাইবে। কাজেই সে যে নাম জপ ইত্যাদি কাজ করিতেছে—উহার কিছুই বৃথা যাইতেছে না। কেহ মনে করে "আমি এত নাম করিলাম, এত জপ করিলাম, তবুও আমার কিছু হইল না।" আবার কেহ খুব জপ করিয়াও মনে করে, "আমি আবার নাম জপ করিলাম কোথায় যে আমার কিছু হইবে?" কেহ

সামান্য কিছু কাজ করিয়াই উহা বড় করিয়া দেখে, কেহ বা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও উহা পরিশ্রম বলিয়াই জ্ঞান করে না। অনুভূতির বেলায়ও অনেকে চৈতন্যশক্তির সামান্য একটু স্পর্শ পাইয়াই ঐ আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকে। আবার কেহ পুনঃ পুনঃ স্পর্শ পাইয়া আরও উৎসাহের সহিত নাম জপ করিতে থাকে। গুরু শিষ্যের সংস্কার বুঝিয়া এবং তাহার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাহাকেও বা অনুভূতির পথে লইয়া যান, আবার কাহাকেও অনুভূতি শূন্য অশান্তির পথে, চঞ্চলতার পথে চালাইয়া দেন।

এইভাবে মা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিলেন। আজ আর কেহ প্রশ্ন তুলিলেন না দেখিয়া কিছুক্ষণ পর মা চুপ করিলেন। তখন অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। বেলা ১২।টা বাজিয়াছে মনে করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত
৯ই ভাদ্র শুক্রবার (ইং ২৬।৮।১৯৪৯)

আজ বেলা ১০।টার সময় আশ্রমে গেলাম। শ্রীশ্রীমা হলঘরেই বসিয়াছিলেন। আজিও বেশী লোকের সমাগম হয় নাই। কোন বিশেষ আলোচনা যে হইতেছিল তাহা সেখানকার লোকের ভাব দেখিয়া মনে হইল না। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহই যেরূপ একটি মালা লইয়া আসেন আজও সেইরূপ আসিয়া মায়ের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় আসন গ্রহণ করিলে স্বামী শঙ্করানন্দ তাহাকে বলিলেন, "আপনি মাকে যেভাবে প্রণাম করিলেন ইহার পর আর আপনি মাকে 'মা' বলিতে পারিবেন না কারণ শাস্ত্রে আছে যে দেবতাকে বামে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়; আবার দেবীকে ডানে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয় এবং গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। আপনি মাকে বামে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছেন, কাজেই আপনি মাকে মা না বলিয়া বাবা বলিবেন"। এই প্রণাম করার পদ্ধতি লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। কেহ বলিলেন, "শিবকে ডান দিকে বা সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করার ব্যবস্থা আছে,

যদিও শিব দেবতা"। এইসব শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কতকটা দুঃখিত ভাবে মাকে বলিলেন, "মা, যখন যাহা করি তাহাই ভুল হইয়া যায়।"

মা—কিছু কর কিনা তাই ভুল হয়। কর্ম্ম করিলে তাহা কিছু কিছু দোষযুক্ত হইবেই। সেইজন্য দেখা যায় যে শাস্ত্রে যেমন কর্ম্মের বিধি আছে; আবার উহা ঠিক্ ঠিক্ পালন করিতে না পারিলে যে দোষ হয় তাহা খণ্ডনের উপায়ও আছে। কর্ম্ম করিতে দোষ হয় দেখিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই। যাহাতে উহা নিখুঁত ভাবে হইতে পারে, সেই চেষ্টাই করা উচিত। পূজা ইত্যাদি কর্ম্মের আরম্ভ, মধ্য এবং শেষ আছে। অনেকেই পূজা করিতে গিয়া পূজার ক্রম ঠিক্ রাখিতে পারে না। এইজন্য দোষ হয় সত্য, কিন্তু ঐ দোষ স্খালনের জন্য ব্যবস্থাও আছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল লোকে যেন ভুল করিয়াও ধীরে ধীরে দোষশূন্য ভাবে পূজা করিতে পারে। কারণ ক্রম ধরিয়া ধরিয়া ক্রিয়ারও ত পূর্ব্ব প্রকাশ দরকার। তোমরা ত দেখিতে পাও যে শিশু যখন প্রথমে লেখা শিখিতে আরম্ভ করে তখন 'ক' লিখিতে যেভাবে তাহাকে আঁক দিতে হইবে তাহা তাহার আসে না, সে আঁকা বাঁকা যাহা কিছু খাড়া করে উহা দেখিয়াই তোমরা উহার প্রশংসা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত কর। পরে সে একটু শক্ত হইলে তোমরা তাহাকে দেখাইয়া দেও যে কি ভাবে 'ক' লিখিতে হয়। ক্রিয়া প্রধান পূজা সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু পূজা যদি ভাব প্রধান অর্থাৎ প্রথম হইতেই যদি ভাব অবলম্বন করিয়া পূজা করা যায় তাহা হইলে পূজার ক্রমের ব্যতিক্রম হইলেও কোন দোষ হয় না। ক্রিয়া প্রধান এবং ভাব প্রধান পূজার ইহাই পার্থক্য।

শাস্ত্রীমহাশয়—তাহা হইলে ভাব দিয়া পূজা করাই ভাল, কারণ এখানে দোষযুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মা। ভাবযুক্ত পূজা তখনই নির্দোষ হয় যখন উহা প্রকৃত ভাবযুক্ত হয়। কিন্তু ভাবটি যদি বাহ্য ভাব হয় তবে কিন্তু ভাবযুক্ত পূজারও দোষ হইয়া থাকে; কীর্তনে যদি তোমার প্রকৃত ভাব না হইলেও শুধু লোক দেখাইবার জন্য ভাবের অনুকরণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ কর তবে

কিন্তু পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আর প্রকৃত ভাব হইতে যদি নৃত্য আসে তবে পিচ্ছিল স্থানের উপর নৃত্য করিলেও পড়িয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পূজাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ক্রিয়া প্রথমে ক্রম শূন্য ভাবেই আরম্ভ হয়, পরে ক্রমের পূর্ণ বিকাশ হইয়া উহা আবার অক্রম (অর্থাৎ ক্রমশূন্য) হইয়া যায়। শিশু যেমন প্রথমে বে-দন্ত থাকে; পরে তাহার দাঁতের বিকাশ হয়, পরে আবার বে-দন্ত হয় সেইরূপ। এই সকল কারণে আমি দুইজন লোককে এক বিষয়ে বিপরীত মত প্রকাশ করিতে দেখিলে দুই জনেই যে ঠিক কথা বলিতেছে এইরূপ বলিয়া থাকি। ইহা কিন্তু মন রাখিবার জন্য বলা হয় না। ইহার অর্থ এই যে, যে যে স্থানে দাঁড়াইয়া যাহা বলিতেছে উহা তাহার পক্ষে সত্য। কারণ ঐ অবস্থায় স্থিত হইলে ঐরূপ কথাই আসিয়া থাকে। তুমি যদি তোমার ইষ্টকে কোন একভাবে দেখিতে থাক, অপরের নিকট তাহার ইষ্ট সম্বন্ধে অন্য ভাবের কথা শুনিলে উহাতে তোমার অশ্রদ্ধা করা ঠিক হইবে না বরং তখন তোমার মনে করা উচিত যে তোমার ইষ্টই অপরের কাছে ঐ ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। কারণ তোমরাই ত বল যে সর্ব্বরূপ তাঁহার রূপ। সর্ব্বনাম তাঁহার নাম। কাজেই কেহ তাহার ইষ্ট সম্বন্ধে কোন ভাব পোষণ করিলে উহা যে তোমার ইষ্টেরই ভাব ইহা যদি মনে করিতে না পার তবে তুমি তোমার ইষ্টকে ঐ ভাব হইতে বঞ্চিত করিলে। তখন আর তিনি তোমার নিকট সর্ব্বরূপে এবং সর্ব্বভাবে আসিলেন না। এ কথার অর্থ এই নয় যে তুমি অন্যের কথা শুনিয়া তোমার নিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। তোমার নিষ্ঠা, তোমার ভাব, তোমার মধ্যে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাবের কথা শুনিলেও উহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিবে। এগুলি অবশ্য বিচারের দিক হইতে বলা হইল। অনেকে আবার নিজের ভাবের প্রতি এমনি দৃঢ়নিষ্ঠ যে অন্য ভাবের কথা তাহার সম্মুখে আলোচনা হইলেও তাহার কানে প্রবেশ করে না। অনেক সময় তোমরা দেখ না যে কোন সুখাদ্য কোন রোগীর মুখে দিলে উহা তাহার আর গলা দিয়া নামে না। উহা

মুখ হইতেই পড়িয়া যায়। জিনিষগুলি যে খারাপ বলিয়া পড়িয়া যায় তাহা নহে, উহা তাহার গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে না। সেইরূপ অনেকের দৃঢ় নিষ্ঠা হইতে তাহার ভাবটি এমন একাগ্র যে অন্য ভাবের কোন কথাই তাহার কানে আসে না। ইহাও কিন্তু একটি অবস্থা। আবার এই অবস্থা ছাড়াইয়া যখন যাওয়া যায় তখন কিন্তু অপরের ভাব বিরুদ্ধ হইলেও উহা গ্রহণ করিতে কোনই অসুবিধা হয় না। এ শরীর যখন ছোট ছিল তখন এ জাতীয় অনেক কিছু এ শরীর হইতে দেখা গিয়াছে। পুস্তক পড়িতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে দুইটি অক্ষর একত্র করা যাইতেছে না। একটি অক্ষর লক্ষ্য করিলাম, অপরটি লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখি যে প্রথমটি একেবারে গায়েব হইয়া গিয়াছে। কাজেই একটির সহিত আর একটি যোগ করা সম্ভব হয় নাই। আবার অনেক সময় অক্ষর পড়িতে গিয়া দেখিয়াছি যে ওখানে কালির কোন আঁচড় নাই, বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃ বসিয়া আছে। আবার অনেক সময় জ্যোতির সহিত কালির আঁচড়ও দেখা গিয়াছে। আবার অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অক্ষরগুলি হইতে যেন জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই রূপে কতরকমই যে হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সব কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের আহারের ডাক পড়িল। কাজেই কথা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ বিকালে যখন 'কাশী খণ্ড' পাঠ হইতেছিল তখন দুইজন সাহেব ও একটি মেম আসিলেন। পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বসিয়াই রহিলেন। পাঠ শেষ হইলে এই সাহেবদের মধ্যে একজন ডাঃ পান্নালালের মারফতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মা বা ব্রহ্মকে জানা যায় কিরূপে?"

মা—কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ত ব্রহ্ম কর্মের অধীন হইল।

সাহেব—তবে কর্ম্মের কি কোন সার্থকতা নাই?

মা—নিশ্চয়ই আছে। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ, কিন্তু আবরণে ঢাকা।

কর্ম্মদ্বারা এই আবরণ দূর করিতে হয়।

সাহেব—কি কর্ম্ম করিলে এই আবরণ দূর হয়?

মা—আমাকে কি পথ বলিয়া দিতে হইবে? আমার কথা যদি নির্ব্বিচারে পালন করিবে—এই প্রতিশ্রুতি যদি আমাকে দেও তবে আমি বলিয়া দিতে পারি।

সাহেব—সেই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারিব না। (সকলের হাস্য) [মাও হাসিতে লাগিলেন]। আমরা এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভের জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আমরা কি এই তত্ত্ব লাভের পথ খুঁজিয়া পাইব না?

মা—কেবলমাত্র যদি ঐ উদ্দেশ্যেই এদেশে আসিয়া থাক, তবে আমি বলিতেছি সে পথ নিশ্চয়ই পাইবে।

মেমসাহেব—কে আমাদিগকে এই পথ বলিয়া দিবে?

মা—গুরুই এই পথ বলিয়া দিবেন।

মেমসাহেব—গুরুকে চিনিয়া লইব কি করিয়া? কেমন করিয়া বুঝিব যে কে আমাদিগকে পথ বলিয়া দিতে পারিবেন?

মা—ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের কাছে গিয়া তোমাদের নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে কে তোমাদের পথ বলিয়া দিতে সমর্থ। একথা সত্য যে ছাত্র কখনও মাষ্টারের বিচার বুদ্ধি বিচার করিতে সমর্থ নয়। তবে যাহাকে দেখিয়া তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস জন্মিবে তাহাকেই গুরু করিয়া লইবে।

মেমসাহেব—যদি একবার কাহাকেও গুরু করিয়া লওয়া যায় তবে কি অন্য মহাপুরুষের কাছে যাইতে পারা যাইবে না।

মা—সৎসঙ্গ করিতে কোন দোষ নাই, বরং উহা ভালই, তবে গুরুর উপদেশ ভিন্ন অন্য কাহারও উপদেশ মত কাজ করা চলিবে না। গুরু করণের পূর্ব্বে যে কোন মহাত্মার সঙ্গ করা যাইতে পারে এবং তাঁহাদের কথামত চলা যাইতে পারে, কিন্তু একবার কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে তখন আর অপর কাহাকেও অনুসরণ করা চলিবে না। যেমন বিবাহের পূর্ব্বে বর লইয়া বাছাবাছি চলে,

কিন্তু একবার বিবাহ হইলে যেমন আর বাছাবাছির কোন প্রশ্নই উঠে না, গুরুকরণ ও সেইরূপ। (সাহেব ও মেমসাহেবের হাস্য)। আবার গুরু নানাপ্রকার হইতে পারে, যেমন দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু ইত্যাদি।

সাহেব—আমি রমণ মহর্ষিকেই আমার গুরু করিয়াছি। সেইজন্য আমি মাকে কথা দিতে পারি নাই যে আমি তাঁহার কথামত কাজ করিতে পারিব।

মা—তুমি আমার কথামত কাজ করিতে পারিবে না জানিয়াই আমি তোমাকে একথা বলিয়াছিলাম। (সকলের হাস্য)।

সাহেব—আমাদের গুরুকরণ হইয়াছে এবং আমাদের কি কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও উপদেশ পাইয়াছি। এখন আমরা কি এই দেশে থাকিব, না নিজের দেশে ফিরিয়া যাইব?

মা—একথা গুরুকে জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি যাহা করিতে বলেন সেই অনুসারে কাজ করিও।

সাহেব—আপনার কোন পথ, জ্ঞান না ভক্তি?

মা—(হাসিয়া) তোমরা যাহা বলিবে তাহাই আমার পথ।

দ্বিতীয় সাহেব—আমি অবিবাহিত, আমার কর্তব্য কি?

মা—পিতামাতার সেবা করাই তোমার কর্তব্য।

সাহেব—এতদূর হইতে পিতামাতার সেবা কি করিয়া করিব?

মা—এখান হইতে যতদূর সেবা করা সম্ভব তাহাই করিবে।

ইহার পর আর কোন কথা হইল না। মা চত্বরের উপরে বেড়াইতে লাগিলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

১০ই ভাদ্র, শনিবার (ইং ২৭।৮।১৯৪৯)।

আজও বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমে পৌঁছিলাম। মা হলঘরে বসিয়াছিলেন। ডাঃ পান্নালাল এবং দেবশঙ্কর বাবু প্রভৃতিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বোধহয় ভূতের গল্প হইতেছিল। দেবশঙ্কর বাবু বলিতেছিলেন, "ভূতের গল্প সম্বন্ধে পুস্তক পড়িলে দেখিয়াছি যে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।"

মা—সদ্‌গ্রন্থ পড়িলে উহার একটা প্রভাব যদি মনের উপর পড়ে,

তবে ভূতের গল্প পড়িলেও উহার প্রভাব পড়িবে না কেন? অবশ্য যদি ঐসব কথায় কিছু বিশ্বাস থাকে। শ্বাসের সঙ্গেই ত সব গ্রহণ করা হয় কিনা। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে যদি কিছু বিশ্বাস থাকে।

গতকল্য যে দুইজন সাহেব মা'রসঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে আত্মাকে লাভ করিতে হইলে সদাচারের অবাশ্যকতা কি? অসৎ জীবন যাপন করিয়া আত্মাকে লাভ করা যায় না কেন? এই প্রশ্নের জবাব কাল তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল না। কারণ অন্যান্য কথার মধ্যে এই প্রশ্ন চাপা পড়িয়া যায়। ডাঃ পান্নালাল আজ এই প্রশ্নই মাকে করিলেন— উত্তরে মা বলিলেন, "অসৎ জীবন যাপন করিয়া যাহা পাইবার তাহা ত পাইতেছেই। কাজেই ইহা দ্বারা আত্মাকে লাভ করার কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, এককে লাভ করিতে হইলে, এক লইয়া থাকা দরকার। যেখানে দুই সেইখানেই মারামারি, কাটাকাটি, অশান্তি। আর যেখানে দুই নাই সেইখানেই শান্তি, আনন্দ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ।

মহাপুরুষদের রোগযন্ত্রণা হয় কিনা

কথায় কথায় মহর্ষি রমণের কথা উঠিল। এক ভদ্রলোক আজ আসিয়াছেন। তিনি ডাক্তার। একসময় তিনি মহর্ষি রমণের আশ্রমের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে ৬।৭ বৎসর কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে আজ ৬।৭ মাস হয় মহর্ষি ক্যান্‌সার রোগে ভুগিতেছেন। তাহার হাতে ক্যান্‌সার হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত উহা তিনবার অপারেশন করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ডাঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মাদের এইসব রোগ হয় কেন? রামকৃষ্ণ পবমহংস দেবও এই রোগে ভুগিয়া মরিয়াছেন।"

মা—এ সব কথার উত্তর এ শরীর দেয় না।

ইহার পর শ্রীমান ব্যাস প্রশ্ন করিলেন যে মহাত্মাদের রোগ হইলে তাঁহারাও আমাদের মত কষ্টভোগ করিয়া থাকেন কিনা? মা এ সম্বন্ধে কোন জবাব দিলেন না দেখিয়া ডাঃ পান্নালাল মাকে ঐ প্রশ্ন আবার

করিলেন। মা তখন বলিলেন, "এ জাতীয় কথা পূর্ব্বে হইয়াছে।" কমলদাদাকে (বিরজানন্দ স্বামী) এবং আমাকে মা ঐ সম্বন্ধে যে কথা হইয়াছে তাহা বলিতে বলিলেন। ঐ সম্বন্ধে যাহা আমাদের মনে ছিল তাহা মাকে বলিলে, মা বলিলেন, রোগ হইলে মহাত্মারা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন কিনা নানাভাবে বলা যায়। একভাবে দেখিলে মহাত্মারা রোগকে মানিয়া নিয়া উহাকেই আনন্দের একটা রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। রোগ কি? না, উহা আনন্দময়েরই একটা রূপ। কাজেই উহা আনন্দ বই আর কিছু নয়। আবার এমন অবস্থা আছে যেখানে রোগ বা অরোগের কোন প্রশ্নই নাই। ঐ অবস্থায় যাহা আছে তাহাই আছে। আবার এমন অবস্থাও আছে যেখানে রোগের যাহা বাহ্য প্রকাশ উঃ আঃ ইত্যাদি শব্দ—তাহা মহাত্মাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে সমতায় স্থিত আছেন তাহার কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না। এ অবস্থায় মহাত্মাদের রোগের যন্ত্রণা ভোগ হয় কিনা সে সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। এ সব ভাবগুলি ধরা পড়া শক্ত।

১২ই ভাদ্র সোমবার (ইং ২৯।৮।১৯৪৯)

আজ সকালে আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। গিয়া দেখি যে হলঘর লোকে পরিপূর্ণ। একজন সাহেব আসিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে আরও ৩।৪ জন লোক আসিয়াছেন। সাহেব বোধহয় মাকে কোনো প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মা তাহার জবাব দিতেছিলেন। আমি ঐখানে পৌঁছিবার একটু পরই তাহারা মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একজন মহিলা এক বোতল তৈল লইয়া আসিলেন। শুনিলাম যে মহিলাটি পালধি মহাশয়ের আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। তিনি বোতল খুলিয়া উহা হইতে কিছু তৈল হাতে লইয়া মায়ের মাথায় দিয়া দিলেন। মায়ের আদেশ মত ঐ বোতল হইতে আমাদের হাতেও একটু একটু তৈল দেওয়া হইল। আমরাও উহা মাথায় মাখিলাম। ডাঃ পান্নালালের নিকট স্বামী শঙ্করানন্দ বসিয়াছিলেন। ডাঃ পান্নালাল

হাসিতে হাসিতে স্বামীজীকে ঐ তেল তাহার দাড়িতে মাখিতে বলিলেন।

স্বামীজী। (হাসিয়া) এই দাড়িরও একটা গল্প আছে উহা মাকে জিজ্ঞাসা করুন। ডাঃ পান্নালাল মাকে ঐ গল্প বলিতে বলিলেন। মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "একবার আমরা লছমন ঝোলায় ছিলাম তখন গোপালজী (শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রয়না) আমার সহিত দেখা করিতে আসিল এবং আমার জন্য সিঙ্গাড়া, টমেটো প্রভৃতি অনেক জিনিষ নিয়া আসিল। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে সে নিজে ঐসব জিনিষ রান্না করিয়া আমাকে খাওয়ায়। কিন্তু রান্না করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ফলে হইল এই যে যখন যেটা রান্না হইতেছে তখনই উহা খাওয়া হইয়া যাইতেছে। সিঙ্গাড়া রান্না হইলে সকলকেই উহা ভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর হইল টমেটোর রসা। কাশ্মিরী রান্না কিনা কাজেই উহাতে জল অপেক্ষা ঘি-ই বেশী ছিল। গরম গরম রসা সকলকেই বাটিয়া দেওয়া হইল। বাবাজী (অর্থাৎ স্বামী শঙ্করানন্দ) উহা খাইতে গিয়া উহার কিঞ্চিৎ দাড়ি এবং গোঁফে লাগাইয়া ফেলিল। দাড়ি গোঁফ লইয়া তরল জিনিষ খাইতে গেলে সাধারণতঃ উহা যে ভাবে গোঁফে লাগে সেই ভাবেই লাগিল। বাবাজী মনে করিল ইহা সামান্য জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই চলিবে। কিন্তু ঠান্ডা জল দিয়া ধুইতে গিয়া ফল হইল বিপরীত। ঠান্ডা পাইয়াই ঘি জমিয়া মোমের মত হইয়া গেল। বাবাজী ঐ ঘি তুলিবাব জন্য বালু লাগাইল। অবস্থা আরো খারাপ হইল। বাবাজী হাতের কাছে সাবান পাইয়া উহাই দাড়ি গোঁফে লাগাইল। কিন্তু ঘি উঠা দূরে থাকুক দাড়ি গোঁফ গুলি ঘি, বালু এবং সাবান সংযোগে সজারুর কাটার মত শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়া বাবাজী আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মা, এখন উপায় কি করি?" (সকলের হাস্য) তখন আমি বলিলাম, "শীঘ্র গরম জল আর সোডা দিয়া মুখ ধুইয়া ফেল।" বাবাজী তাহাই করিয়া গোঁফ দাড়ির এই বিভ্রাট হইতে রক্ষা পাইল।" (সকলের হাস্য)

ডাঃ পান্নালাল। এই গোপালজীই না ক্ষীরের কেশর

খাওয়াইয়াছিল ?

মা। হাঁ, তবে আরও একটা গল্প বলি। আজ এই জাতীয় কথাই হইবে। একবার তোমাদের দাদা মহাশয়কে লইয়া হরিদ্বারে আসা হইল। সঙ্গে খুকুনীর কাকা (তুরীয়ানন্দ) ছিল। আমরা যশোবন্ত সিংহ নামে এক সর্দ্দারের বাড়ীতে উঠিলাম। যশোবন্ত সাধুর পোষাক পরিয়া থাকিত। খুকুনীর কাকার বড় সাধ হইল যে, সে আমাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়। সেই অনুসারে সে উৎসাহের সহিত রান্না করিতে লাগিল। ডালে ফোড়ণ দিতে গিয়া তাহার গোঁফ দাড়ি পুড়াইয়া ফেলিল; কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। যাহা হউক রান্না হইলে সে আমাকে খাওয়াইতে বসিল। রান্নাও বিশেষ কিছু নয়, ভাত, ডাল আরও কিছু হইবে। সে ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া আমাকে খাওয়াইতেছে আর তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমি কিন্তু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছি। আমাকে ঐরূপ হাসিতে দেখিয়া সে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে আমি হাসিতেছি কেন? তাহার হাতে ঐ ভাবে খাইতে খাইতে যখন বুঝিলাম যে সে কতকটা তৃপ্ত হইয়াছে তখন তাহাকে বলিলাম, "কেন হাসিতেছি তাহা শুনিবে?" সে বলিল, "কেন?" আমি বলিলাম, "ডালের দিকে চাহিয়া দেখ।" সে ডালের দিকে চাহিয়া দেখিল যে উহাতে কাল কাল কি যেন ভাসিতেছে। উহা দেখিয়া বলিল, "ওগুলি কি?" আমি বলিলাম, "তোমার দাড়ি গোঁফে কি আগুন লাগিয়াছিল?" সে বলিল, "না ত, তবে ডালে ফোড়ন দেওয়ার সময় মুখে আগুনের আঁচ লাগিয়াছিল।" এই বলিয়া মুখে হাত দিয়া দেখে যে সত্যই দাড়ি গোঁফ পুড়িয়া কোঁকড়াইয়া আছে। তখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে ঐ পোড়া গোঁফ দাড়িই ডালের উপর ভাসিতেছে। তখন সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "হায়, মা, আমি একি করিলাম! তোমাকে কি খাওয়াইলাম!" এ শরীর হইতে বোধ হয় তখন বলা হইয়াছিল যে ভাবের জন্যই খাদ্যের দোষ কাটিয়া যাইবে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন খাওয়া-দাওয়া অতি সামান্যই

ছিল। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতাম। শা'বাগে কতদিন মাটিতে ভাত রাখিয়া খাইতাম। যে মাটির উপর ভাত রাখা হইত তাহা যে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হইত তাহাও নয়। চুল, বালু যাহা থাকিত উহারই উপর ভাত ঢালিয়া উহা মাখিয়া খাইতাম। পিশাচবৎ আর কি! আবার কিছুদিন বা হাতে ভাত রাখিয়া ডান হাতে খাইতাম। আবার দুই হাতে ভাত লইয়া গরুর মত মাথা নীচু করিয়া খাইতাম। কুকুরকে খাইতে দেখিয়া তাহার সহিত খাইতে যাইতাম। তখন বিচার আচার কিছু ছিল না। ভোলানাথ এ সব দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিত এবং জোর করিয়া সরাইয়া দিত। সরাইয়া আমাকে যেখানে রাখিত সেইখানেই ঢলিয়া পড়িতাম এবং ঐভাবেই হয় ২।৩ দিন কাটিয়া যাইত।"

ভাইজীর 'মা' সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুস্তকের ইতিহাস

মা বলিতে লাগিলেন, "ভোলানাথ যেবার জ্বালামুখীতে সাধনা করিতে গেল ভাইজীকে লইয়া আমি বৈজনাথে ছিলাম। বৈজনাথে তারানন্দের আশ্রমে ছিলাম। স্থানটি খুব নির্জন, আমরা মাত্র চারিটি প্রাণী। তারানন্দ, তাহার এক ব্রহ্মচারী শিষ্য, জ্যোতিষ এবং আমি। এই সময় জ্যোতিষ আমাদের বার বার প্রশ্ন করিয়া আমার সাধন অবস্থার বিভিন্ন কথা লিখিয়া রাখিত। এইরূপ লিখিয়া রাখার ইচ্ছা তাহার বহুদিন হইতেই ছিল। সে যখন আমাকে লইয়া রমণার মাঠে বেড়াইত তখন একদিন বলিয়াছিল, 'মা, তোমার এইসব কথাগুলি যদি লিখিয়া রাখিতে পারিতাম!' তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেল তাহার আর লেখা হইয়া উঠিল না। বৈজনাথে থাকার সময় তাহার পূর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠিল এবং সে কিছু কিছু করিয়া লিখিয়া রাখিতে লাগিল। জ্যোতিষের ইচ্ছা ছিল যে, সে যাহা লিখিয়াছে তাহা আমাকে পড়িয়া শুনায়। কিন্তু সে সুযোগ আর হইয়া উঠিল না। তাহার আগ্রহ দেখিয়া কৈলাস যাত্রার সময় তাহাকে বলিয়াছিলাম যে একসময় শুনিলেই ত চলিবে। কিন্তু কৈলাস হইতে ফিরিয়াই জ্যোতিষ মারা গেল। তাহাকে কথা দিয়াছিলাম যে তাহার লেখা

শুনিব, তাই আজ ১১ বৎসর যাবৎ ঐ লেখা আমাকে পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা চলিতেছে। খুকুনী, অভয়, গঙ্গাচরণবাবু—কত জনাই উহা পড়িয়া শুনাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সবটা শুনাইতে পারে নাই। এখন আবার কমল উহা শুনাইতেছে। শুনিতে শুনিতে অনেক সময় দেখিতে পাইয়াছি যে আমি যাহা বলিয়াছি জ্যোতিষ উহার বিপরীত লিখিয়াছে। অবশ্য এগুলি খুব বেশী নয়; কিন্তু এরূপ যে উল্টা লেখা হইয়াছে তাহা বলিবারও খেয়াল হয় নাই।"

ডাঃ পান্নালাল ঐ পাণ্ডুলিপি সকলের সমক্ষে পাঠের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মা বলিলেন, "জ্যোতিষের ইচ্ছা ছিল যে আমি সকলটা না দেখিলে উহা জনসাধারণকে দেখানো হইবে না. তাহা ছাড়া উহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। এখন যাহা বলি তাহার কাছে তাহাই বলিয়াছি। একটা যে বিশেষ কোন অবস্থার কথা ঐখানে আছে তাহা নয়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা উঠিবার পূর্বে আমাকে বলিলেন, "তুমি এক বাটি তেল নিয়া মনাদাদাকে দিয়া বলিবে, "মা বলিয়াছেন যে এই তেল মাথায় মাখিয়া সে যেন গঙ্গার ধারে বাতাস খায়।"

মা উঠিয়া গেলে আমি ঐ তেলের বাটিটি মনোমোহনকে দিয়া আসিলাম।

২১শে ভাদ্র, বুধবার (ইং ৭।৯।৪৯)

আজ অনেক দিন পর সকালবেলা মা হলঘরে আসিয়াছেন। মা'র শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া এতদিন হলঘরে আসেন নাই। অবশ্য এই অসুস্থ দেহ লইয়াই মা আশ্রমের ত্রিতল কক্ষে গিয়া ডাঃ পান্নালালকে দেখিয়া আসিতেছিলেন। ডাঃ পান্নালালও অসুস্থ। শ্রীশ্রী মায়ের অসুখও আমাদের অসুখ হইতে ভিন্ন। কারণ সর্বদা তিনি যেরূপ হাসিমুখে কথাবার্তা বলেন, অসুখ হইলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। চলাফেরাও যে একেবারে বন্ধ থাকে তাহাও নয়। বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই যে মা অসুস্থ। ডাক্তার অবশ্য ডাকা হয়। ডাক্তারও ব্যবস্থা দেন, কিন্তু ঔষধ সেবন করেন না, পথ্য সম্বন্ধে

কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিয়া চলেন—এই পর্যন্ত।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

আমার আশ্রমে পৌঁছিতে ১১টা বাজিয়া গেল। হলঘরে গিয়া দেখিলাম দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। তিনি কি প্রশ্ন মাকে করিয়াছিলেন তাহা জানি না তবে মাকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সম্বন্ধে কথা বলিতে শুনিলাম। মা বলিতেছিলেন, "যাহা ভগবান্ ভিন্ন আলাদা কিছু মানিয়া লয়—তাহাই মন, এইরূপ মানিয়া লওয়াই মনের কাজ। বিচার ইত্যাদি দ্বারা যাহা ধরা যায়—তাহাই বুদ্ধি। আর অহঙ্কার হইল, যে অহং হইতে ক্রিয়া হয়, যে অহং ভোগাদি করে বা ভোগাদির জন্য কাজ করে—তাহাকে আমি অহঙ্কার বলি। তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা তোমরা জান। আমার ত এইরূপ আবোল তাবোল কথা। যতক্ষণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার জাগতিক ব্যাপার নিয়া, সাংসারিক ভোগাদি লইয়া, ব্যস্ত থাকে তখন উহাদিগকে অশুদ্ধ বলা হয়। ঐ মনই যখন আধ্যাত্মিক পথে চলিতে থাকে তখন উহা শুদ্ধবস্তুর সঙ্গগুণে শুদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। আধ্যাত্মিক পথে চলিতে চলিতে মনের নিত্য নূতন অনুভূতি হইতে থাকে, এখানেও এক বিচিত্র জগৎ এবং বিচিত্র রকমের আনন্দের অনুভূতি। লোক বিচার পথেই চলুক আর ভক্তি পথেই চলুক তাহাদের পথ অনুযায়ী বিচিত্র রকমের অনুভূতি আসিবেই এবং এই অনুভূতিগুলিও অনন্ত। আধ্যাত্মিক জগতে এই যে অনন্ত বৈচিত্রময় তত্ত্ব সকলের ধারণা হয়—উহাও কিন্তু মনেরই কাজ। তবে এই মনকে তখন বিশুদ্ধ মন বলা হয়। এই মাত্র ভেদ। এই পথে চলিতে চলিতে সাধক মনে করে যে, সে এক নূতন জগতে আসিয়াছে। এখানকার আনন্দ, এখানকার দৃশ্য—সমস্তই জাগতিক আনন্দ ও দৃশ্য হইতে ভিন্ন। কোন কোন সাধক এই আনন্দে ভরপুর হইয়া কোন এক স্থানে স্থিত হইয়া যায় এবং সে এই অবস্থাকেই পরমার্থ বা নিত্য অবস্থা বলিয়া মনে করে। সে ঐ ভাবেই উহাকে অন্যের কাছে প্রচার করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে যে আনন্দরূপে যাহা অনুভব করা যাইতেছে উহা নিত্য অবস্থা নয়। উহাও

অনন্ত অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা মাত্র। যখন সেই নিত্য অবস্থাতে পৌঁছান যাইবে তখন আর আনন্দের বোধ থাকিবে না। তখন উহা আনন্দ স্বরূপই হইবে। কারণ আনন্দের বোধ বলিলে দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়। যতক্ষণ দ্বৈতভাব ততক্ষণ নিত্য পূর্ণ অবস্থা কোথায়? এই যে নিত্য অবস্থায় পৌঁছানর কথা বলা হইল, ইহাও কিন্তু ঠিক নয়। কারণ যাহা নিত্য সর্বত্রই সমভাবে আছে, কাজেই উহাতে পৌঁছান বলা ঠিক হয় না। উহার প্রকাশ হয় এই মাত্র। আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অনুভূতির মধ্যে তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ যে কোন অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে লইয়া যাইতে পারে। ইহাও ত এমন নয় যে, এতটা কর্ম্ম করিলে তবে তাঁহার প্রকাশ হইবে। ভক্তির পথে চলিলে যেমন বিভিন্নভাব ও বিভিন্ন আনন্দের অনুভূতি হইতে হইতে উহার যে কোন অবস্থায় তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়া সাধককে আনন্দ স্বরূপ করিয়া দেয়, সেইরূপ সাধক বিচারের পথে চলিতে চলিতে যে কোন মুহূর্তে তাঁহার কৃপায় বোধস্বরূপ বা বুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই যে আনন্দস্বরূপ বা বোধস্বরূপ বা বুদ্ধ বলা হইল ইহা কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল না। কারণ যেখানে ব্যক্তি থাকে সেইখানেই দ্বৈত অবস্থা থাকে। আনন্দস্বরূপ, বোধস্বরূপ এগুলি অদ্বৈত অবস্থা।" এইসব কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

মায়ের আশীর্ব্বাদী বস্ত্র ও মালা লাভ

২২শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার (ইং ৮।৯।৪৯)

আজ সকালবেলা খুকুনীদিদি আমার বাসায় আসিয়া আমাকে একখানা নতুন কাপড় দিয়া বলিলেন, "মা এই কাপড়খানা এক্ষণই আপনাকে দিয়া যাইতে বলিয়াছেন। ছেলেকে পূজার কাপড় দিতে হইবে ত?" আমি মাকে বলিয়াছিলাম যে দাদাত বিকালে আশ্রমে আসিবেন তখন তাহাকে ইহা দিলেই চলিবে; কিন্তু সেকথা শুনে কে? দিদি কাপড়খানা দিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি আশীর্ব্বাদী

কাপড়খানা প্রণাম করিয়া তুলিয়া রাখিলাম।

বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে মা ষ্টেশনে চালিয়া গিয়াছেন। ডাঃ পান্নালাল চিকিৎসার জন্য আজ লক্ষ্মৌ রওনা হইলেন, তাঁহাকে বিদায় দিতেই মা ষ্টেশনে গিয়াছেন। কাজেই আজ সকালবেলা কোন আলোচনা হইল না।

বিকালবেলাও মা পাঠে বসিলেন না। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ চত্বরে বসিয়া কীর্তন করিতেছিলেন এবং মা ঐখানে পা'চারি করিতেছিলেন। আমি কীর্তন স্থানে গিয়া বসিলাম। মা বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আসিয়া পেছন হইতে একটি মালা আমার গলায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আশীর্ব্বদী মালা পাইয়া মাকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলাম।

লীলার অর্থ

২৩শে ভাদ্র, শুক্রবার (ইং ৯।৯।৪৯)

সকালবেলা শুনিতে পাইলাম যে পাঞ্জাব মেলে মা আজ কলিকাতা রওনা হইবেন। কলিকাতার ভক্তরা মাকে কলিকাতা নিবার জন্য বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মায়ের যাতায়াত খরচ বাবদ কিছু টাকাও তাহারা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা যাইবার জন্য মাঝে মাঝেই মাকে টেলিগ্রাম করিতেছিলেন। গতকাল্য রাত্রি ১২টা পর্যন্ত মা'র কলিকাতা যাওয়ার কোন কথা শুনি নাই। হঠাৎ আজ সকালে শুনিতে পাইলাম যে মা আজই কলিকাতা যাইবেন এবং আগামী মঙ্গলবার এখানে ফিরিয়া আসিবেন।

বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা হল ঘরে বসিয়াছিলেন। খুব অল্প সংখ্যক লোক মা'র কাছে ছিল। আমি মাকে প্রশ্ন করিলাম, "মা, ভগবানের লীলা বলিয়া যাহা বলা হয় তাহার কোন ধারণা করিতে পারি না। এই লীলার অর্থ কি?"

মা। খেলা। আবার বলিতে পার এ খেলারই বা অর্থ কি?

আমি। সে দিন তুমি বলিতেছিলে যে ত্রিগুণের মধ্যে যতগুণ থাকা যায় ততক্ষণ লীলা নাই, কিন্তু এই ত্রিগুণ না থাকিলে নানাত্বও

থাকে না; তখন বহুর শেষ হইয়া একের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অবস্থায় লীলা বা খেলা হয় কেমন করিয়া ?

মা। যতক্ষণ গুণের মধ্যে থাকা যায় ততক্ষণ এই সব গুণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যেমন সত্ত্বগুণের শান্ত ভাব, রজঃ গুণের তেজঃ বা চঞ্চলতা ইত্যাদি ভাব এবং ইহার মধ্যে বন্ধুভাবের উপলব্ধি হয়। তাহা ছাড়া গুণের মধ্যে থাকিয়া যাহা দেখা যায় তাহারই একটা সীমা আছে। এ অবস্থায় অনন্তের বা সীমাহীন অবস্থার কোন ধারণা হয় না; কিন্তু গুণের মধ্যে অতীত হইয়া যখন এক বা কেবলী ভাব হয় তখনই লীলা বুঝা যায়।

আমি। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি তাহার মধ্যেই একটা কার্য কারণ সম্বন্ধ পাই, কিন্তু যেখানে এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেই অবস্থাটাকেই আমরা লীলা বলিয়া ছাড়িয়া দেই। যেমন অনেক সময় তুমি বল যে তোমার খেয়ালের জন্য তুমি ইহা করিলে। তোমার কার্য্যটা আমরা দেখিলাম; কিন্তু ইহার কোনই কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম যে ইহা মায়ের খেয়াল বা লীলা।

মা। না, ইহাকে লীলা বলে না, জগতে এমন অনেক কাজ আছে যাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহার কারণ যে নাই তাহা নহে তবে কারণ ধরা শক্ত অথবা উহার কারণ গুপ্ত। কারণ না পাওয়া গেলেই যে উহা লীলা হইবে তাহা নয়। ধর না তুমি এক ছিলে, তারপর বিবাহ করিয়া দুই এবং বহু হইলে। এখানে তুমি তোমার ছেলেপেলের সহিত যে ব্যবহার কর—তাহা স্বাধীনভাবে কর। এই স্বাধীনভাব না থাকিলে লীলা হয় না। উপমা অবশ্য সর্ব্বাংশে সমান হয় না। তোমার এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে একটা একত্বভাব থাকিলেও কিন্তু আলাদা আলাদা ভাব আছে। যখন প্রকৃত পক্ষে এই একত্বভাব হয় তখন কোন সীমা থাকে না বলিয়াই স্বাধীন ভাব। এই স্বাধীন ভাব হইতেই লীলা হয়। এখানে অপর বলিয়া কেহ থাকে না বলিয়া এই লীলা দেখা বা বুঝা যায় না। যাহাদের এই একত্বের অনুভূতি আছে মাত্র তাহারাই ইহা বুঝিতে পারে। অন্যে

যখন লীলা বলে তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা তাহাদের শুনা কথা ভিন্ন কিছু নয়। সেদিন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লীলার কথা হইতেছিল না? প্রাকৃত কিনা যেখানে পর পর ভাব অর্থাৎ ক্রম আছে। আর অপ্রাকৃত হইল তাহাই যেখানে পর পর ভাব নাই; কিন্তু এই প্রাকৃত জিনিষটাই বা কি? ইহাও ত সে-ই। তবুও এ ভাবে ভাগ করার অর্থ হইল এই যে, যতক্ষণ পর পর বা আলাদা ভাব থাকে ততক্ষণ উহার মধ্যে গুণের খেলা থাকে বলিয়া উহাকে জগতের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় আর অপ্রাকৃত অবস্থাতে গুণ বা পর পর ভাব থাকে না বলিয়া উহাকে লীলা বলা হয়। আবার এমন অবস্থা আছে যেখানে লীলার কোন প্রশ্নই নাই। কারণ কে লীলা করে? কাহাকে লইয়া লীলা করে? সবই ত সেই-ই। এইভাবে দেখিলে লীলাতে এবং অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতা হইতে এখানে ২৭শে ভাদ্র ফিরিয়া আসিলেন। আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া মা'র সঙ্গে ২/৩ দিন দেখা করিতে পারিলাম না। মা ১লা আশ্বিনই দেরাদুনে রওনা হইয়া গেলেন। এবার অনেকেই পূজা উপলক্ষে দেরাদুনে গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ মাত্র ভূপতিবাবু এবং মনোমোহন গিয়াছে। আমাদিগকেও যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইল না।

শ্রীশ্রীমায়ের কাশীতে প্রত্যাবর্তন এবং সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির প্রস্তুতি

(দুই)

৪ঠা কার্তিক শুক্রবার (ইং ২১।১০।১৯৪৯)

আজ বেলা ৩টার সময় শ্রীশ্রীমা দিল্লী হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পূজার সময় মা দেরাদুনে ছিলেন। সেখানেই এবার পূজা হইয়াছে। লক্ষ্মীপূর্ণিমার পূর্ব্বেই মা হরিবাবার আহ্বানে বৃন্দাবনে যান। সেখানে ১০।১২ দিন থাকিয়া দিল্লী হইয়া কাশী আসিয়াছেন।

৫ই কার্তিক শনিবার (ইং ২২।১০।১৯৪৯)

আজ বেলা ১০টার পূর্ব্বেই আশ্রমে গেলাম। মা তখন পর্য্যন্ত হলঘরে আসেন নাই। আমি মনোরঞ্জন (সরকার) দাদার ঘরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পর মা ঐ ঘরে আসিলেন। আমি প্রণাম করিলে মা আমাকে বলিলেন, "হলঘরে গিয়া বস, আমি একটু পরেই যাইতেছি।" একটি ভদ্রলোক এবং তাঁহার স্ত্রী মা'র কাছে গোপন কোন কথা বলিলেন। আমি হলঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরেই মা হলঘরে আসিলেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাকে প্রণাম করিলে, মা বলিলেন, "বাবা, ভাল আছ ত?

বৃদ্ধ। ইহাও কি তোমার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে?

মা। কথা বলা ত চাই। যদি কিছু না বলি তবে তোমরাই বলিবে, "মার কাছে গেলাম, মা একটা কথাও বলিলেন না!" (সকলের হাস্য)।

ইহার পর মা বৃন্দাবনের কথা বলিলেন। সেখানে হরিবাবার প্রোগ্রামের জন্য মাকে প্রত্যহ ৯ ঘন্টা বসিয়া থাকিতে হইত। পাঠ,

কীর্তন, ভাগবত ব্যাখ্যা ইত্যাদি ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত চলিত। শুনিলাম হরিবাবা, অখণ্ডানন্দজী, অবধূতজী, ত্রিবেণীপুরী মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ যজ্ঞ শেষ হওয়ার একমাস পূর্ব্বে এখানে আসিবেন। জ্যোতিষবাবুর (ভাইজীর) সম্পর্কিত এক ব্যক্তির পরিচয় মাকে দেওয়া হইলে ভদ্রলোকটি বলিলেন যে তিনি কিছুদিন কাশীতে থাকিবেন বলিয়াই এখানে আসিয়াছেন; কিন্তু কাশীতে যে থাকা হইবে তাহা তাঁহার মনে হয় না, কারণ এখানে স্থানাভাব। কোন বাড়ীই পাওয়া যাইতেছে না।

মা। একটু খোঁজ করিয়া দেখ। যদি বাস্তবিক বিশ্বনাথের আশ্রয় নিতে আসিয়া থাক তবে তিনি স্থান করিয়া দিবেনই। স্থান করিয়া দিবেন কেন? স্থান ত আছেই, কাজেই স্থান রূপেই তাঁহার প্রকাশ হইবে। তাঁহার ত কিছুরই অভাব নাই। দরকার শুধু খোঁজ করার। সকল বিষয়েই এইরূপ জানিবে। সব কিছুই তাঁহার ভাণ্ডারে আছে। ঠিক ঠিক চাহিতে পারিলেই তিনি আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপে নিজকে প্রকাশ করেন। যদি বাড়ীর জন্য খোঁজটা তেমনভাবে না হয়, যদি মনে কর যে থাকিবার জায়গা ত আছেই, এখানে বাড়ী পাই তবে ত ভালই; না হইলে নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাইব—এরূপ ভাব থাকিলে কিন্তু স্থান পাওয়া যাইবে না। যা'র জায়গা থাকে, সে জায়গা পায় না। কিছু না থাকিলেই কিছু পাওয়া যায়।

তোমার আপনার বুঝ ষোল আনা

ইহার কিছুক্ষণ পরেই দুইজন ভদ্রলোক আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন।

মা বলিলেন, "কেমন আছ বাবা?"

ভদ্রলোক। ভালই আছি।

মা। ভাল কাহাকে বলে? তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই ভাল কথা। তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করাই একমাত্র ভাল থাকার উপায়, কারণ ভগবানকে বাদ দিয়া আর যাহা কিছু লইয়া থাকিবে—তাহাতেই দুঃখ, কষ্ট।

ভদ্রলোক। ইহা আপনার কৃপা ভিন্ন হইবার উপায় নাই।

মা। (হাসিয়া) তাহা ত ঠিক কথা, আপনার কৃপা না হইলে কিছুই হইবার উপায় নাই। তোমরা বল না "আমি আপনি গিয়াছিলাম? সেই আপনারই ত দরকার। (সকলের হাস্য) আপনি অর্থই তিনি, ভগবান। কিছুক্ষণ পর মা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তোমার ছুটি?"

ভদ্রলোক। আমাদের আবার ছুটি!

মা। কেন, ডাক্তারের ছুটি নাই?

ভদ্রলোক। না।

মা। ডাক্তারের ছুটি না থাকাই সম্ভব; কারণ ডাক তাঁর কিনা। (সকলের হাস্য) কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। পরে মা আবার হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "খুকুনী অনেক সময় আমাকে বলে, "আপনার বুঝ তোমার ষোল আনাই আছে।" এবার বৃন্দাবনে যাহারা এক সপ্তাহ ভাগবত পাঠ করাইল তাহারা তাহাদের মন্দির দেখাইবার জন্য আমাকে বড় পীড়াপড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের পীড়াপীড়িতে আমার একবার খেয়াল হইল যে বৃন্দাবন হইতে রওনা হইবার দিন মোটর গাড়ীতে গিয়া ঐ মন্দির দেখিয়াই চলিয়া যাইব। রওনা হইবার দিন যে মোটর আসিবার কথা ছিল তাহা আসিল না। তখন একখানা টাঙ্গা করিতে বলা হইল। টাঙ্গা করিয়া মন্দির দেখিতে চলিয়াছি, এমন সময় দেখি একখানা মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম, "ইহা যাহার গাড়ীই হউক না কেন আমি এই গাড়ীতে চড়িয়াই মন্দির দেখিতে যাইব।" এই বলিয়া আমি টাঙ্গা হইতে নামিয়া পড়িলাম। এদিকে ড্রাইভার মনিবের আদেশ ভিন্ন মোটর চালাইতে নারাজ। তাহার সহিত আমাদের যখন এই সব কথা হইতেছিল তখন হরিবাবার দলের একজন লোক সেখানে আসিল। সে ড্রাইভারের আপত্তির কথা শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি এখনই উহার মনিবের আদেশ আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে আশ্রমের দিকে দৌড়াইল। যাহার মোটর গাড়ীতে হরিবাবা

আমাদিগকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন—এ গাড়ীখানা ছিল তাহারই। আমি তাহার মোটরে উঠিয়া বসিয়াছি এবং তাহার ড্রাইভার তাহার অনুমতি ভিন্ন গাড়ী চালাইতে পারিতেছে না এ খবর শুনিয়া সে তখনই আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল এবং সে বলিতেছিল, "মা, এমনি করিয়া তুমি আমাকে তোমার আপন করিয়া নিলে!" (ডাক্তার ভদ্রলোককে দেখাইয়া) বাবাজীর 'আপনার' কথা হইতেই এই ঘটনাটির খেয়াল আসিয়া গেল।

নিন্দুককে নিন্দার ফল ভোগ করিতে হয়
৬ই কার্তিক, রবিবার (ইং ২৩।১০।১৯৪৯)

আজ প্রায় বেলা ১১টায় মা হলঘরে আসিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা দশজনে যদি কাহারও প্রশংসা করে তবে শুনিয়াছি যে যাহার প্রশংসা করা হয় তাহার মঙ্গল হয়। কিন্তু দশজনে যদি কাহারও নিন্দা করে তবে নিন্দা করা হয়, ঐ নিন্দার জন্য তাহার কোন ক্ষতি হয় কি? দশ জনে যদি কোন সৎ লোককে চোর বলিতে থাকে তবে ঐ নিন্দার ফলে তাহার চুরি করার প্রবৃত্তি হয় কি?

মা। এ গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা। এমন অবস্থা আছে যখন ঐ সব নিন্দার ফলে লোকের চরিত্র খারাপ হয়। আবার এমন অবস্থা আছে যখন ঐ নিন্দা অন্যের উপর কোন ক্রিয়াই করে না। যাহারা নিন্দা করে তাহাদের কাছেই উহা থাকিয়া যায়। যেমন আগুন যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন যদি উহাতে কাঁচা কাঠও ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে উহা কাঁচা কাঠকে শুকাইয়া জ্বালাইয়া দেয়; কিন্তু আগুনের জোর যদি তেমন প্রবল না থাকে তবে উহার উপর কাঁচা কাঠ দিলে আগুন নিভিয়াই যায়। এ কথা ত সকলেই জানে যে একে যদি অন্যের নিন্দা করে তবে যাহার নিন্দা করা হয় তাহার দোষগুলি নিন্দার সঙ্গে সঙ্গেই নিন্দুকের নিকট আসে। এই হিসাবে যাহার নিন্দা করা হয়, নিন্দা করিয়া তাহার উপকারই করা হয়। কিন্তু যে নিন্দা করিতেছে সে যদি মনগড়া নিন্দা করে তবে ঐ নিন্দার ফল ষোল আনাই তাহাকে ভোগ করিতে হয়। আবার এই নিন্দার যদি

সূত্রপাত অন্য কেহ করিয়া থাকে তবে নিন্দাকারীর সহিত তাহাকেও ইহার ফল ভোগ করিতে হয়।

ইহার পর আর বিশেষ কথা হইল না। বেলা ১২।।টা বাজিয়াছে দেখিয়া আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আশ্রমে ভাইফোঁটা

সন্ধ্যার পর মা চত্বরে আসিয়া বসিলেন, আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আশ্রমে আজ ভাইফোঁটা দেওয়ার আয়োজন হইয়াছে। নেপাল (ব্রহ্মচারী) দাদা* বলিলেন—আশ্রমে এই ভাইফোঁটা দেওয়ার প্রথা স্বামী শাশ্বতানন্দই প্রবর্তন করিয়াছেন। খুকুনীদিদি আশ্রমের সমস্ত মহিলাদের প্রতিনিধি হইয়া মায়ের ভক্তগণকে এই ভাইফোঁটা দিয়া থাকেন। ইহা উপলক্ষ্য করিয়া সকলের কপালে যে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয় মা উহার নামকরণ করিয়াছেন "ব্রহ্মবিন্দু"। এবার দিদি আমাদের সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ফুল দূর্বা দ্বারা আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে প্রত্যেকের হাতে দুইটি করিয়া রসগোল্লা দিলেন, যখন এই ফোঁটা দেওয়া হইতেছিল তখন শ্রীশ্রীমা আশ্রমের ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীদিগকে "জয় শিব শঙ্কর বম বম হর হর"—এই পদটি গাহিতে বলিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত এই উৎসব চলিল।

১৭ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার (ইং ৩।১১।১৯৪৯)

বৃন্দাবন হইতে আসিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ চলিতেছে। সেখানে হরিবাবার ব্যবস্থানুসারে পাঠ শ্রবণ ইত্যাদির জন্য মাকে প্রত্যহ ৯ ঘন্টাকাল বসিয়া থাকিতে হইত। শ্রীশ্রীমায়ের পা দুটি যে ফুলিয়াছে তাহাও বোধ হয় এইজন্য। পেটের ভিতর বেদনাও আছে। ইতিমধ্যে একজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। মা ঔষধ খান না তাহা তিনি জানেন। কাজেই তিনি শুধু পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং মাকে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

---

* নারায়ণানন্দ স্বামী

এই ব্যবস্থানুসারে মা কন্যাপীঠের নীচের ঘরে আছেন। কখন কখন চত্বরে আসিয়া একটু বেড়াইয়া যান। মা'র দেখা আমরা অল্প সময়ের জন্য পাই। সকালের দিকে ১০।। হইতে ১১।।টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রিতে ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মায়ের সহিত দেখাশোনা করিবার সময় নির্ধারিত হইয়াছে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না, তাহা নহে। আজ বেলা ১১টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন মাকে চত্বরের উপর বসা দেখিলাম। কয়েকজন মহিলা মায়ের কাছে বসিয়াছিলেন। ভূপতি (মিত্র) বাবুও ঐখানে ছিলেন। পটলদাদা মায়ের শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, "শরীর প্রায় একরূপই আছে। পায়খানা ভাল হইতেছে না, যাহা খাওয়া হইতেছে তাহাই পেটের নাড়ীর মধ্যে জমা হইতেছে এবং এইভাবে জমা হইতে হইতে পেটের নাড়ীটা ফুলিয়া লম্বা হইতেছে। এইরূপ হইলে কি পেটে ব্যথা না হইয়া পারে? পূর্ব্বে যখন মাঝে মাঝে খাওয়া হইত তখন পায়খানা কিছু কিছু হইত। ডাক্তার মনে করিল যে খাওয়াটা ভালভাবে হইলেই পায়খানা পরিষ্কার হইবে; কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। কেবল পথ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের ব্যবস্থা মত চলিয়াই এই অবস্থা, তাহার ঔষধ খাইলে না জানি কি হইত?

(সকলের হাস্য)

পূজার আদর্শ

এমন সময় বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিলেন। তিনি মাকে— প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "পূজার সময় নৈবেদ্যাদির পাত্রের নীচে নানামণ্ডল আঁকা হয় কেন?"

মা। এ সব কথা ত তোমাদের শাস্ত্রেই আছে।

শাস্ত্রীমহাশয়। ইহাও কি শাস্ত্র হইতে দেখিয়া লইতে হইবে?

মা। হাঁ, শাস্ত্রে ত সবই ঠিক ঠিক আছে। সকল পূজায় কি একরূপ চিহ্ন দিতে হয়?

শাস্ত্রীমহাশয়। না, কোন পূজায় মণ্ডলগুলিকে ত্রিকোণ, কোন পূজায় চতুষ্কোণ এইরূপ করিতে হয়। আমার আচার্য্য আমাকে

বলিয়াছিলেন যে নৈবেদ্য আসনের উপর রাখারই নিয়ম। এখন ত প্রায় উহা হইয়া উঠে না। সেইজন্য মাটির উপর আসনের একটি প্রতীক অঙ্কিত করিয়া নৈবেদ্য রাখা হয়।

মা। পূজা করিবার সময় কোশাকুশির নীচেও মণ্ডল করা হয়। ছোটবেলায় দেখিয়াছি যে লোক আহার করিবার সময়ও যে স্থানে ভাতের থালা রাখিতে হইবে সেখানে জলের ছিটা দিয়া পরে থালা রাখিত। আহারও যজ্ঞ কিনা, তাই সবই শুদ্ধভাবে চলিতে হয়। আবার তোমরাই বল যে দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিতে হয়। যিনি পূজা করিবেন তাহারই দেবতা হওয়া আবশ্যক হয়। তবে যাহা দিয়া পূজা করা তাহাও দেবতা হওয়া দরকার অর্থাৎ তিনিই তাঁহাকে তাঁহা দ্বারা পূজা করিতেছেন। সর্বভূতে এই একাত্ম ভাব লাভ করাই হইল পূজার লক্ষ্য। সেই হিসাবে ঐ মণ্ডলগুলিকে দেবতার প্রতীক মনে করা যাইতে পারে। তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা তোমরা জান, এখানে যাহা খেয়াল তাহা বলা হইয়া গেল।

এই বলিয়া মা কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রণাম করিয়া আহার করিতে চলিয়া গেলেন। আজও ব্রাহ্মণ ভোজন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে। আজ ২৫০ ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন। একে একে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কথাগুলি বলিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। মা বলিলেন, "কেহ যদি একবার দুর্জয় শক্তির আবর্তে পড়িয়া যায় তবে উহা হইতে বাহির হইয়া আসা বড় শক্ত। শক্তিরও বিভিন্ন রকম খেলা হয় কিনা। তোমরা এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি বল না? কাজেই কথা হয় যে এক ব্রহ্ম বা আত্মার বৈচিত্র্য থাকে কেমন করিয়া? যাহারা বৈচিত্র্য লইয়া আছে তাহারা একদিক লইয়া আছে। আবার যাহারা বিচিত্রতা শূন্য ব্রহ্ম লইয়া আছে তাহারাও কিন্তু একদিক লইয়া আছে। কিন্তু বিচিত্রতার মধ্যে যে একের অনুভূতি হয়, অর্থাৎ এক আত্মাই যে বিচিত্র ভাবে আছেন তাহার অনুভূতি খুবই দুর্লভ। একদিক লইয়া

থাকিলে দ্বন্দ্ব আসিবেই।"

বেলা ১২টা বাজিয়াছে। চত্বরের উপর ব্রাহ্মণের ভোজনের জায়গা করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন।

জ্ঞান মার্গে বিভূতি প্রকাশ হয় কিনা

১৯শে কার্তিক, শনিবার (ইং ৫।১১।১৯৪৯)।

আজ বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে কন্যাপীঠের বারান্দায় বসা দেখিলাম। স্ত্রী পুরুষ অনেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবশঙ্করবাবুকেও এখানে দেখিলাম, তখন কি একটা বিষয় যে আলোচনা হইতেছিল। দেবশঙ্করবাবুকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলিতে শুনিলাম। কিন্তু নানাপ্রকার বাধা উপস্থিত হওয়াতে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। ইহার পর দেবশঙ্করবাবু মাকে বলিলেন, "অলৌকিক শক্তির কথা যাহা শুনা যায় তাহা যোগ মার্গের সাধকের থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান মার্গের সাধক তাঁহারা শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বলিয়া তাঁহাদের বিভূতি লাভ সম্ভব নয়"।

স্বামী শঙ্করানন্দ। আধ্যাত্মিক পথে চলিলে বিভূতি আসিবেই আসিবে; এখন সাধক যে পথের পথিক হউক না কেন?

মা। বাবাজী (অর্থাৎ দেবশঙ্করবাবু) যাহা বলিতেছে তাহা এক অর্থে অবশ্য সত্য। কারণ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইল সেখানে আলাদা আলাদা ভাব থাকে না বলিয়া লাভালাভের কোন প্রশ্ন থাকে না। জ্ঞানী যেমন চলেন না, ঘুমান না, আহার করেন না সেইরূপ তিনি কোন শক্তি লাভও করেন না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে তিনি শক্তিশূন্য। শক্তি তাহার মধ্যে অখণ্ডভাবে থাকে। শক্তি সম্বন্ধে তাহার কোন আলাদা জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ শক্তি তাহার স্বভাবের মধ্যে চলিয়া যায়।

দেবশঙ্করবাবু। জ্ঞানের চরম অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু যাহারা জ্ঞান পথে সাধক মাত্র, তাহাদেরও কি শক্তি লাভ হয়?

মা। সাধকের কথা যখন বলিতেছ, তখন বলিতে হয় যে, শক্তি ভিন্ন সাধনা করাও সম্ভব নয়। যেখানে ক্রিয়া আছে সেইখানেই শক্তির

প্রকাশ। তবে একথা বলিতে পার যে জ্ঞানমার্গের সাধক শক্তি বা বিভূতি লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ইহার অর্থ এই যে শক্তিলাভ তাহাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সহিত তাহাদের পরিচয় হয় না তাহা নহে। কারণ সাধন পথে চলিলে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই আলাদা আলাদা শক্তির প্রকাশ হইবে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলে যেমন প্রত্যেক সিঁড়িতেই উঠিতে হয়, সেইরূপ পূর্ণত্বের দিকে যাইতে হইলেও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই সব অবস্থা বা শক্তি লাভ যাহাদের লক্ষ্য নয় তাহারা ইহা মাত্র দেখিয়াই যায়। রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে কত ষ্টেশন ও সুন্দর সুন্দর শহর পথে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কেহ ঐ সব শহরে দেখিবার জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে তাহার পক্ষে যেমন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ সাধক যদি সাধন পথে বিভূতি লইয়া খেলা করিতে থাকে তবে তাহারও আর চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। একবার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে সেখানে কিন্তু সমস্ত শক্তিই অখণ্ডভাবে পাওয়া যায়। কারণ পূর্ণতার মধ্যে কিছুরই ত অভাব নাই। যদি পূর্ণতা লাভ করেন তাঁহার পক্ষে শক্তি প্রকাশ করা বা না করা সম্পূর্ণ তাঁহার খেয়ালের উপর নির্ভর করে কারণ শক্তি তাঁহার অধীন কিনা। যিনি একবার রাজসিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছেন, তিনি শক্তি না দেখাইলেই যে তাঁহার শক্তি নাই এমন নহে। এই অবস্থার দিক লক্ষ্য করিয়াই লোক সাধুদিগকে 'মহারাজ' বলে, 'স্বামী' বলে। স্বামী কিনা স্বয়ং আমিই অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছু নাই। (সকলের হাস্য) সাধন পথে শক্তির প্রকাশকে তোমরা শক্তির জাগরণ বল। "জাগরণ"—কিনা "যা গড়ন" বা সৃষ্ট হয়। এখানে শক্তির প্রকাশ সাধক হইতে আলাদা ভাবে হয়; কিন্তু পূর্ণ সিদ্ধিতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহা সাধক হইতে অভিন্ন ভাবেই হয়। কারণ এ বিভূতি বা শক্তিগুলিই বা কি? এগুলি ত তিনিই।

অবতার এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য
২২শে কার্তিক, মঙ্গলবার (ইং ৮।১১।১৯৪৯)।

আজ কিছুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সদালোচনা হইতেছে না। বেলা ১০।।টা হইতে ১২টা পর্যন্ত মা অবশ্য কন্যাপীঠের বারান্দায় থাকেন, রাত্রিতেও ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত মার ঘরে লোকজন বসে, কিন্তু প্রশ্নকর্তার অভাবে কোন আলোচনা হয় না। তাহা ছাড়া মায়ের ভাবটাও কিঞ্চিৎ গম্ভীর। কোন প্রসঙ্গ উঠিলেও মা অতি সংক্ষেপে ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা মাত্র বলেন। ইতিমধ্যে আমি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, শুনা যায় যে ঈশ্বর মানবশরীর ধারণ করিলেও তিনি নাকি ঈশ্বরই থাকেন, আর মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি সমুদায় লাভ করিলেও মানুষই থাকে। মানুষ কখনও নাকি ঈশ্বর হইতে পারে না, এ কথার অর্থ কি ?

মা। ইহাও এক দিকের কথা। কেহ কেহ, যেমন বৈষ্ণবেরা বলেন যে জীব ভগবানের নিত্যদাস। তাঁহাদের মতে জীব কখনও ভগবান্ হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে জীব ত স্বরূপতঃ ভগবান্ই, শুধু আবরণের জন্য তাহাকে জীব বলা হয়। কাজেই এগুলি হইল এক এক দিকের কথা।

আমি। তবে সত্য কি ?

মা। কথা বলিতে গেলেই একটা দিক লইয়া বলিতে হয়। খাঁটি সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, যা আছে তাই।

আমি। অবতার যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া আসেন তখন সাধারণ মনুষ্য হইতে তাহাদের পার্থক্য কি ?

মা। তোমরা কৃষ্ণ বা রামচন্দ্রের কথা ত বলিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র যে সব লীলা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে কি সাধারণ মনুষ্য হইতে আলাদা মনে হয় না ?

আমি। হাঁ, জ্ঞান ও শক্তির দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য তাহাদিগকে আলাদা মনে হয়, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদের কি উপাদানগত পার্থক্যও আছে? অর্থাৎ তাঁহাদের শরীর কি জীবের

মত পাঞ্চভৌতিক শরীর নয়?

মা। এ সব তোমাদের শাস্ত্রেই আছে। অবতারদের শরীর জীবের শরীর হইতে আলাদা।

বর্তমানে জীবের দুর্দশার কারণ আলস্য পরায়ণতা

আজ সকাল বেলা যখন দেশের দুর্দশার সম্বন্ধে কথা হইতেছিল তখন মা কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, আজ কাল লোকের অভাবের আর অন্ত নাই। তাহাছাড়া তাহাদের ধৈর্য এবং সহ্য করিবার শক্তি কম। লোকে বেশী আলস্য পরায়ণ হইয়াছে। ফাঁকি দিতে পারিলে আর কাজ কেহ করিতে চায় না। কোন কাজ হাতে লইয়া তারা সুষ্ঠুভাবে শেষ করিবার ভাব আজকাল আর লোকের মধ্যে দেখা যায় না। অপরকে দিয়া কাজ করাইতে পারিলে নিজে কাজে আর হাত দিতে চায় না। অথচ অপরের উপর কাজের ভার দিয়া উহা সম্পন্ন হইল কিনা তাহা নিজে গিয়া দেখে না। মোট কথা লোকে এখন অলসতার আশ্রয় বেশী নিয়াছে। এরূপ হইলে আর অভাব যাইবে কিরূপে? নিজেই সমস্ত কাজ করিব এবং পূর্ণভাবে করিব—ইহা অবশ্য একটা অহঙ্কারের ভাব, কিন্তু এই অহঙ্কার লইয়াই ত কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এইভাবে সর্ব্ব শক্তি দিয়া কাজ করিতে করিতে এমন সময় আসে যখন কর্তৃত্বাভিমান আপনা আপনি শিথিল হইয়া পড়ে। তখন বিনয় নম্রতার ভাবগুলি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। এই ভাবেই লোকের মধ্যে সত্য প্রকাশের পথ সুগম হয়।

পেছনের টান রাখিয়া ভগবানের নাম করিতে নাই

আজ রাত্রিতে আমরা এক ঘর লোক মায়ের কাছে বসিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কথাবার্তা হইতেছিল না। মা বিছানায় শুইয়াছিলেন। এখানকার একজন প্রফেসার কয়েকটি কমলালেবু এবং মালা আনিয়া মাকে দিলেন। মা কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া পরে উঠিয়া বসিলেন এবং ঐ কমলালেবুগুলি ভাঙ্গিয়া আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময় মা একটি গল্পও বলিলেন। মা বলিলেন, "এক

জায়গায় তিন চারিজন বৈষ্ণব বাস করিত। একদিন তাহারা খাবার তৈয়ার করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় একজন প্রস্তাব করিল যে আহার করিবার পূর্ব্বে একটু ভগবানের নাম করা যাক্। এ কথায় অন্য একজন আপত্তি করিয়া বলিল যে যদি নাম করিতেই হয় তবে আহার করিয়াই উহা করা ভাল। অপর একজন বলিল যে আহার করিলে আলস্য আসে, তখন নাম কীর্তন জমে না, কাজেই যদি কীর্তন করিতেই হয় তবে আহারের পূর্ব্বেই উহা করা ভাল। তখন ঠিক হইল যে কীর্তনের পরে তাহারা আহার করিবে। তাহারা কীর্তন করিতে বসিয়া গেল। কীর্তনও বেশ জমিয়া আসিতেছিল। এদিকে একটি কুকুর রান্নাঘরে ঢুকিয়া তাহাদের খাবার খাইতে আরম্ভ করিল। এদিকে যখন তাহাদের দৃষ্টি পড়িল তখন কীর্তন ফেলিয়া সকলেই রান্নাঘরের দিকে ছুটিল। ফলে এই হইল যে তাহাদের না হইল কীর্তন, না হইল খাওয়া দাওয়া। তাই কমলালেবুগুলি এখনই তোমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলাম। (সকলের হাস্য)। বলা হয় যে ভগবানের নাম করিতে হইলে পেছনের কোন টান রাখিয়া যাইতে হয় না, কারণ পেছনে যদি কোন কাজের তাগাদা থাকে তবে নামে মন বসে না এবং উহাতে কোন আনন্দও পাওয়া যায় না।

যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা
৪ঠা অগ্রহায়ণ রবিবার (ইং ২০।১১।১৯৪৯)।

এখন শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ চলিতেছে। ডাক্তারের ব্যবস্থা মত মা উঠা নামা করেন না। কন্যাপীঠের নীচের ঘরেই প্রায় সর্ব্বদা থাকেন। কখনও কখনও চত্বরের উপর সামান্য পা'চারি করেন। মাকে খুব শীর্ণ দেখাইতেছে। আগামী পৌষ সংক্রান্ত দিন এই তিন বৎসর ব্যাপী যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইবে। তদুপলক্ষে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইবার কথা সেই সম্বন্ধেই আজকাল মায়ের সম্মুখে আলাপ আলোচনা হয়। আজ পর্য্যন্ত অষ্ট সহস্রাধিক ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গিয়াছে। বানরাদিগকেও একদিন ভোগ দেওয়ার কথা হইতেছে। একদিন সকালবেলা আমরা কন্যাপীঠের নীচের বারান্দায়

বসিয়া আছি এমন সময় একটি বানর চুপে চুপে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুই তিনজন লোক উহাদের তাড়া দিলে মা বলিলেন, "বেচারারা খাইতে আসিলেই তোমরা উহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও। এক কাজ করা যাক্ একদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য যে আয়োজন করিবে উহার সহিত কিছু বেশী করিয়া রান্না করিয়া দিও এবং তাহা দিয়াই বানরদিগকে খাওয়াইয়া দিও।" খুকুনীদিদি ঐ সময় আসিলে মা তাঁহাকেও ঐ কথা বলিয়া বলিলেন, "বানরদের যেদিন খাইতে দিবে তাহার পূর্ব্বের দিন রাত্রিতে মহাবীরকে মনে মনে নিমন্ত্রণ জানাইবে। পরদিন কন্যাপীঠের ছাদের উপরে ১১টি পাত্রে খাবার এবং গ্লাসে করিয়া জল দিবে। দেখা যাক্ ইহারা খাবার গ্রহণ করে কিনা প্রথমতঃ ১১টি পাত্রে খাবার সাজাইয়া দিবে পরে দরকার হইলে আরও দেওয়া যাইবে।"

আমি। এগারোটি পাত্রে খাবার দিতে বলিলে কেন?

মা। খেয়াল হইল তা'ই বলিলাম। (একটু পরে) তোমরা একাদশ রুদ্র বল না? মহাবীরের জন্ম যে রুদ্রাংশে তাহাও ত বলা হয়। সেইজন্য ১১টি পাত্রে খাবার দিতে বলিয়াছিলাম।

বানরভোজন ছাড়াও গঙ্গাপূজা, গো মাতার পূজা, কুকুর এবং বায়স সেবার কথাও হইয়াছে। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং কালভৈরবের ভোগের কথাও হইতেছে।

যজ্ঞাগ্নির বিশেষত্ব

যজ্ঞ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে মায়ের সমস্ত ভক্তগণকে উপস্থিত থাকার জন্য মৌখিকভাবে এ যাবৎ বলা হইয়াছে। এখন পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। সংস্কৃত, হিন্দী এবং বাংলায় এই নিমন্ত্রণ পত্র ছাপান হইবে। এই পত্রগুলি রচনার ভার যথাক্রমে বাটু দাদা, পটল দাদা, এবং আমার উপর দেওয়া হইয়াছে। গতকল্য এই সকল পত্রের খসড়া মায়ের সম্মুখে পাঠ হইয়াছে। খুকুনীদিদি তখন বলিয়াছিলেন, যে যজ্ঞাগ্নি যে আজ ২৫ বৎসর যাবৎ রক্ষিত হইতেছে তাহা পত্রে উল্লেখ থাকা দরকার। তদনুসারে নিমন্ত্রণ পত্রখানা কিছু পরিবর্তিত

করিয়া আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা তখন আহার করিয়া উঠিয়াছেন। আশ্রমের আঙ্গিনাতে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খুকুনীদিদি আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেলেন। আমি পরিবর্তিত পত্রখানা দিদিকে দিলাম। এমন সময় মা নিজ হইতেই যজ্ঞাগ্নির কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, "লোকে এরূপ প্রশ্ন ও করিয়াছে যে, যে অগ্নি কালীপূজার হোমের জন্য হইয়াছিল উহা দ্বারা আবার সাবিত্রীযজ্ঞ হয় কিরূপে? কারণ প্রত্যেক দেবতার অগ্নিই ত ভিন্ন ভিন্ন। কালীপূজার অগ্নিতে সাবিত্রীযজ্ঞ হইতেছে ইহারও কারণ আছে। সকল সময় ত সকল কথা প্রকাশ হয় না। এক সময় এই অগ্নিরই এমন কিছু প্রকাশ হইয়াছিল যাহার জন্য ইহা দ্বারা সমস্ত দেবতারই পূজা হইতে পারে। কেবল সাবিত্রীযজ্ঞ কেন? বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, যে কোন যজ্ঞ এই অগ্নি দ্বারা হইতে পারে।"

মীরার মৃত্যু

৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার (ইং ২৫'১১।১৯৪৯)

আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কয়েকদিন আশ্রমে যাইতে পারি নাই। ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের একটি মেয়ে (মীরা) তিন দিন পূর্ব্বে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। গত পূজার সময় সে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেরাদুন, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া কাশীতে আসে এবং আসিয়াই বেরীবেরী রোগে অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই রোগের আক্রমণ বৃন্দাবনেই হইয়াছিল। কাশীতে আসিয়া উহার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই পীড়ার ফলে তাহার হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং শ্বাসকষ্টে সে ৪।৫ দিন খুব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর কোলে শান্তি লাভ করে। ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীমা অসুস্থ শরীর লইয়া আসিয়াছেন। এই অসুস্থ শরীর লইয়াই একদিন গভীর রাত্রে মা মনোমোহনের বাসায় গিয়া মীরাকে দেখিয়া আসেন। শেষের ক'দিন মা প্রত্যহই প্রাতে খুকুনীদিদিকে দিয়া মীরার জন্য প্রসাদ পাঠাইয়াছেন এবং দেহত্যাগের সময় মা মীরার কাছে উপস্থিত ছিলেন! মেয়েটি যে

বিশেষ ভাগ্যবতী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেহান্ত হইলে শবদেহটি খুকুনীদিদি নিজে এবং আশ্রমের দুইজন ব্রহ্মচারী নৌকায় তুলিয়া দেন। পরে মণিকর্ণিকায় নিয়া উহা দাহ করা হয়। মেয়েটির শোকাতুর মাতা এবং অন্যান্য ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে মা নিজে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে লইয়া যান এবং আশ্রমেই তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রীশ্রীমায়ের যে অনন্ত কৃপা তাহা বিপদে না পড়িলে অনুভব করা যায় না। মীরার মৃত্যু আশ্রমের উৎসবের উপর যেন একটি বিষাদ রেখা টানিয়া দিয়াছে।

গীতা জয়ন্তী

গতকল্য হইতে গীতাজয়ন্তী আরম্ভ হইয়াছে। আজ বিকালে আশ্রমের হলঘরে গিয়া দেখিলাম গোপালদাদা গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমাও সেখানে বসিয়া আছেন। হলঘরটি লোকে প্রায় পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীও আছেন। রাত্রি প্রায় ৬।।টা পর্যন্ত গীতা ব্যাখ্যা চলিল। মা অসুস্থ শরীর লইয়া সমস্ত সময়ই এখানে বসিয়া রহিলেন। গোপালদাদার বক্তৃতা শেষ হইলে মা উপরে আসিয়া শয়ন ঘরে চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমা'র শয়ন ঘরেরও পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তিনি কন্যাপীঠ ছাড়িয়া বাসন্তীপূজার মন্দিরে স্থান নিয়াছেন। দীর্ঘদিন একঘরে বা একস্থানে থাকা মা'র স্বভাব বিরুদ্ধ। কাজেই মা যে একটি ভাল প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গৃহে স্থান নিয়াছেন ইহাতে কেহ বিস্মিত হয় নাই। মা'র কাছে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া শেষে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার (ইং ৬।১২।১৯৪৯)

গীতাজয়ন্তী আজ শেষ হইয়াছে। গোপালদাদা প্রথম তিনদিন গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। গীতাজয়ন্তীর শেষ দিন তিনি মাত্র পূজা এবং হোম করিতে পারিয়াছিলেন। বাকী কয়দিন তাঁহার শিষ্যরাই গীতাপাঠ করিয়াছেন। গীতাব্যাখ্যা বাটুদাদা করিয়াছেন। মায়ের শরীর পূর্ববৎ চলিতেছে।

ইতিমধ্যে মা বাসন্তীমন্দির ছাড়িয়া দোতালায় গিয়াছেন। এখন অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর স্মৃতি মন্দিরে বসিয়া মা কথাবার্তা বলেন এবং নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করেন।

উৎসবে হরিবাবার আগমন

২৪শে অগ্রহায়ণ, শনিবার (ইং ১০।১২।১৯৪৯)

আজ বেলা ১২।টার সময় হরিবাবা, স্বামী অখণ্ডানন্দ, সুন্দরলাল পণ্ডিত প্রভৃতি সাধুগণ বৃন্দাবন হইতে আশ্রমে আসিয়াছেন। যজ্ঞসমাপ্তি পর্যন্ত তাহারাও এখানে থাকিবেন। হরিবাবার আগমন উপলক্ষে আশ্রমখানিকে পতাকা দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। আশ্রমের দ্বারদেশে কদলীবৃক্ষ এবং মঙ্গলঘট স্থাপন করা হইয়াছে। আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ পতাকা হাতে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে হরিবাবা প্রভৃতিকে সদর রাস্তা হইতে আশ্রমে নিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমের দ্বারে শ্রীশ্রীমা, খুকুনীদিদি প্রভৃতি ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। হরিবাবা মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে মাও হরিবাবার হাতের উপর মস্তক ন্যস্ত করিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মচারিণীগণ দোতালা হইতে সকলের মস্তকে পুষ্প ও খই বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিবাবা প্রভৃতিকে হলঘরে আনিয়া বিশিষ্ট আসনে বসানো হইল। বাটুদাদা স্বস্তিবাচন পাঠ করিলেন। নেপালদাদা (নারায়ণানন্দ স্বামী) মালা ও চন্দন দ্বারা হরিবাবা প্রভৃতিকে বিভূষিত করিয়া ধূপ দ্বারা আরতি করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমতই যে এইভাবে হরিবাবাকে অভ্যর্থনা করা হইল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধুসন্তদিগকে কি ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই মা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হলঘরে কিছুক্ষণ কীর্তন হইলে মা সকলকে স্নানাহার করাইবার জন্য আদেশ দিলেন। তদনুসারে সাধুদিগকে তাঁহাদের নির্ধারিত গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর হরিবাবা কীর্তন করিলেন। মা অসুস্থ শরীর লইয়াই কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তনান্তে হরিবাবার সঙ্গে মা'র কিছুক্ষণ

কথাবার্তা হইল। শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার জন্য হরিবাবা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের পাপের জন্যই যে মা নানা ব্যাধিতে ভুগিতেছেন হরিবাবা এইরূপ বলিলেন এবং যাহাতে মা শীঘ্র ভাল হইয়া উঠেন—এই প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীশ্রীমা হাসিমুখে এই সব কথা শুনিতে ছিলেন। তিনি হরিবাবাকে বলিলেন, "পিতাজী, এ ব্যাধিও ত তাঁহারই একরূপ; ইহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি"? হরিবাবা যখন বলিলেন, "মাতাজী, এ ব্যাধি আমাদিগকে দিয়া আপনি সুস্থ হউন"। তখন মা বাধা দিয়া বলিলেন, "পিতাজী, এমন কথা বলিতে নাই।" হরিবাবার ভক্ত মনোহর হরিবাবার নির্দেশমত বার বার প্রণাম করিয়া মাকে সুস্থ হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে উঠিয়া গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২৯শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫।১২।১৯৪৯)

আজ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সকাল বেলা ৯।।টা হইতে ১১।।টা পর্যন্ত এবং বিকালে ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা চলিবে। এইভাবে ১৫ দিনে ভাগবত খানি শেষ করিবেন। কথা ছিল শুধু ভাগবত ব্যাখ্যাই হইবে, পাঠ হইবে না। কিন্তু কেহ ইহাতে আপত্তি করাতে পাঠ এবং ব্যাখ্যা উভয়েরই ব্যবস্থা হইয়াছে। বাটুদাদা পাঠ করিবেন এবং অখণ্ডানন্দজী ব্যাখ্যা করিবেন। এতদুদ্দেশে দুই স্থানে দুইটি আসন পাতা হইয়াছে এবং উহাদিগকে বিচিত্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হইয়াছে। কাহারও কথায় কোন শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে যাহাতে উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় সে দিকে শ্রীশ্রীমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আশ্রমেও এখন লোক সমাগম বেশ হইয়াছে। দেরাদুন হইতে শ্রীযুক্তা সেবা ও লক্ষ্মী আসিয়াছেন। কলিকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া আশ্রমে সমবেত হইতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর অসুস্থ চলিতেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মা পাঠ এবং কীর্তনে যোগ দিতেছেন।

৫ই পৌষ, মঙ্গলবার, (ইং ২০।১২।১৯৪৯)।

ভাগবত ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। নীচের হলঘরে পাঠের সময় তিলার্ধ ধারণেরও স্থান থাকে না। আশ্রমের লোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। সোলন হইতে রাজাসাহেব আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয় স্বজনও প্রায় ২৫।৩০ জন হইবেন। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত পাঠ কীর্তন ইত্যাদি অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে। সন্ধ্যার পর হরিবাবার কীর্তন হয়। বাঙ্গালীরা হরিবাবার কীর্তন যে খুব পছন্দ করেন তাহা মনে হয় না, তবুও শ্রীশ্রীমা কীর্তনে উপস্থিত থাকেন বলিয়া বাঙ্গালী ভক্তরা শান্তভাবে ঐ কীর্তন শ্রবণ করেন এবং কেহ কেহ উহাতে যোগও দেন। কীর্তনের পর হরিবাবা কিছুক্ষণ পাঠ করেন। আজও তাহা হইল। পাঠের সময় হরিবাবা মাকে বলিলেন, "মনোহর আজ কীর্তনের পূর্ব্বে আমাকে শীঘ্র শীঘ্র কীর্তন শেষ করিতে বলিয়াছিল, কারণ এখানকার লোক নাকি এ কীর্তন পছন্দ করে না।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "তাই নাকি? এ কথা ত আমার কানে আসে নাই। এই সময় হরিবাবা দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন সম্বন্ধে কি একটা গল্প বলিলেন, উহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় যখন মা'র কাছে গেলাম, মা তখন ঐ কথাই তুলিলেন। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি কাণ্ড! মনোহর নাকি হরিবাবাকে বলিয়াছেন যে এখানকার লোক তাঁহার কীর্তন পছন্দ করে না আর হরিবাবাও ভীমসেন এবং গাধার গল্প বলিলেন, (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি ত তখন উপস্থিত ছিলে?"

আমি। হাঁ, কিন্তু আমি হরিবাবার কথা বুঝিতে পারি নাই।

মা। গল্পটা ছিল এই—ভীমসেন নাকি ভাল গান করিতে পারিতেন না। কর্কশ স্বরের জন্য তাহার গান কেহই পছন্দ করিত না। এইজন্য একদিন তিনি এক জঙ্গলে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। দৈবক্রমে সেইদিন এক ধোপার গাধা হারাইয়া গিয়াছিল। ধোপা নানাস্থানে গাধা খুঁজিতে খুঁজিতে যে জঙ্গলে গিয়া ভীমসেন গান আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই জঙ্গলের নিকটে আসিল; সেখানে আসিয়া

ভীমসেনের গান শুনিয়াই মনে করিল যে তাহার গাধাটি বুঝি ডাকিতেছে। কাজেই সে শব্দ ধরিয়া ভীমসেনের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ভীমসেন তাহাকে দেখিয়া এবং সে ভীমসেনকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ভীমসেন তাহাকে এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ভয়ে আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু ভীমসেনও তাহাকে ছাড়িবেন না। তখন সে বলিল যে যদি ভীমসেন তাহাকে অভয় দেন তবেই সে সত্য কথা বলিতে পারে। ভীমসেন তাহাকে অভয় দিলেন। তখন ধোপা বলিতে লাগিল, "আমার গাধাটাকে আজ সকালবেলা হইতেই দেখিতে পাইতেছি না। তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই জঙ্গলের কাছে আসিয়া আপনার গানের শব্দ শুনিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম যে ঐ বুঝি আমার গাধা ডাকিতেছে। তাই ঐ শব্দ ধরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। (সকলের হাস্য)।

ভীমসেন ধোপাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি তখনই শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ভীমসেনের কণ্ঠস্বর এরূপ করিয়া দিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—"তুমি যখন গান কর, উহা শুনিতে তোমার কেমন লাগে?" ভীমসেন বলিলেন, "আমার ত ভালই লাগে।" শ্রীকৃষ্ণ অমনি বলিলেন, "আমারও যে ভাল লাগে, সেইজন্যই ত তোমার গলার স্বর ঐরূপ করিয়াছি। (সকলের হাস্য)।

খুকুনী দিদি। হরিবাবা ভাল গল্পই করিয়াছেন। তাঁহার গান তাঁহার ভাল লাগে আর মা'র ভাল লাগে। কাজেই আর কথা কি? (সকলের হাস্য)।

হোতাদের ব্যাধি গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীমা দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা

যজ্ঞ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে মা সকল ভক্তকেই কাশী আসিতে চিঠি লিখিয়া দিতে বলিতেছেন। এইভাবে সকলকে ডাকা-মা'র পক্ষে নূতন বলিয়াই মনে হইতেছে। এদিকে মা'র শরীরও খারাপ চলিতেছে। ইহাতে আমাদের মনে সন্দেহ এবং আশঙ্কা দুই-ই জাগিয়াছে। রাত্রিতে

মাকে একা পাইয়া আমি মাকে বলিলাম, "মা, সকলকে এইভাবে চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া আনিতেছ কেন? পূর্ব্বে ত এরূপ করিতে দেখি নাই।"

মা। সকলকে যে চিঠি লিখিয়া যজ্ঞের কথা জানান হইতেছে তাহার কারণ এই যে এইভাবে না জানাইলে অনেকেই অনুযোগ দেয় যে তাহারা সংবাদ পাইল না। সংবাদ পাইলে তাহারা যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে পারিত।

আমি। শুনিয়াছি যে তুমি নাকি বলিয়াছ যে যজ্ঞ রক্ষার জন্যই তোমার দেহ অস্বাস্থ্য চলিতেছে।

মা। এমন কথা ত আমি বলি নাই।

আমি। শুনিয়াছি যে যাহাতে ব্রহ্মচারীরা সুস্থ শরীরে যজ্ঞ শেষ করিতে পারে সেইজন্যই তোমার শরীর খারাপ চলিতেছে।

মা। (হাসিয়া) আমি বলিয়াছিলাম যে এ শরীরটা একটু উলটপালট হইলেই যদি ইহারা ভালভাবে যজ্ঞ শেষ করিতে পারে তবে ইহাই বা মন্দ কি?

আমি। তবে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা ত সত্যই। ভালভাবে যাহাতে সকলে যজ্ঞ শেষ করিতে পারে সেইজন্যই তুমি ইহাদের ভোগ ভুগিতেছ।

মা হাসিতে লাগিলেন পরে বলিলেন, "দেখ মজাও এমন যে সময় আমি সকলে ভাল থাকুক এই কথা বলিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ই খুকুনীর ঘাড়ের উপর আসিয়া দুইটি ঘোড়া পড়ে। খুকুনী শহরে কোন কাজে গিয়াছিল এবং সেইখানেই এই বিপদ ঘটে। কিন্তু সকলে ভাল থাকুক এই কথা তখন আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া ওর কোন ক্ষতি হয় নাই।

খুকুনী দিদি। বাস্তবিক সে যে কি অবস্থা। একে ত আমি রাস্তার ড্রেনের ধারে, এমন সময় দুইটি ঘোড়া আমার দিকে ছুটিয়া আসে; কিন্তু আমার কাছে আসিয়াই উহারা আশ্চর্যজনক ভাবে থামিয়া যায়। আর একটু হইলেই আমি উহাদের পায়ের নীচে শেষ হইয়া যাইতাম।

মা। এই ঘটনার পর খুকুনী যখন আমার কাছে আসিয়া বসিল,

আমি দেখি যে উহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার (ইং ২২।১২।১৯৪৯)।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত সরযূ কীর্তনীয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ সন্ধ্যার পর কীর্তন করিবেন এই সংবাদ বিকালে পাঠের পর প্রচার করা হইল। রাত্রি ৭।।টার সময় তাঁহার কীর্তন আরম্ভ হইল। গায়ক মাত্র তিনি একা, সঙ্গে কোন দোহার নাই। তাঁহার বাম হাতের অঙ্গুলীতে তিনি ছোট ছোট দুইটি করতাল সংযুক্ত করিয়া নিয়াছেন। টুনটুন করিয়া ঐ করতাল বাজাইয়া তিনি সঙ্গীত করেন। সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম বাজানো হয়। তিনি তাহার কীর্তনের বিশেষত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, "কীর্তন বলিতে আমরা সাধারণতঃ নাম কীর্তনই বুঝি; কিন্তু নামকীর্তন ভিন্ন অন্য জাতীয় কীর্তন হইতে পারে। ভগবানের নাম, গুণ ও কীর্তি প্রচার করাও এক জাতীয় কীর্তন এবং ইহাকে নারদীয় কীর্তন বলে। আমি আজ এই নারদীয় কীর্তন করিব।"

তিনি যে কীর্তন করিলেন উহা আমাদের কথকতার অনুরূপ; তবে ইহা গাম্ভীর্যে এবং রস মাধুর্যে আমাদের বাংলাদেশের কথকতা হইতে অনেক নিকৃষ্ট। তাহাছাড়া এই কীর্তন কোনও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়াও সব সময় হয় না। তিনি যে একটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া এই লীলাকীর্তন করিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই ঃ—

গোদাবরী তীরে পৈঠন ক্ষেত্রে একনাথ মহারাজের আশ্রম। আশ্রমে বড় জলের কষ্ট, কারণ উহা গোদাবরী নদী হইতে কতকটা দূর। একনাথ মহারাজ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। সেবক-সেবিকা তাঁহার কিছুই নাই, কাজেই অতি কষ্টে তিনি নিজেই তাঁহার জল সংগ্রহ করিতেন। ভক্তের কষ্ট দেখিয়া ভগবান্ ভৃত্যরূপে একনাথের জল আনয়ন করিবার মনস্থ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি এক গুজরাটী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া পৈঠন ক্ষেত্রের দিকে রওনা হইলেন। লক্ষ্মীদেবী ভগবান্ নারায়ণকে মলিন ব্রাহ্মণের বেশে কোথাও যাইতে দেখিয়া তাঁহার বেশ ধারণের কারণ এবং গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন

করিলে ভগবান্ বলিলেন যে তিনি তাঁহার পরমভক্ত একনাথের জল কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ভৃত্যবেশে তাহার জল আনয়ন করিবেন বলিয়া এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "ভগবান্ আপনি দৈত্য-দানব বধ করিয়া দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এখন আপনি ভৃত্যের কাজে নিজেকে নিয়োগ করিলে সকলে যে আপনাকে হেয় তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।" "দেবি, ভক্তকে রক্ষার জন্য আমি পশুরূপও ধারণ করিয়াছি। রাজসূয় যজ্ঞে ভক্ত পাণ্ডবের জন্য আমি ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালন করিয়াছি। ভক্তের জন্য আমি সব কিছুই করিতে প্রস্তুত।"

এই কথা বলিয়া ভগবান্ পৈঠনক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। পৈঠনক্ষেত্রে স্থানীয় লোকেরা হঠাৎ এক বিদেশীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পরিচয় এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণবেশী ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন যে তিনি গুজরাটী ব্রাহ্মণ। একনাথ মহারাজের ভৃত্যের কাজ করিবে বলিয়াই এখানে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া লোকদের মধ্যে একজন বলিল, যদি ভৃত্যের কাজই করিতে আসিয়া থাক তবে একনাথ মহারাজ কেন? আমাদেরও ত ভৃত্যের প্রয়োজন আছে। তুমি আমাদের নিকট ভৃত্য হিসাবে থাকিতে পার। আচ্ছা, তোমার নাম কি?

ভগবান্। আমার নামের কোন ঠিকানা নাই। লোকের যে নাম ইচ্ছা আমাকে সেই নামেই ডাকিয়া থাকে! আর, তোমাদের কাছে আমার কাজ করা চলিবে না, কারণ আমার আহার বড় বেশী।

লোকটি। বেশ ত তোমাকে পেট ভরিয়াই আহার দিব।

ভগবান্। আমি পেট ভরিয়া আহার করি না। আমি মন ভরিয়া আহার করি।

লোকটি। বেশ ত তোমাকে মন ভরিয়াই আহার দিব। আর তোমার কি চাই?

ভগবান্। আমার শয্যাও যাহা তাহা হইলে চলিবে না। আমার শয্যাও 'শেষ' হওয়া চাই।

লোকটি। আর কি চাই।

ভগবান্। আমার পদ সেবার জন্য একজন দাসী চাই।

লোকটি। (আশ্চর্য হইয়া) ভৃত্যের জন্য আবার ভৃত্য রাখিয়া দিতে হইবে নাকি?

ভগবান্। হাঁ, তাহা না হইলে চলিবে না।

লোকটি। তোমার মাহিনা কত?

ভগবান্। মাহিনা আমার এক লক্ষ (লক্ষ্য)। উহার কম হইলে চলিবে না।

লোকটি। তুমি কি কি কাজ করিবে?

ভগবান্। কাজ? যেখানে সাংসারিক কাজকর্ম সেখানে আমি নাই।

লোকটি। তোমাকে মাহিনা দিতে হইবে একলক্ষ টাকা উহার কম হইলে চলিবে না অথচ কাজকর্মের মধ্যে তুমি নাই। এরূপ ভৃত্য দিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। তুমি একনাথ মহারাজের নিকটেই যাও।

ভগবান্ একনাথ মহারাজের নিকট গিয়া নিজকে গুজরাটী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ঐ আশ্রমে ভৃত্যের কাজ করিতে লাগিলেন। দূর গোদাবরী হইতে জল বহিয়া আনিতেন, একনাথ মহারাজের জপ, পূজা ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন চলিল। ইহার পর একনাথ মহারাজের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষ্যে তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এদিকে আশ্রমে শ্রাদ্ধের যোগাড় হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার প্রস্তুত হইতেছে। এমন সময় রান্নাঘরের পেছন দিয়া কয়েকজন চামার যাইতেছিল। তাহারা লুচি, মিষ্টান্নের সুগন্ধ পাইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা ব্রাহ্মণেরাই ভাগ্যবান, তাহারা এই সুখাদ্য পেট ভরিয়া খাইবে।" একনাথ মহারাজ উহাদের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজন লইয়া এস। তোমাদিগকে এখনই এই সব জিনিষ

দিয়া পেট ভরিয়া ভোজন করাইব।” তাহারা বলিল, “মহারাজ, তাহা হয় কেমন করিয়া? আপনি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য এ সব তৈয়ার করিয়াছেন; ব্রাহ্মণভোজন না হইলে আমরা প্রসাদ পাই কিরূপে? একনাথ বলিলেন, “আমার নারায়ণ সর্বভূতেই আছেন। তোমাদের সেবাও ব্রাহ্মণ সেবার তুল্য। তাহাছাড়া এসব খাদ্যের উপর যখন তোমাদের লোভ হইয়াছে; তখন এগুলি উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ সেবা চলিবে না। তোমরা আহার করিলে ব্রাহ্মণদিগকে পুনরায় আবার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। কাজেই তোমরা এখনই চলিয়া এস। ইহা শুনিয়া চামারেরা দল বাঁধিয়া আসিয়া মহানন্দে ভোজন করিয়া গেল।

এদিকে যখন ব্রাহ্মণেরা এই কথা শুনিতে পাইলেন তখন তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন যে কেহই একনাথের আশ্রমে শ্রাদ্ধে আহার করিতে যাইবে না, কারণ তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া চামারদিগকেই প্রথমে ভোজন করাইয়া দিয়াছেন। যদি কেহ ঐখানে যায় তবে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে এবং যাহাতে কেহ ঐখানে না যাইতে পারে সেজন্য তাঁহারা আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। একনাথ মহারাজ যখন ব্রাহ্মণদের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাইলেন তখন তিনি শ্রাদ্ধ পণ্ড হইল বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ বিলাপ করিতে শুনিয়া ভৃত্যবেশী নারায়ণ আসিয়া তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একনাথ মহারাজ বলিলেন “সর্বভূতে নারায়ণ আছেন মনে করিয়া আমি চামারদিগকে প্রথমে ভোজন করাইয়াছি। এইজন্য ব্রাহ্মণেরা আমার আশ্রমে আসিয়া শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন না বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। বেলাও দ্বিপ্রহর হইয়া গেল, এখনও কেহ এখানে আসিলেন না। আমার সমস্ত পণ্ড হইল।” ভগবান বলিলেন, “মহারাজ, আপনি চিন্তা করিবেন না। যে সব ব্রাহ্মণ এখানে আসিবেন না বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন আমি তাহাদের পিতা পিতামহ দ্বারা এই শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করাইব।” এই বলিয়া ভগবান্ যমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যমরাজ ভগবানকে হঠাৎ সচকিতে

দেখিয়া নিজের দোষত্রুটি আশঙ্কা করিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন বদনে তাঁহাকে অভয় দিয়া পৈঠনক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদের পিতৃপিতামহদিগকে নরক হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "পৈঠনক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা দলবদ্ধ হইয়া একনাথ মহারাজের আশ্রমে শ্রাদ্ধ এবং ভোজন করিবেন না বলিয়া মনস্থ করায় আমি তাহাদেরই পিতা এবং পিতামহ দ্বারা এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। কাজেই অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে এখানে আনিয়া উপস্থিত কর।" যমরাজ তৎক্ষণাৎ ঐ ব্রাহ্মণদিগকে নরক হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন, ভগবান তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পৈঠনক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইলেন। ভগবানের নির্দেশমত ব্রাহ্মণগণ তখন শ্রাদ্ধ কাজে লাগিয়া গেলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ আশ্রমের চতুর্দিকে ঘুরিয়া পাহারা দিতে ছিলেন তাহারা হঠাৎ আশ্রমের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র উচ্চারিত হইতে শুনিয়া কাহারা এই শ্রাদ্ধ করিতেছে তাহা দেখিতে আসিয়া নিজেদের মৃত পিতা এবং পিতামহদিগকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। তখন তাহাদের এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইল যে একনাথ মহারাজ সাক্ষাৎ ভগবান বই আর কেহ নহেন। ভগবান্ এইরূপে ভক্তের মহিমা প্রচার করিলেন। একনাথ মহারাজ তখন পর্যন্ত চিনিতে পারেন নাই যে তাঁহার ভৃত্যটি কে? ভক্তের সেবার জন্য ভগবানই যে ভৃত্যরূপে আছেন তাহাও ভগবান্ প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

এক ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার মানসে দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলে সেখানকার সকলেই তাঁহাকে বলিয়া দিল যে ভগবান্ এখন পৈঠনক্ষেত্রে একনাথ মহারাজের ভৃত্যের কাজ করিতেছেন। কাজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে গোদাবরী তীরে একনাথ মহারাজের আশ্রমে তাঁহাকে যাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারকা হইতে একনাথ মহারাজের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে যে ভগবান্ থাকেন তিনি কোথায়?" একনাথ মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হইয়া

বলিলেন, "এখানে ভগবান্ থাকেন!" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আপনার ভৃত্যই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্। তিনি আপনার সেবার জন্য এখানে আছেন—এ কথা আমি দ্বারকা হইতে শুনিয়া আসিয়াছি। আপনার ভৃত্যটি কোথায়?" একনাথ মহারাজ তখন গুজরাটী ব্রাহ্মণকে ডাকিলেন। ভৃত্যবেশী ভগবান্ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তিনি ভৃত্যের বেশ ছাড়িয়া যাহাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারীরূপে নিজকে প্রকট করেন সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাই করিলে একনাথ মহারাজ ভগবানের চরণে পড়িয়া সাশ্রুনেত্রে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি মোহবশে ভগবান্‌কে চিনিতে না পারিয়াই যে তাঁহার সেবা গ্রহণরূপ অপরাধ করিয়াছেন—ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে ভগবান বলিলেন যে তিনি ভক্তের জন্যই সব কিছুই করিতে সদা প্রস্তুত। ইহাতে একনাথ মহারাজের কোন অপরাধ হয় নাই। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

আজিকার কথকতার গল্পাংশটি উক্ত রূপ। ইহার মাঝে মাঝে ভজনগান করিয়া কীর্তনীয়া তাহার 'নারদীয়' লীলার কীর্তন শেষ করিলেন।

রাত্রি ৯।।টার সময় মা'র সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তখন মায়ের ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ গুজব রটিয়া গিয়াছিল আনন্দময়ী মারা গিয়াছে।" এ গুজবের কথা আমরাও শুনিয়াছিলাম। সেইজন্য দলে দলে স্ত্রীলোক আশ্রমে আসিয়াছে। এই সব স্ত্রীলোকদিগকে আর কখনও দেখি নাই। পোষ্টাফিসের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বসু বলিলেন যে, রাস্তায় আসিবার সময় একদল স্ত্রীলোকও তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে এবং যখন তাহারা শুনিল যে ঐ গুজব সর্বৈব মিথ্যা তখন তাহারা যেন নিরাশ হইয়া রাস্তা হইতেই বাড়ী ফিরিয়া গেল! রাত্রি ১০টা বাজিলে মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য আমরা প্রণাম করিয়া ঘর হইতে

বাহিরে আসিলাম। খুকুনী দিদি আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিদি আমাকে মা'র ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র মা আমাকে একখানা গরদের কাপড় দিয়া বলিলেন, "এই যজ্ঞের আশীর্ব্বাদ লও।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদী বস্ত্রখানা পরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন বার বার পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেছি।

১৫ই পৌষ শুক্রবার (ইং ৩০।১২।১৯৪৯)

আজ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইল। আগামী কল্য হইতে নূতন করিয়া কার্যসূচী আরম্ভ হইবে। সকাল বেলা ৯টা হইতে গোপাল দাদা গীতা ব্যাখ্যা করিবেন। তাহার পর সরযূ কীর্তনীয়া তাঁহার লীলা কীর্তন করিবেন। বিকাল বেলা অবধূতজী প্রভৃতি ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবতের কোন কোন অংশ বিশদভাবে আলোচনা করিবেন।

মটরী পিসীমার মৃত্যু

আজ কয়েকদিন যাবৎ মটরী পিসীমা (বাবা ভোলানাথের ভগ্নী) খুব অসুস্থ। তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ চলিতেছে। দুই একদিন টিকিয়া থাকিবেন কিনা সন্দেহ। বিকাল বেলা তাঁহাকে চত্বরে আনিয়া শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। কখনও তাঁহার নাড়ী ডুবিয়া যাইতেছিল আবার কখনও তিড়্ তিড়্ করিয়া একটু চলিতেছিল। মা দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাঁহাকে দেখিলেন। নিজের গলার একটি গোলাপ ফুলের মালা পিসীমাকে পরাইয়া দিলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতেছিলাম। মা ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকিলেন। কাছে গেলে বলিলেন, "এ (অর্থাৎ পিসীমা) বলিতেছে ইহার মহাশ্বাস উঠিয়াছে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশ চক্রবর্তী মহাশয় এই সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। মা তাঁহাকে ডাকিয়া রোগিনীকে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি পরীক্ষা করিলে

মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল এ আর কতক্ষণ আছে?" পরেশ বাবু বলিলেন, "মা, তাহা আমি কি জানি? তুমি জান।" গিরীণ দাদার মেয়ে সাবিত্রী (ক্ষমা) কাছে বসিয়া পিসীমাকে নাম শুনাইতেছিল। আজ ৭।৮ মাস যাবৎ সাবিত্রীই পিসীমার সেবা করিয়া আসিতেছে দেখিতেছে। যেভাবে সে সেবা করিতেছে বাস্তবিকই তাহা অসাধারণ। শ্রীশ্রীমা সাবিত্রীর খুব প্রশংসা করিলেন। যতদিন সামর্থ্য ছিল পিসীমাও সকলের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। উহা উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন, "এ (অর্থাৎ পিসীমা) ঐ ভাবে সেবা করিয়াছিল বলিয়া এখন এরূপ সেবা পাইতেছে। এরূপ সেবা অনেক সময় ছেলেমেয়ের কাছেও পাওয়া যায় না।

রাত্রি ৯টার সময় মা আবার পিসীমাকে দেখিতে গেলেন। তখন পিসীমাকে ঘরে আনা হইয়াছে। এই সময় পিসীমার আবার নাড়ী ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি কথা বলিতেছেন। ডাক্তার হেমবাবু পিসীমাকে দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "কী আশ্চর্য! নাড়ী কোন হাতে পাওয়া যাইতেছে না অথচ রোগী কথা বলিতেছে। এরূপ আমি আর দেখি নাই।" শ্রীশ্রীমা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া এ কথাই বলিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আজ রাত্রিতেই বোধহয় পিসীমা শেষ হইয়া যাইবেন। খুকুনী দিদিও বলিলেন, "হয় রাত্রি ১২টায় না হয় শেষ রাত্রিতেই দেহত্যাগ হইবে," ইহা শুনিয়া মা একটু হাসিলেন, আজই পিসীমার ছেলে অমূল্যকে তার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬ই পৌষ শনিবার (ইং ৩১।১২।১৯৪৯)।

আজ অমূল্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সারাদিন পিসীমার অবস্থা খারাপই চলিল। ভোর ৫।।টার সময় পিসীমার দেগত্যাগ হইল। পিসীমার ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার ছেলে তাঁহার মুখাগ্নি করে। অমূল্য আজ আসাতে পিসীমার এ সাধ পূর্ণ হইয়া গেল। অমূল্য আজ কলিকাতা হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে যখন প্রণাম করিয়াছিল তখন মা অমূল্যকে বলিয়াছিলেন, "তোমার জন্যই ইহাকে (অর্থাৎ

পিসীমাকে) এতদিন রাখা হইয়াছে।” বাস্তবিক গতকল্য পিসীমার যে অবস্থা গিয়াছে তাহাতে দৈবশক্তি ভিন্ন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। আর পিসীমার যেভাবে মৃত্যু হইল তাহাও খুব শ্লাঘ্য। স্থান কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাতীরস্থ শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম, কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত। আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ সবেমাত্র আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন সহ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। পিসীমাকে তখন ঘরের বাহির করা হইল; কিন্তু জ্ঞান তখনও আছে। শ্রীশ্রীমা সম্মুখে উপস্থিত। ইহার একটু পরেই তাহার দেহত্যাগ হইল। তখন একখানি নৌকা করিয়া শবদেহ লইয়া আশ্রমস্থ কয়েকজন ভক্ত মণিকর্ণিকার দিকে রওনা হইলেন। শান্ত গঙ্গাবক্ষে শববাহী নৌকাখানি ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রভাতের রক্তিম সূর্য পাদপশীর্ষে এবং মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় গলিত কাঞ্চন ঢালিয়া দিয়াছে। আর এদিকে মায়ের আশ্রমে যজ্ঞোৎসবের সানাই দিকে দিকে প্রভাতী সুরের আলপনা আঁকিয়া চলিয়াছে। কে মনে করিবে যে এইমাত্র আশ্রমস্থ একজন মহাপ্রস্থান পথের যাত্রী হইল।

১৯শে পৌষ, মঙ্গলবার (ইং ৩।১।৫০)

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখার্জী আজ তিনদিন যাবৎ এখানে আসিয়া লীলাকীর্তন করিতেছেন। কলিকাতায় ইহার কীর্তনের সুখ্যাতি আছে, কীর্তনান্তে রাত্রিতে যখন তিনি মা'র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন মা তখন বলিলেন, আমি “খুকুনীকে বলিয়াছিলাম, “রত্নেশ্বর বাবাকে এখানে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলে হয় না?” তাহাতে খুকুনী বলিয়াছিল, “তাঁহাদের চাকুরী আছে, তাঁহারা কি আর এখন আসিতে পারিবে?” পরে দেখি যে বাবাজী আসিয়া উপস্থিত। তুমি বুনী ও খুকুনীকে একথা জিজ্ঞাসা কর।”

রত্নেশ্বর বাবু। মা, আপনি স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আসিতে পারিয়াছি। আমার ত কাশী আসিবার কোন কথাই ছিল না। (এক ভদ্রলোককে দেখাইয়া) ইনি হঠাৎ একেবারে কাশীর টিকিট কিনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন যে আমাকে কাশী যাইতে হইবে। তখন দেখিলাম যে আমার কাশীতে না আসিয়া আর উপায় নাই।

মা। এখানকার লোক ত আর বাংলা কীর্তন শুনিতে পায় না, তাই তাহারা কীর্তন শুনিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অষ্টসখী

আলমোড়া হইতে আটজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। শুনিলাম ইহারা নাকি মায়ের অষ্টসখী। ইহাদের বেশভূষার পারিপাট্য নাই। সহজ সরল ভাব। মা'র জন্য কিছু কিছু জিনিষ ইহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "তোমরা আমার জন্য কি আনিয়াছ তাহা লইয়া এস।" স্ত্রীলোকটি একটি ঝুড়ি হইতে একটি একটি করিয়া থলিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "ইহারা আমার নাম রাখিয়াছে "চিত্ত চোর।" "কয়েকটি থলিয়া হইতে সূতা এবং সিগারেটের কৌটা বাহির হইল। এই কৌটাগুলির মধ্যে ঘি ছিল, সূতাগুলি আর কিছুই না, এগুলি প্রদীপ জ্বালাইবার সলিতা। শুনিতে পাইলাম তাঁহারা লক্ষাধিক সলিতা লইয়া আসিয়াছেন এবং কে কত সলিতা পাকাইয়াছেন তাহাও মাকে বলিতেছিলেন। মা তখনই "নারায়ণানন্দ স্বামী নেপাল (ব্রহ্মচারী) দাদাকে ডাকাইয়া ঐ সলিতা এবং ঘি দিয়া বলিলেন, "যজ্ঞকুণ্ডের চারিধারে এগুলি সাজাইয়া দিও।" স্ত্রীলোকটি অন্য একটি থলিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "ইহাতে তিল আছে। (একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া) এ তিলগাছ বুনিয়া তোমার জন্য তিল করিয়া আনিয়াছেন।" মা এ তিলগুলিও যজ্ঞে ব্যবহার করিবার জন্য নেপালদাদাকে দিয়া দিলেন। অন্য একটি থলিয়া হইতে চাউল বাহির হইল। এ চাউলও ইহারা নিজ হাতে করিয়া আনিয়াছেন। অন্য একটি থলিয়া হইতে চিড়া বাহির হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, "দাও আমি চিড়া খাইব তাহা হইলেই আমার পেট ভাল হইয়া যাইবে। এই বলিয়া মা তাঁহার মুখে দুই চারিটি চিড়া দিতে বলিলেন, পরে মা নিজ হাতে আমাদিগকে চিড়া প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে বলিলেন, "ইহা তোমরা খাও, খাইতে তোমাদের অনেকক্ষণ লাগিবে।" বাস্তবিক দেখিলাম যে ওগুলি নামে মাত্র চিড়া। চাউলের মতই শক্ত। মা এই

সকল পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের নিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। কতখানি প্রাণের টান হইলে মা'র এইসব জিনিস নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া এতদূর হইতে আনা সম্ভব হয়—আমরা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কেহ কেহ এইসব সামগ্রীকে বিদুরের খুদের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। পটলদাদা বলিলেন, "বড় লোকের মহার্ঘ উপঢৌকন হইতে এ জিনিসগুলির মূল্য অনেক বেশী।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বেদপাঠী বিদায়

২০শে পৌষ, বুধবার (ইং ৪।১।৫০)

যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বেদপাঠীদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। মোট ১২৫ জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নীচের হলঘরে ইহারা সমবেত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ কিছুক্ষণ দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ নিয়া সংস্কৃতে বিচার করিলেন। বেদপাঠীগণ কিছুক্ষণ বেদ আবৃত্তি করিলেন। পরে মা সোলনের রাজা সাহেবের হাত দিয়া প্রত্যেককে একটি পিতলের গামলা, ফল, মিষ্টি এবং এক কপি করিয়া 'সদ্‌বাণী' ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পুস্তক (হিন্দী অনুবাদ) ও ৪্ টাকা দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ সকলেই হৃষ্টমনে বিদায় হইলেন। আজ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে যজ্ঞমন্দিরে সব পদ দিয়া ভোগ দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রসাদ পাইলাম। আজ বিকালে কাশী নরেশ মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি অখণ্ডানন্দজীর পাঠেও কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।১।৫০)।

আলমোড়ার অষ্টসখীরা আজ মায়ের পূজা করিলেন। আশ্রমের চত্বরে একখানা আসনে শ্রীশ্রীমায়ের ফটো বসাইয়া উহাকে ইহারা মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। সম্মুখে ভোগের জিনিস পত্র এবং ঘির প্রদীপ জ্বলিতেছে। মেয়েরা আসনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন। কি পুঁথি পাঠ হইতেছে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বেলা ১০টা হইতে

ইহা আরম্ভ হইয়াছে, শুনিতে পাইলাম আগামী কল্য বেলা ১০টার সময় ইহা শেষ হইবে। ইহারা নাকি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এরূপ আলমোড়াতে করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন দেখি ইহারা বাসন্তীপূজা মণ্ডপে মায়ের ফটো লইয়া বসিয়া বসিয়া গান করিতেছেন। ইহাদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রভাব বাস্তবিকই অতুলনীয়।

রাত্রিতে কাশীর কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ মায়ের নিকট গান বাজনা করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি হল ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ এই গান বাজনা শুনিলেন। শ্রীযুক্ত আনোখেলাল তবলা বাজাইলেন। শুনিতে পাইলাম ইনি ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক, ইহার বাজনাও অপূর্ব। যিনি গান করিলেন তাঁহার নাম গঙ্গা প্রসাদ। তিনিও খুব সুন্দর গান করিলেন। এ জাতীয় ওস্তাদী গান আজকাল কমই শুনা যায়। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এইরূপ গান বাজনা চলিল, পরে ইহাদিগকে জলযোগ করাইবার জন্য খুকুনীদিদি ডাকিয়া নিয়া গেলেন।

নামযজ্ঞ

২৩শে পৌষ, শনিবার (ইং ৭।১।৫০)।

দিল্লীর ভক্তদের উৎসাহে আজ রাত্রি ৯টা হইতে নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। চত্বরের উপর চন্দ্রাতপের নীচে মঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে। বিচিত্র রঙের বৈদ্যুতিক আলো দিয়া সমস্ত চত্বরখানি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ শরীর লইয়াই কীর্তনের আসরে আসিয়া বসিলেন। হরিবাবা প্রভৃতি সমস্ত সাধুগণ ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। অভয় অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিল, প্রায় ১।। ঘন্টা ইহা চলিল। তাহার পর মঞ্চ পরিক্রমা করিয়া কীর্তন চলিল—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হয়ে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ," যতক্ষণ শ্রীশ্রীমা ঐখানে উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ ভক্তদের আর উৎসাহের সীমা নাই। সকলেই নৃত্য করিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি ৮।।টা পর্যন্ত চলিলে শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। স্থির হইয়াছে যে রাত্রি ১২।।টা হইতে ৪টা পর্যন্ত মেয়েরা এই কীর্তন

সকল পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের নিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। কতখানি প্রাণের টান হইলে মা'র এইসব জিনিস নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া এতদূর হইতে আনা সম্ভব হয়—আমরা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কেহ কেহ এইসব সামগ্রীকে বিদুরের খুদের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। পটলদাদা বলিলেন, "বড় লোকের মহার্ঘ উপঢৌকন হইতে এ জিনিসগুলির মূল্য অনেক বেশী।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বেদপাঠী বিদায়

২০শে পৌষ, বুধবার (ইং ৪।১।৫০)

যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বেদপাঠীদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। মোট ১২৫ জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নীচের হলঘরে ইহারা সমবেত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ কিছুক্ষণ দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ নিয়া সংস্কৃতে বিচার করিলেন। বেদপাঠীগণ কিছুক্ষণ বেদ আবৃত্তি করিলেন। পরে মা সোলনের রাজা সাহেবের হাত দিয়া প্রত্যেককে একটি পিতলের গামলা, ফল, মিষ্টি এবং এক কপি করিয়া 'সদ্‌বাণী' ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পুস্তক (হিন্দী অনুবাদ) ও ৪ টাকা দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ সকলেই হৃষ্টমনে বিদায় হইলেন। আজ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে যজ্ঞমন্দিরে সব পদ দিয়া ভোগ দেওয়া হইয়াছে। আমরা প্রসাদ পাইলাম। আজ বিকালে কাশী নরেশ মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি অখণ্ডানন্দজীর পাঠেও কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার (ইং ৫।১।৫০)।

আলমোড়ার অষ্টসখীরা আজ মায়ের পূজা করিলেন। আশ্রমের চত্বরে একখানা আসনে শ্রীশ্রীমায়ের ফটো বসাইয়া উহাকে ইহারা মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। সম্মুখে ভোগের জিনিস পত্র এবং ঘির প্রদীপ জ্বলিতেছে। মেয়েরা আসনে বসিয়া পাঠ করিতেছেন। কি পুঁথি পাঠ হইতেছে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বেলা ১০টা হইতে

ইহা আরম্ভ হইয়াছে, শুনিতে পাইলাম আগামী কল্য বেলা ১০টার সময় ইহা শেষ হইবে। ইহারা নাকি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এরূপ আলমোড়াতে করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমে গেলাম তখন দেখি ইহারা বাসন্তীপূজা মণ্ডপে মায়ের ফটো লইয়া বসিয়া বসিয়া গান করিতেছেন। ইহাদের নিষ্ঠা এবং একাগ্রভাব বাস্তবিকই অতুলনীয়।

রাত্রিতে কাশীর কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ মায়ের নিকট গান বাজনা করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি হল ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ এই গান বাজনা শুনিলেন। শ্রীযুক্ত আনোখেলাল তবলা বাজাইলেন। শুনিতে পাইলাম ইনি ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক, ইহার বাজনাও অপূর্ব। যিনি গান করিলেন তাঁহার নাম গঙ্গা প্রসাদ। তিনিও খুব সুন্দর গান করিলেন। এ জাতীয় ওস্তাদী গান আজকাল কমই শুনা যায়। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এইরূপ গান বাজনা চলিল, পরে ইহাদিগকে জলযোগ করাইবার জন্য খুকুনীদিদি ডাকিয়া নিয়া গেলেন।

নামযজ্ঞ

২৩শে পৌষ, শনিবার (ইং ৭।১।৫০)।

দিল্লীর ভক্তদের উৎসাহে আজ রাত্রি ৯টা হইতে নামযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। চত্বরের উপর চন্দ্রাতপের নীচে মঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে। বিচিত্র রঙের বৈদ্যুতিক আলো দিয়া সমস্ত চত্বরখানি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ শরীর লইয়াই কীর্তনের আসরে আসিয়া বসিলেন। হরিবাবা প্রভৃতি সমস্ত সাধুগণ ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। অভয় অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিল, প্রায় ১।। ঘন্টা ইহা চলিল। তাহার পর মঞ্চ পরিক্রমা করিয়া কীর্তন চলিল—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হয়ে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ," যতক্ষণ শ্রীশ্রীমা ঐখানে উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ ভক্তদের আর উৎসাহের সীমা নাই। সকলেই নৃত্য করিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি ৮।।টা পর্যন্ত চলিলে শ্রীশ্রীমা তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। স্থির হইয়াছে যে রাত্রি ১২।।টা হইতে ৪টা পর্যন্ত মেয়েরা এই কীর্তন

চালাইয়া যাইবে। রাত্রি ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত হরিবাবা তাঁহার ভক্তগণসহ এই কীর্তন রক্ষণ করিবেন। শেষে আশ্রমস্থ পুরুষগণ আসিয়া যোগ দিয়া রবিবার রাত্রি ৯টা পর্যন্ত টানিয়া কীর্তন শেষ করিবেন।

আমি রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আশ্রমে থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২৪শে পৌষ, রবিবার (ইং ৮।১।৫০)

বেলা ১১টার সময় আশ্রমে গেলাম তখন কীর্তনের আসরের মা এবং হরিবাবা প্রভৃতি সাধুগণকে দেখিলাম, ভক্তগণ খুব উৎসাহের সহিত কীর্তন করিতেছেন। এই ভাবে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলিল। শেষে মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

আজ দুপুরে ২০ জন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ বিদায় হইলেন। বেদপাঠী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল ইহাদিগকেও তাহাই দেওয়া হইল অর্থাৎ পিতলের একটি গামলা, ফল, মিষ্টি, দুই খানা পুস্তক এবং ৪ টাকা করিয়া দক্ষিণা।

আজ বিকালে উত্তর কাশীর দেবীগিরি মহারাজ আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য এবং প্রধান সেবক নিত্যানন্দ স্বামী আছেন। দেবীগিরি মহারাজের বয়স ৮৫ বৎসর। শুধু মা আসিতে লিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আসিয়াছেন। তাহা না হইলে বৃদ্ধ এই শীতের মধ্যে কখনও উত্তর কাশী হইতে আসিতেন না।

সন্ধ্যার পর হরিবাবা, ত্রিবেণী পুরী মহারাজ, অখণ্ডানন্দজী দেবীগিরি মহারাজ প্রভৃতি কীর্তন আসরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমাও ঐখানে ছিলেন। খুব কীর্তন চলিতেছিল। এই সময় শহর হইতে অপর একটি কীর্তন দল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারাও আসিয়া আশ্রমের যে কীর্তন হইতেছিল উহার সহিত যোগ দিল! শ্রীযুক্ত মনোজ বাবুর অনুরোধে এবং আগ্রহে হরিবাবাও এই কীর্তনে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী কৃষ্ণানন্দ এবং হরিবাবার অন্যান্য ভক্তগণও এই কীর্তন যোগ দিলেন। তখন ভক্তদের মধ্যে কি যে উদ্দীপনা! এইভাবে ৮।।টা পর্যন্ত কীর্তন চলিল। শেষে ইহারা নগর কীর্তনে

বাহির হইলেন। দিল্লীর ভক্তদের ইহাই প্রথা। তাঁহারা নাম যজ্ঞও শেষ করিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ নগর কীর্তন করিয়া আসেন। ইহারাও যখন নগর কীর্তন শেষ করিয়া আসিলেন তখন এক নূতন গান গাহিতে গাহিতে আশ্রমে আসিয়া ঢুকিলেন, "নগর ভ্রমণ করে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।"

ইহার পর একটি দধিপূর্ণ ভাণ্ড মাটিতে আছাড় দিয়া ভাঙ্গা হইল এবং ঐ দধি দিয়া সকলের কপালে ফোঁটা দেওয়া হইল। পরে হরিলুট দিয়া কীর্তন শেষ করা হইল।

আজ শ্রীশ্রীমাকে ১০৮ পদ দিয়া ভোগ দেওয়া হইয়াছে। আমরা বাসায় বসিয়াই ঐ প্রসাদ পাইলাম। যে কয়টা দিন বিশেষ বিশেষ ভোগ দেওয়া হইয়াছে আমরা বাসায় বসিয়াই পর্যাপ্ত পরিমাণে ঐ প্রসাদ পাইয়াছি।

২৫শে পৌষ, সোমবার (ইং ৯।১।৫০)

আজ সকাল ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত মেয়েদের কীর্তন হইল। কীর্তনান্তে ছেলেদের মত মেয়েরাও নগর কীর্তনে বাহির হইলেন, তবে ইহারা সদর রাস্তায় না গিয়া আশ্রমের চারিদিকের গলির মধ্যেই কীর্তন করিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু ছেলেদের নগর কীর্তন হইতে ইহাদের কীর্তন অনেকটা জমকালো ভাবে হইয়াছিল। খুকুনী দিদি বড় একটা পতাকা হাতে লইয়া এই কীর্তনের পুরোভাগে ছিলেন। অন্যান্য মহিলাদের হাতেও পতাকা ছিল। ছোট ছোট মেয়েরা গান এবং নৃত্য করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে যে একটা দিব্য উন্মাদনা আসিয়াছিল তাহা তাহাদের গান ও নৃত্য দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছিল। ইহাদের পশ্চাদ্ ভাগে একদল ব্যাণ্ড বাদক বাদ্য করিয়া যাইতেছিল।

২৭শে পৌষ, বুধবার (ইং ১১।১।৫০)

বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ ক্রমেই দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকা, কলিকাতা, জামসেদপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ,

দেরাদুন, আলমোড়া, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়াছেন। এখন প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন করিয়া ভক্ত আসিতেছেন। আশ্রমের চতুষ্পার্শের যে সব বাড়ী ছিল—তাহা সমস্তই লঁওয়া হইয়াছে। এমন বাড়ী বা দেবালয় নাই যাহার দুই একখানা কোঠা লওয়া হয় নাই। শিবালয়েও বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ তাঁহাদের বাড়ীর অধিকাংশই ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আশ্রমে প্রায় সহস্রলোক ভোজন করিতেছে। দিবারাত্র এই আশ্রমে ভিড় চলিতেছে। শহর হইতেও দলে দলে লোক দুই বেলাই আশ্রমে আসিতেছে। আশ্রমের দরজার কাছে ফুল এবং ফলের দোকান বসিয়া গিয়াছে। অন্নকূটের সময় বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে যেরূপ ভিড় দেখা যায় আশ্রমেও প্রায় সেইরূপ ভিড় চলিতেছে।

আজ রাত্রিতেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক আসিয়া মাকে গান বাজনা শুনাইয়া গেলেন।

২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার (ইং ১২।১।৫০)

আজ শুকেতের রাজা আসিয়াছেন। তিনি মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ একান্তে আলাপ করিলেন। তাঁহার বাসস্থানের বন্দোবস্ত আশ্রম হইতে দূরে হইয়াছে। আজ ৩০০ পরমহংস সন্ন্যাসীকে ভোজন করানো হইল। রাত্রিবেলা অভয় লীলাকীর্তন করিল।

২৯শে পৌষ, (ইং ১৩।১।৫০)

আজ এককোটি আহুতি পূর্ণ হইল। যজ্ঞ সমাপন করিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারীগণ রেশমী নামাবলী গায়ে দিয়ে কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঐ নামাবলিগুলি আজ মা ব্রহ্মচারীদিগকে যজ্ঞের আশীর্ব্বাদী বস্ত্ররূপে দান করিয়াছেন।

আজ ১০৮টি কুমারী ভোজন হইল এবং একটি কুমারীকে শয্যা, বস্ত্র এবং অলঙ্কার সহ পূজা করানো হইল। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল হইতেছিল যে একটি কুমারীকে শয্যা, কাপড় এবং অলঙ্কার সহ পূজা করা হউক। খুকুনীদিকে ঐ কথা বলিলে দিদি বলিলেন যে

তহবিলে তখন এতটাকা নাই যাহা দ্বারা অলঙ্কার তৈয়ারী হইতে পারে। সেই দিনই এক মহিলা মাকে কয়েকপদ গহনা দিয়া প্রণাম করিলেন। মা ঐগুলি ভাঙ্গিয়া একদিনের মধ্যে কুমারীর জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল হওয়া মাত্রই যে উহা পূরণ হইয়া যায় এই ঘটনাটি উহার একটা দৃষ্টান্তমাত্র।

রাত্রিতে গুজরাটী মহিলারা গরবা নৃত্য করিলেন। কন্যাপীঠের সম্মুখে চত্বরে এই নৃত্য হইয়াছিল। প্রায় ১৫।২০ টি মহিলা সুবেশে সজ্জিত হইয়া ও পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নৃত্য করিলেন। মা কন্যাপীঠের বারান্দায় বসিয়া ইহা দর্শন করিলেন। নৃত্য শেষ হইলে তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে মা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভজনগান করিলেন। তাঁহাদের ভজন শেষ হইলে মা তাঁহাদিগকে কমলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফল ছুড়িয়া ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও মহানন্দে উহা লুফিয়া লইতে লাগিলেন। অন্যান্য উপস্থিত ভক্তদিগকেও মা ফল বিতরণ করিলেন।

আজ সারারাত কীর্তন হইবে। মেয়েরা রাত্রি ১টা পর্যন্ত এই কীর্তন চালাইবেন। পরে পুরুষেরা বাকী রাত্র কীর্তন করিবেন।

সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি
৩০শে পৌষ, শনিবার (ইং ১৪।১।৫০)

আজ সাবিত্রীমহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন। এই যজ্ঞ আজ তিন বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ বিরাট যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করা বর্তমান সময়ে কোন রাজা বা মহারাজের পক্ষেও সম্ভব নয়। কারণ কেবল প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহই এই ব্যাপারে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। অবশ্য এরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই আছে এবং এই যজ্ঞের আনুমানিক খরচ হইয়াছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। অর্থ ব্যতীত শুদ্ধাচারী ব্রহ্মচারী সংগ্রহ করা এবং তাহাদের দ্বারা শীত গ্রীষ্ম প্রধান কাশীধামে তিন বৎসরব্যাপী এই দীর্ঘ সত্র শাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিয়া মার্জন তর্পণ এবং সমসংখ্যক জপসহ সাবিত্রীযজ্ঞে কোটি আহুতি দ্বারা নির্বিঘ্নে

পূর্ণ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। তাহা ছাড়া সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে হবন সামগ্রী সংগ্রহ, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী প্রভৃতি একাদশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন, দরিদ্র ভোজন, দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি সাধুদের বস্ত্র এবং ফল দ্বারা সেবাপূজা ১০৮টি কুমারী সেবা, শয্যা বস্ত্রাদিসহ সালঙ্কৃতা একটি কুমারী পূজা, সাড়ম্বরে গঙ্গা পূজা, গোপূজা, তীর্থস্থ মুখ্য মুখ্য দেবায়তনে পূজা দান, একাদশ রুদ্রের সেবা, বেদপাঠী, অগ্নিহোত্রী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তৈজসপাত্রসহ ফল, মিষ্টান্ন, পুস্তক এবং অর্থদান—এই সব সম্পন্ন করিয়া যেভাবে এই বিরাট যজ্ঞের উদ্‌যাপন করা হইয়াছে তাহা যে একটি প্রায় অসম্ভাব্য ব্যাপার—ইহা বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। এই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট সাধুমহাত্মাগণ পূর্ণাহুতির একমাস পূর্ব্বে মায়ের আশ্রমে সমবেত হইয়া ছিলেন। ইহারা ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন এবং বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মাদের শুভাগমনের পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমে কাশীখণ্ড, কেদার মাহাত্মা, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ ইত্যাদি পুরাণপাঠ হইয়াছে। মহাত্মাদের আগমনের পর ভাগবত পাঠ, কথকতা, রামলীলা এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদকের গান বাজনা হইয়াছে। পুরাণ পাঠ এবং কীর্তনাদি আনন্দোৎসব এই জাতীয় যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। এতদ্ব্যতীত এই যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের মধ্যে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলবর্ণের এবং সকল শ্রেণীর সহস্রাধিক লোক আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ইহাদের বাসস্থান এবং আহারাদির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং ইহাদের অধিকাংশকেই যজ্ঞের আশীর্ব্বাদী বস্ত্র দান করা হইয়াছে। সাধু মহাত্মাদিগকেও মহার্ঘ পরম উত্তরীয় দেওয়া হইয়াছে। এই সব কারণে পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত খান্নার ত্রিবেণীপুরী মহারাজ এবং উত্তর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দেবীগিরি মহারাজ উভয়েই এই যজ্ঞ এবং ইহার অঙ্গীভূত উৎসবাদি দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে এরূপ যজ্ঞ কখনও হয় নাই এবং আর হইবে না।

এই যজ্ঞ অথর্ব বেদের কোটি হোমের পরিশিষ্টোক্ত বিধি এবং যজুর্বেদীয় পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যজ্ঞশালাটি একটি চৌচালা ঘর। উহা ষোলটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। যজ্ঞশালার মধ্যভাগে যোনিপীঠ এবং অন্তর্মেখলাযুক্ত একটি চতুষ্কোণ বিশাল কুণ্ড। এই কুণ্ডের চারি কোণে চারিটি স্তম্ভ যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র—এই চারিটি দেবতার স্থানরূপে কল্পিত। এই চারিটি স্তম্ভ ঘিরিয়া বহির্ভাগে আরও দ্বাদশটি স্তম্ভ আছে। তাহাও বরুণ, সূর্য, বায়ু, গণেশ, স্কন্দ, বৃহস্পতি প্রভৃতি দ্বাদশটি দেবতার স্থান। তাহাছাড়া যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে অগ্নিকোণে গণেশ, ষোড়শ মাতৃকা এবং বসুধারার আসন, নৈঋতকোণে পঁয়তাল্লিশটি বাস্তুদেবের আসন। বায়ুকোণে চৌষট্টি যোগিনী এবং ঊনপঞ্চাশটি ক্ষেত্রপালের আসন। ঈশানকোণে নবগ্রহ ও রুদ্রের আসন এবং ছাপ্পান্নটি সর্বতোভদ্রমণ্ডল দেবতার উপর গায়ত্রীদেবীর আসন। এইখানে ভিন্ন ভিন্ন আসনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর একখানা প্রতিকৃতিও স্থাপিত আছে। যজ্ঞশালার এইসব দেবতাদের নিত্য পূজা হইয়াছে এবং প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বিশেষ পূজা হইয়াছে। সংক্রান্তি দিনে ঘটা করিয়া অন্নভোগ দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞশালার উপরে এবং মধ্যদেশে এক বৃহৎ বংশদণ্ডের উপর বিচিত্রবর্ণের মহাধ্বজা বিরাজিত ছিল এবং উহার চতুষ্পার্শে নানা বর্ণের বিংশতি ধ্বজা ও পতাকা শোভা পাইয়া ছিল। ধ্বজাগুলি ত্রিকোণ এবং উহাতে দেবতাদের বাহন অঙ্কিত; পতাকাগুলি চতুষ্কোণ এবং উহাতে দেবতাদের বিশিষ্ট অস্ত্রচিহ্ন অঙ্কিত। তিল, যব, তন্ডুল, বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত, চিনি, মেওয়া এবং গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি সংযোগে প্রতিদিন আহুতি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের সমষ্টি পরিমাণও প্রত্যহ প্রায় ১ মণ।

এই যজ্ঞের আচার্য ছিলেন শ্রীযুক্ত অগ্নিস্বাত্ত শর্মা। ইনি বৈদিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ পারদর্শী। বাল্যকালে ইনি শ্রুতিধর এবং জাতিস্মর ছিলেন। যজমান পদে ছিলেন শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আবাল্য ব্রহ্মচারী এবং শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ

ভক্ত। যজ্ঞের হোতৃগণ আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী। ইহাদের অধিকাংশের বয়স ১৫ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর। ইহারা যে কি ভাবে তিন বৎসর কাল শুদ্ধাচারে মাত্র একবেলা অন্নগহণ করিয়া প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা আহুতির কার্য নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

এই যজ্ঞের সূচনা ২৩ বৎসর পূর্বেই হইয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীমা ঢাকাতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার অল্প সংখ্যক ভক্তদের উৎসাহে শাহবাগে এক কালীপূজা হয়। সেই পূজোপলক্ষ্যে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল উহা নির্বাপিত না করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মত রক্ষা করা হয়। তখনই শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন যে ঐ অগ্নি এক মহাযজ্ঞে লাগিয়া যাইবে। যাহা হউক ঐ অগ্নি শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকাস্থিত আশ্রমে এযাবৎকাল নিত্য হোম দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বিগত ২৩ বৎসরের মধ্যে দেশের কত কিছু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং মা যে এক মহাযজ্ঞের কথা বলিয়াছিলেন—তাহাও লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। ইদানীং শ্রীশ্রীমা যখন একবার বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় শ্রীযুক্ত মহাদেব মালব্য নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাকে একটি যজ্ঞ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে অনুরোধ করেন। মা সেই সময় কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া ব্রাহ্মণটি চলিয়া যাইবার সময় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রিয়া দেবীকে (খুকুনী দিদিকে) ব্রাহ্মণের নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া রাখিতে বলেন। পরে মা কাশীতে আসিতে নেপাল (ব্রহ্মচারী) দাদা এবং সাধন (ব্রহ্মচারী) দাদা প্রভৃতি আরও কয়েকজন মাকে একটি যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিতে থাকেন। এই সব অনুরোধ শুনিয়া মা খুকুনীদিদিকে বলিয়াছিলেন, "মহাযজ্ঞের আভাস আসিতেছে।" একটি মহাযজ্ঞ হইবে বলিয়া বহুকালপূর্ব্বে মা যাহা বলিয়াছিলেন সে কথা খুকুনীদিদি একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ঐ মহাযজ্ঞের আভাস আসিতেছে—একথা মার মুখে শুনিয়া খুকুনীদিদিরও একটি যজ্ঞ করিবার প্রবল আকাঙক্ষা হইল। কিন্তু দিদির সহকারী অন্য কেহ এই যজ্ঞ বিষয়ে

বিশেষ অনুরোধ বা উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুয়ার্ড শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় একমাসের জন্য ছুটি লইয়া কাশীতে আসিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ইতঃপূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে ঢাকা হইতে কাশী পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে একটি যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করিতে বলায় তিনি আচার্যের নির্দেশ মত বর্তমান যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড অতি নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত করিলেন। বর্তমান সময়ে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে এরূপ নিখুঁতভাবে আর একটি যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং নেপাল (ব্রহ্মচারী) দাদার আকাঙ্ক্ষা মত কোটি আহুতি দেওয়াও সুস্থিত হইল। ইহা ভিন্ন যজ্ঞের আর কোন আয়োজন নাই। কোটি আহুতিপূর্ণ করিতে হইলে যে পরিমাণে কাষ্ঠ, ঘৃত এবং অন্যান্য হবন সামগ্রী দরকার তাহা আহরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ না করিয়াই ১৩৫৩ সালের পৌষ সংক্রান্তির দিন এই যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ঢাকার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ৫ বৎসর গব্যঘৃত পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা আহুতি আরম্ভ হইল। কেবল শ্রীশ্রীমায়ের উপর একান্ত নির্ভর এবং অটল বিশ্বাস হইতেই খুকুনীদিদি এই বিরাট যজ্ঞ সমাপনে অগ্রণী হইলেন; কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিবিশেষ হইতে দিদি যে এ বিষয়ে কোন উৎসাহ পাইয়াছিলেন এমত নহে। বরং যাঁহারা যজ্ঞকাঠ এবং ঘৃত সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রথমে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাঁহারাও গ্রহবৈগুণ্যে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও দিদিকে এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতে উৎসাহিত করেন নাই। তিনি শুধু এইমাত্র বলিয়াছিলেন, "খুকুনি, যখন এই যজ্ঞের ভার নিয়াছিস, তখন যথাসর্বস্ব দিয়া চালাইয়া যা। যখন কিছু থাকিবে না তখন যজ্ঞেশ্বরকে নিবেদন করিস, যজ্ঞেশ্বর আমার যাহা কিছু ছিল তাহা আমি সব দিয়াছি। এখন আমার আর দিবার কিছু নাই।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া যে যজ্ঞ শেষ হইল উহার উল্লেখযোগ্য কোন অংশ কেবল

আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত মুকুন্দভাই ঠাকুর এবং কান্তিভাই মুন্‌সী ব্যতীত, রাজা কিংবা কোন ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে আসে নাই। সাবিত্রী যজ্ঞরূপ সেতুবন্ধনে নল, নীল, অঙ্গদের প্রয়োজন হইল না, ইহা শুধু কাঠবিড়ালগুলির অবদান দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ইহা যে শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাহা অঙ্গুলী নির্দেশ পূর্বক না দেখাইলেও ক্রমশঃ বেশ অনুভব করা যায়।

এই যজ্ঞের জন্য চাঁদার খাতা হাতে করিয়া কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই বা অর্থের জন্য কাহারও উপর চাপ দেওয়া হয় নাই। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তরা এইমাত্র জানিতেন যে কাশীর আশ্রমে একটি যজ্ঞ হইতেছে এবং এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিতে কি পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উৎস হইতে এই যজ্ঞের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রভাতকালীন সমীরণের মত যদৃচ্ছাক্রমে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহাই হইল সীমার মধ্যে অসীমের লীলা। অবশ্য যজ্ঞের গব্যঘৃত সংগ্রহ করিতে খুকুনী দিদিকে কলিকাতা, দিল্লী, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে এবং কোন সময়েই এই যজ্ঞের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত বা অর্থ পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত হয় নাই। উৎসবের শেষ পনের দিন আশ্রমে সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং সাধু ভোজনও চলিয়াছে। কিন্তু এইসব কার্যের কোন সুচিন্তিত কর্মসূচী পূর্ব্ব হইতেই নির্ধারিত হয় নাই। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারটাই যেন শ্রীশ্রীমা কর্তৃক সদা প্রচারিত "যা হয়ে যায়"—এই মহাবাক্যের একটি জ্বলন্ত ব্যাবহারিক নিদর্শন মাত্র। যাঁহারা এই যজ্ঞোৎসবটি মাসাধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমাপন করিলেন তাঁহারা আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্ত ভিন্ন আর কেহ নহে। ইহারা জনসেবা ও সাধুসেবার যে মহান আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন উহার মূল প্রস্রবণ কোথায় তাহাও সহজেই অনুমেয়। সর্বকর্মে বরাভয়যুক্ত শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গল হস্তের নির্দেশ ছিল বলিয়া

ইহারা নিশ্চিন্ত মনে এবং নির্ভীক অন্তঃকরণে দিবারাত্রি কর্ম তৎপর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই বিরাট উৎসবের কোন কার্যই শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ কিংবা অনুমোদন ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় নাই। অথচ মা যে এই ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করিতেছেন তাহা তাঁহার সদানন্দময় নির্বিকার মূর্তি দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সর্বকর্মের মূলেই শ্রীশ্রীমা বিদ্যমান আবার কিছুর মধ্যেই তিনি নাই। এ যেন গীতার—

"কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।"

যজ্ঞ উদ্‌যাপন হইবার মাসাধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই যজ্ঞের হোতৃগণ একের পর একটি করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যজ্ঞবিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রজপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল দেখা গেল না। এদিকে মা নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটব্যথা, সর্দি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মা হরিবাবার পাঠ এবং কীর্তনাদিতে উপস্থিত থাকারূপ দৈনন্দিন কার্যগুলি ঠিক ঠিক ভাবে করিয়া যাইতেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মা অসুস্থ হওয়ার পর হইতেই হোতাদের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল। তাঁহারা নির্বিঘ্নে হোম কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে মাকে অসুস্থ দেখিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইলেন। হরিবাবা প্রমুখ সাধুগণ মাকে সুস্থ হইয়া উঠিবার জন্য বারবার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এতদুদ্দেশ্যে চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা হইল। মা হরিবাবাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পিতাজী, রোগও যে তাঁহারই একটা রূপ। ইহার জন্য চিন্তার কারণ কি?" শেষে মা আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন, "এ শরীরটা একবার উলট-পালট খাইলেই যদি ইহারা ভাল ভাবে যজ্ঞ শেষ করিতে পারে তবে তাহাই বা মন্দ কি?" তখন বুঝা গিয়াছিল যে যজ্ঞ রক্ষার জন্যই মা নিজশরীরে সকলের ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ নানা ভাবেই মা এই যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিজ বিভূতি

বলে যজ্ঞকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যিনি একটু স্থির ভাবে এই যজ্ঞ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন তিনিই ইহাতে মায়ের অনন্ত বিভূতির নিদর্শন পাইবেন। এই সকল কারণেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বর্তমান সময়ে এরূপ আর একটি যজ্ঞ সম্পাদন করা রাজা মহারাজাদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

আজ সকালবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া যখন আশ্রমে গেলাম আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। অতিকষ্টে আশ্রমে ঢুকিয়া যজ্ঞশালার নিকট একটু বসিবার স্থান করিয়া নিলাম। সমস্ত আশ্রমখানি এক অপূর্ব উৎসবের বেশ ধারণ করিয়াছে। আশ্রম সৌধাবলীর গাত্রে গাত্রে এবং আশ্রম প্রাঙ্গণের উর্ধ্বদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের মালা দিয়া এমন ভাবে সাজানো হইয়াছে, উহা দেখিলে মনে হয় যে উহা যেন ফুল দিয়াই তৈয়ারী হইয়াছে। স্তম্ভে স্তম্ভে ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। চৌচালার নীচের দিকে এমন ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে মালাগুলি দেওয়া হইয়াছে যে উহা দেখিয়া মনে হয় যে চৌচালার নীচের দিকটা একখানা রঙিন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞশালার উপর ধ্বজা ও পতাকাগুলি নূতন করিয়া রেশমের বস্ত্র দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে এবং উহাতে দেবতাদের বাহন এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিভিন্ন বর্ণের সূত্রে বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাধ্বজাটি বিচিত্র বর্ণের বেনারসী শাড়ীর টুকরা দিয়া তৈয়ারী। উহার প্রান্ত দেশের জরির ঝালরগুলি সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। শুনিতে পাইলাম এই ধ্বজাটির মূল্যই একশত টাকা এবং উৎসব উপলক্ষ্যে যত ফুলের মালা ক্রয় করা হইয়াছে উহার মূল্যও দুই সহস্র মুদ্রার উপরে। যজ্ঞশালার দক্ষিণ দিকের আশ্রম প্রাঙ্গণটি একটি বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া সেখানে আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐখানে খান্নার ত্রিবেণীপুরী মহারাজ, দেবী গিরিমহারাজ, হরিবাবা, অখণ্ডানন্দ স্বামী, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, অবধূতজী প্রভৃতি সাধুমহাত্মাগণ, সোলনের রাজাসাহেব দুর্গা সিং, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট

ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞাবলোকন করিতেছেন। যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে চারিটি কোণে দেবতাদের যে সব আসন আছে উহার উপর রেশমের চাঁদোয়া শোভা পাইতেছে। সাবিত্রী দেবীকে রাজোপচারে পূজা করিবার জন্য শাড়ী, কাঁচুলি, শাল ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার, রোপ্য নির্মিত বাসন, নূতন খাট শয্যা এবং অন্যান্য তৈজসপত্র একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা স্মিতাননে এক বিশিষ্ট আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার গলায় সুন্দর একটি ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মচারীগণ মায়ের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদী রেশমী নামাবলী গায়ে দিয়া যজ্ঞশালার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কেহ দেবতাদের পূজা করিতেছেন, পূজা সমাপন হইলে বেলা প্রায় ১০টার সময় ব্রহ্মচারীগণ যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দিকে বসিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি দিতে লাগিলেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেদমন্ত্র ও উদ্‌গীত হইতে লাগিল। ইহার পরই পূর্ণাহুতির আয়োজন হইতে লাগিল। ঘৃত এবং চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে যজ্ঞাগ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। উহার লেলিহান জিহ্বা ঊর্ধ্বে উঠিয়া মহাধ্বজদণ্ডের পাদদেশে যাইয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। উহার জ্বলন্ত স্পর্শে সেখানকার ফুলের মালাগুলি ভস্মীভূত হইয়া কুণ্ডের মধ্যে পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা নিজাসনে দাঁড়াইয়া এই সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। বহুধা বিভক্ত চঞ্চল অগ্নিশিখার ভিতর দিয়া মাকে রক্তবর্ণা সাক্ষাৎ সাবিত্রী দেবী বলিয়া মনে হইতেছিল। এদিকে ব্রহ্মচারীগণ একখানা মূল্যবান বেনারসী শাড়ী যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। এ যেন কুণ্ডস্থিতা গায়ত্রীদেবীকে ঐ বসন পরাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর একটি নারিকেল ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া এবং উহা তবক ও রক্তবর্ণের বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক উহা দ্বারা পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীখানাও অগ্নিতে বিসর্জন দেওয়া হইল। এইভাবে এই দীর্ঘ সত্রের পূর্ণাহুতি হইল।

পূর্ণাহুতির পরই লোক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম। যজ্ঞ সম্বন্ধে করণীয় অনেক কিছু তখন

পর্যন্ত বাকি ছিল এবং সেইজন্য শ্রীশ্রীমা যজ্ঞশালায় বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ১।।টার সময় যজ্ঞকুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া উহা নূতন যজ্ঞশালায় স্থাপিত হইল।

বিকালবেলা সোলনের রাজাসাহেব এই সাবিত্রীযজ্ঞের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তাহার পর প্রত্যহ যেরূপ পাঠ এবং বক্তৃতা হয় সেইরূপ হইল। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে যজ্ঞের অন্নপ্রসাদ বিতরণ করিলেন এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উহা গ্রহণ করিলেন। এইভাবে সকলকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ মার পক্ষে ইহাই প্রথম। পরে নেপাল ব্রহ্মচারী দাদার মুখে শুনিয়াছিলাম যে যজ্ঞ শেষ হইবার অনেক দিন পূর্ব্বে মা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কাশীক্ষেত্র ত মুক্তিক্ষেত্র আছেই, যজ্ঞেশ্বরের ইচ্ছায় এই যজ্ঞ যদি শেষ হয় তবে ইহা শ্রীক্ষেত্রও হইবে।"

শ্রীশ্রীমা সহ নগরকীর্তন

১লা মাঘ, রবিবার (ইং ১৫।১।৫০)

আজ বেলা ২।।টার সময় ভক্তগণ মাকে লইয়া নগর কীর্তনে বাহির হইলেন। মাকে একখানা জুড়ি গাড়ীতে বসানো হইয়াছিল, মায়ের সঙ্গে ছিল স্বামী শরণানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, গোপাল দাদা, দিদিমা, বাটু দাদা এবং নেপাল দাদা, সঙ্গে আরও ২।৩ খানা গাড়ী গিয়াছিল তাহাতে অন্যান্য সাধুরা বসিয়াছিলেন, হরিবাবা গাড়ীতে না গিয়া মায়ের ভক্তগণ সহ পদব্রজে কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। হরিবাবার ভক্তগণও তাহাই করিলেন। মোট ভক্তের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। ইহাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। ছেলেদের মত, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা রাস্তা দিয়া কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। এই দীর্ঘ কীর্তনের দল প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে। পরে সেখান হইতে রামাপুরা এবং কামাখ্যা হইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রায় তিন ঘন্টাকাল সকলে কীর্তন করিয়া মাকে শহর ঘুরাইয়া আনিলেন। রাস্তার মাঝে মাঝে মায়ের গাড়ী থামাইয়া লোকে ফটো তুলিতে ছিলেন এবং মাকে

পুষ্পাঞ্জলি দিতে ছিলেন। মা যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের পাঁপড়ি দ্বারা এমনভাবে ঢাকিয়াছিল যে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে মা যেন একখানা রঙ্গিন উড়নি মাথায় দিয়া বসিয়া আছেন।

৪ঠা মাঘ, বুধবার (ইং ১৮।১।৫০)

শারীরিক অসুস্থতার জন্য দুই দিন আশ্রমে যাইতে পারি নাই। আজ বিকেলে আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীমা এবং সোলনের রাজা সাহেবকে নিয়া এক ফটো তুলিল। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীগণও মাকে সঙ্গে করিয়া অন্য একটি ফটো তুলিল, যজ্ঞের ব্রহ্মচারীগণ মাকে লইয়া আর একখানা ফটো তুলিলেন, ইহার পর মা হরিবাবার পাঠে গিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার পর হরিবাবার কীর্তন হইল। এই সময় একটি মুসলমানকে এ কীর্তন আসরে উপস্থিত দেখিলাম। পরে শুনিলাম যে, মাকে লইয়া ভক্তগণ যেদিন নগর কীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন, সেই দিন ঐ মুসলমানটি মাকে প্রথম দর্শন করেন এবং দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। গতকল্য তিনি সকালবেলা আসিয়া মাকে মালা পরাইয়া যান এবং রাত্রিবেলা আসিয়া উর্দ্দুতে একটি কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে শুনান। লোকটি নাকি বলিয়াছেন যে মাকে দেখিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে হিন্দুরা যাঁহাকে কৃষ্ণ বলে ইনিই সেই। ইনি কাশীর মদনপুরাতে বাস করেন। ইঁহার ব্যবসা হেকিমি চিকিৎসা। ইঁহার দুই ভাই নাকি ডাক্তার।

৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯।১।৫০)

উৎসব শেষে এখন বিদায়ের পালা আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিবেণীপুরী, শরণানন্দজী, অখণ্ডানন্দ, অবধূতজী প্রভৃতি সাধুগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। শুকেতের রাজাও চলিয়া গিয়াছেন। সমাগত সহস্রাধিক ভক্তগণ মধ্যে এখন আশ্রমে একশত ভক্ত আছেন কিনা সন্দেহ। ইঁহাদের মধ্যেও প্রত্যহ দুই চারিজন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এখনও হরিবাবা ও মা আছেন, কাজেই স্থানীয় লোকের সমাগম

হইতেছে। আজ সন্ধ্যায় কীর্তনের পর 'বিসামিল্লা এণ্ড পার্টি' নামক সুপ্রসিদ্ধ সানাই বাদকের দল আশ্রমে আসিয়া মাকে সানাই বাদ্য শুনাইয়া গেল। ধহয় সোলনের রাজা সাহেব খরচ দিয়া ইহাদের বাজনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরিবাবা রাত্রি ৯টা পর্যন্ত হলে উপস্থিত ছিলেন। এ জাতীয় প্রোগ্রাম তাঁহার বিশেষ উপভোগ্য নয়। তিনি রাসলীলা ইত্যাদি পছন্দ করেন। এইজন্য উৎসব শেষ হইলেও তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য প্রত্যহই সকালবেলা রাসলীলা হইতেছে।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার (ইং ২৭।১।৫০)

আজ মা হরিবাবাসহ বিন্ধ্যাচলে রওনা হইলেন। সঙ্গে হরিবাবার ভক্তরাও চলিলেন। মা এবং হরিবাবা মোটরে গেলেন। সঙ্গীয় প্রায় ৬০ জন লোক বাসে করিয়া মোগলসরাই গেলেন। ঐখান হইতে তাহারা ট্রেন ধরিবেন। বেলা ১২।।০ টার সময় মোটর এবং বাস রওনা হইল। যাত্রার সময় মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে মা গতকল্য গোপীবাবুর সহিত যে সব আলাপ করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু বলিলেন। গোপীবাবুকে বিন্ধ্যাচলে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, "যদি গোপীবাবা যায় এবং তোমার পক্ষে যাওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তুমিও বিন্ধ্যাচলে যাইও।" সম্প্রতি এইরূপ স্থির হইয়াছে যে মা বিন্ধ্যাচলে পনের দিন থাকিবেন পরে বৃন্দাবনে যাইবেন এবং সেখানে একমাস থাকিয়া হরিদ্বারে যাইবেন।

২৭শে মাঘ, শুক্রবার (ইং ১০।২।৫০)

গতকল্য রাত্রি ৭।।০ টার সময় মা হরিবাবা সহ কাশী পৌঁছিয়াছেন। মা এখান হইতে যখন চলিয়া যান তখন কাশীতে ফিরিবার কোন কথা ছিল না। যাহা হউক বিন্ধ্যাচল হইতে মা সদলবলে এখানে আসিয়াছেন। মা হরিবাবা সহ মোটরে আসিয়াছেন, আর সকলে বাসে আসিয়াছেন। আজ ভোরে হরিবাবা তাঁহার ভক্তগণ সহ অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন। মাকেও সঙ্গে লইবার তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মা উহাতে সম্মত হন নাই। ভোর ৪টায় হরিবাবা

কাশীধামে নবনির্মিত যজ্ঞশালার সম্মুখে শ্রীশ্রীমা

যখন ষ্টেশনে রওনা হইয়া যান তখন আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহাকে মোটরে তুলিয়া দিয়াছিল। অযোধ্যায় দুই দিন থাকিয়া তিনি আগামী রবিবার ঝুসীতে পৌঁছিবেন। ঐদিন মাও এখান হইতে ঝুসী রওনা হইয়া যাইবেন। পরে সোমবার সকলে মিলিয়া বৃন্দাবনে রওনা হইবেন।

আজ সকালবেলা মা আর নীচে নামিলেন না। শিবালয় আশ্রমের গরুর জন্য যে ঘর তৈয়ার হইতেছিল মা বিকালে তথায় গিয়া তাহা দেখিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা সকলে মার ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। মা হঠাৎ "বংশাল" শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঢাকায় বংশাল বলিয়া একটি জায়গা আছে কিনা। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "যতীন এখন কোথায়?" এই যতীন হইল মায়ের এক পুরাতন ভক্ত এবং জমিদার। কথায় কথায় মা আবার বলিলেন, "অনেকেই বোধকরি এখন ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে", মার এইসব অসংলগ্ন কথা শুনিয়া আমাদের বড় চিন্তা হইল। খুলনা এবং যশোরে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেছিল—এই খবর আজ কয়েকদিন যাবৎ পত্রিকায় দেখিতেছি; কিন্তু ঢাকায় যে কোন অত্যাচার হইতেছে এরূপ কোন খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মাকে আজ হঠাৎ বংশালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া মনে হইল ঢাকায়ও বুঝি মুসলমানদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, কারণ বংশাল ঢাকার একটি কুখ্যাত অঞ্চল। এখানে গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমানদের বাস।

কমলাদিদির ভ্রাতা মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌতে থাকেন এবং একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। কমলাদিদির ভ্রাতা মাকে বলিলেন, "আমি মিরজাপুর থাকিতেই খবর পাইয়াছি যে লক্ষ্ণৌতে আমার বাড়ীর তালা ভাঙ্গিয়া চোরে সব জিনিষ লইয়া গিয়াছে। চারিদিন হয় এই সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু এখনও বাড়ী যাইতে পারি নাই। আগামীকল্য বাড়ী যাইব বলিয়া মনে করিয়াছি।

তবে চুরির খবর শুনিয়া মনে হইতেছিল আমার জিনিষ বোধহয় কিছু বেশী হইয়াছিল, তাই কমিয়া গেল।"

মা। (হাসিয়া) কোন জিনিষ খোয়া গেলে যদি সত্যি ঐ ভাব কাহারও মনে আসে তবে বলিতে হয় যে তাহার ওপর ভগবানের খুব কৃপা। ভগবান যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন—এই ভাবটা সর্বদা মনে রাখিতে পারিলে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে কাহার যে কি প্রাপ্য তাহা ভগবানই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। টাকা উপার্জন করিলে কিংবা কাপড় জামা ইত্যাদি কিনিলে উহা যে নিজের ভোগে আসিবেই এ কথা বলা যায় না। জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য যাহার পক্ষে যাহা প্রয়োজন ভগবান অবশ্য তাহা রাখিয়াছেন। ইহার অধিক যদি কাহারও নিকট জমে তবে ভগবানই উহা সরাইয়া দেন। আমার যাহা প্রাপ্য আমি তাহাই পাইতেছি এবং ভগবান যাহা করিতেছেন তাহা ঠিকই করিতেছেন—ঐ ভাবটা যদি মনে রাখা যায় তাহা হইলে অবস্থা পরিবর্তনের মধ্যেও অনেক শান্তি পাওয়া যায়। আমরা জগৎ অর্থাৎ গতাগতির মধ্যে আছি কিনা তাই এখানে এক অবস্থায় কিছুই থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন হইতে বাধ্য। কাজেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পড়িয়া যদি মনে করা যায় যে ইহা ত স্বাভাবিক নিয়মেই হইতেছে তাহা হইলে আর শোকে অভিভূত হইতে হয় না।

অনেক সময় লোকের দুঃসময় আসে। তখন তাহার কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ই হয়। যে ক্ষতিটা হয়ত জীবনের উপর দিয়া হইত, ভগবান অনেক সময় তাহা অর্থের উপর দিয়া করিয়া দেন। যেখানে প্রাণহানি হইবার কথা ছিল তাহা না হইয়া কিছু অর্থহানি হইল। এইভাবে দেখিলেও চুরি ইত্যাদি ব্যাপারে কতকটা শান্তি পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া যদি তত্ত্বের দিক দিয়া দেখা যায় তবে বলিতে হয় যে আমরা সকলেই ত এক। কাজেই একের জিনিষ যখন অপরে লইয়া যায় তখন ইহা ভাবিয়াও সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে, অপর বলিয়া যখন কিছু নাই তখন অন্যে আমার জিনিষ নিলে উহা আমার

কাছেই রাখা হইল। একবার হইয়াছে, কি না, আমরা আনন্দ চকে (দেরাদুন) আছি। আমি বারান্দায় শুইয়া আছি। জ্যোতিষ (ভাইজী) আমার পায়ের কাছে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। ঐখানে লক্ষ্মীর একখানা দামী আসন, জ্যোতিষের গায়ের চাদর, হারমনিয়াম এবং অন্যান্য জিনিষ ছিল। তখন লক্ষ্মী ভোর রাত্রে আসিয়া ঐ আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ নাম করিত পরে অন্যান্য সকলে আসিলে হারমনিয়াম বাজাইয়া কীর্তন করিত। আমরা যে বারান্দায় শুইতাম লক্ষ্মীরা আসিয়া সেইখানে কীর্তন করিত। সেইজন্য ঐসব জিনিষ ঐখানে ছিল। ঐদিন রাত্রিতে আমরা শুইয়া আছি। জ্যোতিষ কম্বল দিয়া মাথা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে, তখন ছিল ঠাণ্ডার দিন, রাতটা ছিল চাঁদিনী—আমি শুইয়া শুইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "কে"? জ্যোতিষ কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমের মধ্যেই উত্তর দিল, "চোর বুঝি"। আমি চাঁদের আলোতে দেখিতে পাইলাম যে চোর বাহিরের দেওয়ালের উপর দিয়া একটি একটি করিয়া জিনিষ সরাইতেছে। ভোর রাত্রে লক্ষ্মী আসিয়া তাহার আসন খুঁজিতে লাগিল। জ্যোতিষ উঠিয়া দেখে যে তাহার চাদরও নাই, হারমনিয়ামও নাই। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে এই ঠাণ্ডার দিনে কেহ বোধ হয় আসনে বসিয়া চাদর গায়ে দিয়া হারমনিয়াম বাজাইবে—তাই ঐ জিনিষগুলি হইয়া গিয়াছে। (সকলের হাস্য)।

ধর্মজীবন লাভ করিতে নেশার প্রয়োজনীয়তা

কমলাদিদির ভ্রাতা—একবার সরকার নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন মথুরা এবং বৃন্দাবনে কেহ গাঁজা, চরস, আফিম বিক্রয় করিতে পারিবে না। এইজন্য কুম্ভস্নান উপলক্ষ্যে কোন সাধুই মথুরা এবং বৃন্দাবনে না গিয়া বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে সরকার ঐ আদেশ উঠাইয়া নিলে তাঁহারা মথুরা এবং বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। আচ্ছা, সাধুরা নেশা করেন কেন? নেশা করা ত ভাল নয়।

মা—ইহারও ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে, আমি শুনিয়াছি যে অনেকে ভগবানে ধ্যান লাগা[illegible] জন্য ঐরূপ করিয়া থাকেন। যে কোন

উপায়েই হউক ভগবানে ধ্যান লাগানই হইল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এইভাবে ধ্যান লাগাইতে লাগাইতে তাঁহাদের যদি একবার ভগবানে নেশা লাগিয়া যায়, তখন আর এ নেশার উপর মন থাকে না। অবশ্য এরূপও অনেক আছে যাহারা সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য লইয়া নেশা আরম্ভ করিল, কিন্তু পরে তাহাদের সাধনভোজন চলিয়া গিয়া শুধু নেশাটাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা নেশা করিলেও তাঁহাদের নেশা হয় না। শুধু ধ্যানই হয়—যেমন রামদাস কাঠিয়া বাবার কথা শুনা যায়। তাঁহার আশ্রমে এখনও তাঁহার ব্যবহৃত কল্কি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহা সবসময় এখনও বোধহয় তাঁহাকে ভোগ দেওয়া হয়, অথচ তিনি কতবড় মহাত্মা ছিলেন। বাংলাদেশে বামাক্ষ্যাপা সম্বন্ধেও নানা গল্প আছে। এগুলি গল্পও হইতে পারে আবার সত্য ঘটনাও হইতে পারে। বামাক্ষ্যাপা খুব মদ খাইতেন এবং পাগলের মত থাকিতেন। একবার কালীপূজো করিবার জন্য তাঁহাকে তারাপীঠের তারা মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি নাকি পূজার আয়োজন করিবার সময় প্রস্রাবের বেগ হইলে ঐ মন্দিরে বসিয়াই প্রস্রাব করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া লোক তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার পরই দেবী স্বপ্নে জানান যে তিনি দুই দিন যাবৎ কোন ভোগ গ্রহণ করিতেছেন না, কারণ তাঁহার ভক্ত বামাক্ষ্যাপাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর হইতেই লোকে নাকি বামাক্ষ্যাপাকে খুব ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। কাজেই এই সব মহাত্মারা যে গাজা বা মদ খাইতেন উহাকে নেশা করা বলা চলে না। তাহা ছাড়া বীরাচার বলিয়াও সাধনের একটি পথ আছে ত? বীরাচারীরা যে মদ ইত্যাদি ব্যবহার করেন তাহাতে মদের অবগুণ থাকে না। তাঁহারা নিজ শক্তি দ্বারা দ্রব্যের গুণ নষ্ট করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহাদিগকে বীর বলা হয়। সকল পথেই ভগবানকে পাওয়া যায় যদি ঠিক ঠিক ভাবে তাঁহাকে পাইবার আগ্রহ থাকে।

মহাত্মাদের ক্রোধ এবং মোহ হয় কিনা ?

ভদ্রলোক—মহাত্মাদের কি ক্রোধ হয় ?

মা—পিতাজী, মহাত্মা যখন বলিতেছ তখন আর তাঁহাদের ক্রোধ হয় কেমন করিয়া ? লোভ, ক্রোধ এ সব ত সাধারণ মানুষের হয়। ক্রোধ, লোভ কাহারও মধ্যে থাকিলে আর তাহাকে মহান বলা যায় কিরূপে ? তবে এ বিষয়েও নানা দিক আছে। যেমন বিশ্বামিত্র এবং দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিদের ক্রোধের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কেহ কেহ আমাকে এরূপ প্রশ্নও করিয়াছে, "মা, তুমি বল যে রাগ করা খুব খারাপ, কিন্তু দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিদের রাগ করিতে দেখা যায়।" এ সব ঋষিদের রাগ অবশ্য সাধারণ লোকের রাগ হইতে ভিন্ন। তাহারা যেমন রাগ করিতেন আবার তাহারা ইচ্ছা করিলে সৃষ্টিও করিতে পারিতেন। তোমরাও যদি কথায় কথায় সৃষ্টি করিতে পার তবে তোমাদের পক্ষেও রাগ করা অন্যায় হইবে না। তাঁহাদিগকে রাগ করিয়া কাহারও যে ক্ষতি করিতে দেখা যাইত বাস্তবিক পক্ষে উহা ক্ষতি নয়। কাহারও মঙ্গল করিবার জন্যই তাঁহারা রাগ দেখাইয়া তাহাকে শাস্তি দিতেন। যাহাদের দ্বৈতজ্ঞান আছে, যাহারা কাহারও ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ক্রোধ করে তাহাদের পক্ষে কিন্তু উহা ক্ষতিই করিয়া থাকে, কারণ জগতের বিধান এমন সুন্দর যে কেহ দুষ্কর্ম করিলে তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়ই হয়।

তোমরা তোমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাও যে নারদের মোহ হইয়াছিল, শিবও মোহিনীর পাছে পাছে দৌড়াইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া তোমাদের মনে হইতে পারে যে নারদ এবং শিব সাধারণ মনুষ্য হইতে পৃথক কি সে ? এই সকল গল্পের অর্থ এ ভাবেও করা যায় যে সাধন পথে অগ্রসর হইতে গিয়া নিজের মধ্যে কাম, ক্রোধ, মোহ দেখিয়া হতাশ হইতে নাই। কারণ নারদাদি ঋষির মধ্যেই যদি ঐ সব দুর্বলতা দেখা যায় তবে উহা যে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে প্রকাশ হইবে তাহাকে নিরুৎসাহ হইবার কি আছে? আমাদের লক্ষ্য হইল ঐ সব রিপু জয় ক[illegible] মায়া, মোহ পার হইয়া যাওয়া।

আবার দেখ, শিবকে বিচার করিতেছে কে? আমি কি শিবের সমকক্ষ, না শিব হইতে শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার বিচার করিব? আমি আমার দ্বৈতবুদ্ধি লইয়া শিবকে বিচার করিতেছি বলিয়াই শিব আমার নিকট বদ্ধজীবের মত বোধ হইতেছে। যতক্ষণ দুনিয়া অর্থাৎ দুই নিয়া থাকা যায় ততক্ষণ এইরূপ দ্বন্দ্ব থাকিবেই।

আবার শৈব পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিব হইতে কেহ বড় নয়; বৈষ্ণব পুরাণে বলে বিষ্ণু হইতে বড় কেহ নাই। ইহাই বা হয় কেমন করিয়া। ইহার এক উত্তর হইল এই যে যতক্ষণ ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়, ততক্ষণ ইহারা নিজ নিজ পদে বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যেও যেমন দেখা যায় যে ডাক্তারি কাজে ডাক্তার যেমন শ্রেষ্ঠ, ইঞ্জিনীয়ার নহে—ইঞ্জিনীয়ারদের কাজে ইঞ্জিনিয়ার শ্রেষ্ঠ, ডাক্তার নহে। সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে যদি শুধু সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা বলিয়া ধরা যায়, তবে ইহারা নিজ নিজ পদে বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ; কারণ ব্রহ্মার কাজ বিষ্ণু করিতে পারে না, আবার বিষ্ণুর কাজ শিব করিতে পারে না। কিন্তু শিবকে যদি কেবল সংহারের কর্তা মনে না করিয়া তাহাকে পরম শিব বলিয়া মনে করা যায়, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার—এই সকলের কর্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে কিন্তু আর দ্বন্দ্ব নাই। সেই অবস্থায় বলা যায় যে এক পরমাত্মাকেই কেহ শিব বলিতেছে, কেহ বিষ্ণু বলিতেছে। কাজেই এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এই ভাব হইতে শিবকে মোহিনীর পাছে দৌড়াইতে দেখিলে তাঁহাকে আর মোহগ্রস্ত বলিয়া মনে হইবে না। কারণ এখানে ত আর দুই নাই। এখানে যে এক পরম শিবই আছেন এবং তিনি নিজকে লইয়া খেলা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম যে দ্বৈত বুদ্ধি লইয়া বিচার করিলেই যত গণ্ডগোল, যুদ্ধ বিগ্রহ, অদ্বৈত দৃষ্টিতে এসব কিছু থাকে না।

সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

ভদ্রলোক—ইন্দ্রাদি দেবতা সম্বন্ধে যে সব গল্প আছে তাহা দেখাইয়া অনেকে আমাদিগকে বলে যে [illegible]দের দেবতা ত এইরূপ,

কিন্তু আমাদের ভগবান এমন নয়। তাহাদের ঐ সব কথার জবাব আর দিতে পারি না।

মা—কেন? তোমরা ত বলিতে পার যে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে আমাদের ভগবান ইন্দ্রাদি দেবতার মত থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ। তোমাদের ভগবান তোমরা যাহা বলিতেছ শুধু তাহাই; কিন্তু আমাদের ভগবান তোমাদের ভগবানের মত ত আছেনই, তাহা ছাড়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার মতও আছেন। কাহাকেও জব্দ করিবার জন্য যে এ কথা বলিতেছি তাহা নয়। ইহা খাঁটি সত্য। কারণ কেহ যদি ভগবানের সীমা নির্দেশ করিয়া দেয় অর্থাৎ তিনি এরূপ হইবেন না এমন বলে, তবে ত সে ভগবান জীবই হইয়া গেল। কেন না বদ্ধ ভাবকেই আমরা জীব ভাব বলি। ভগবানের কোন সীমা থাকিতে পারে না। সেইজন্য যিনি ভগবান তিনি এক হইয়াও বহু। সর্বরূপে, সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। যতক্ষণ এই অদ্বৈত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ দ্বন্দ্ব থাকিবেই থাকিবে।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। মাকে এখন বিশ্রাম দেওয়া দরকার মনে করিয়া আমরা সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

২৮শে মাঘ, শনিবার, (ইং ১১।২।৫০)

আজ বেলা ৯টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম মা তখন পর্যন্ত শয্যাত্যাগ করেন নাই। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমরা মার কাছে ছিলাম, আমরা চলিয়া আসিবার পরেও মার ঘরে লোক ছিল। খুকুনীদিদি বলিলেন যে গতকল্য রাত্রিতে মা ২টা-২।।টা পর্যন্ত শয়ন করেন নাই। ১০টা কি ১০।।টার সময় পুনরায় আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা হলঘরে বসিয়াছেন। হলঘরে দেবশঙ্করবাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। শোভন ব্রহ্মচারীও দাঁড়াইয়া মার কথা শুনিতেছেন। মাকে কি প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহা শুনিতে পারি নাই। মা বলিতেছেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেরূপ পুতুল ইত্যাদি নিয়া খেলা করে, বিগ্রহাদির পূজাও প্রা[illegible]রূপ। তবে পুতুল খেলা কিংবা সাংসারিক

বিষয়ে মত্ত থাকিলে যেমন উহাতেই চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হয়, বিগ্রহ লইয়া খেলা করিতে করিতে ভগবানের প্রতি একটা আকর্ষণ হইয়া যাইতেও পারে। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, যদি ঘটা করিয়া পূজা বা যজ্ঞ করিয়া আনন্দ লাভ করা যায় তবে উহা কিন্তু জাগতিক বন্ধনের মত একটা বন্ধন, এই বন্ধনও জাগতিক বন্ধনের মত কাটাইতে হয়। পূজা এবং যজ্ঞ করিয়া আমি ভগবানের পথে কতখানি চলিতেছি কিনা তাহার একমাত্র প্রমাণ হইল যে আমার মধ্যে বৈরাগ্য কতখানি আসিয়াছে, আমি ভগবানের জন্য কতখানি ব্যাকুল হইতে পারিয়াছি। এই বৈরাগ্য না আসা পর্যন্ত কিছুই হইবার নয়। অনেক সময় এই পূজা এবং যজ্ঞাদির মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠার ভাবও লুকানো থাকে। দশজন আসিয়া পূজা দেখুক, দশজন আসিয়া যজ্ঞ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করুক—এ জাতীয় ভাব তাহাদের মধ্যে থাকে এবং দেখাও যায় যে এই জাতীয় পূজা এবং যজ্ঞ দর্শন করিতে অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহারা এইভাবে যজ্ঞ দর্শন করিতে আসে তাহারা কিন্তু ইহার সুফলের একটু অংশ লইয়া যায়। যাহা পূজকের প্রাপ্য ছিল তাহা দর্শকের মধ্যে চলিয়া যায়, কাজেই সাধনা হিসাবে ধূমধাম করিয়া পূজা বা যজ্ঞ করা সাধকের ক্ষতিরই কারণ হয়। যাহার ভিতর বৈরাগ্য জাগিয়াছে সে এ জাতীয় কাজ লইয়া মত্ত থাকিতে পারে না। কোথায় ভগবান পাইব, কি করিলে ভগবান পাইব—এইরূপ একটা ব্যাকুলতা তাহাকে জনসঙ্ঘ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, এই জন্যই বলে, জঙ্গলে এবং নির্জনে সাধুদিগকে সাধন করিতে দেখা যায়। আবার এ পথের মজাও এমন যে, যাহার মধ্যে ভগবদ্ ভাব একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার গায়ে একটু ভগবানের স্পর্শ লাগিয়াছে—তাহার প্রতি লোক আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। গাছে আম, কাঁঠাল পাকিলে যেমন লোক ইহার গন্ধ দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করে, আম, কাঁঠালকে আর ডাকিয়া বলিতে হয় না যে তাহারা পাকিয়াছে। সেইরূপ যিনি ভগবানে আন্তরিক অনুরক্ত হইয়াছেন, তিনি নির্জন স্থা[illegible]লেও লোকে তাঁহাকে

খুঁজিয়া বাহির করে। তবে জাগতিক আনন্দ লইয়া মত্ত থাকার চেয়ে পূজা পাঠ লইয়া মত্ত থাকা কিছুটা ভাল। ইহার যে একটু সুফল না থাকে এমন নয়। তোমরাও ত (বৃন্দাবনের) অখণ্ডানন্দকে জান। তাঁহার মাতামহ খুব বড় পণ্ডিত, তিনি শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার দেখাদেখি অখণ্ডানন্দও ছোটবেলা হইতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শিখিল। পরে সে বিবাহ করিল এবং তাঁহার ছেলে মেয়েও হইল। গোরখপুরে সে যখন চাকরি করিত তখন তাহার চাকুরীর কাজও হইল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা। এইরূপ শাস্ত্র লইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। এখন ত সে সন্ন্যাসীই আছে এবং এখনও সে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, লোকে তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে ভালবাসে।

শাস্ত্রজ্ঞান এবং অনুভূতি

মা আবার বলিতে লাগিলেন, "এই যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়, ইহা যাঁহারা করেন এবং যাঁহারা শুনেন তাঁহারাও যে কি কি জাতীয় সংস্কারের লোক তাহা তাঁহাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনার রকম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যিনি জ্ঞান পথের পথিক তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্যে বিচার এবং জ্ঞানের কথাগুলি বিশেষভাবেই ফুটিয়া উঠে এবং ঐ পথের পথিকরা উহা আনন্দের সহিত শুনিতে থাকে; যিনি ভাবুক তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্যে ভাবের দিকটাই ফুটিয়া উঠে এবং বিচার বিশ্লেষণের দিকটা চাপা পড়িয়া যায় এবং শ্রোতাদের মধ্যে যাহারা ঐভাবে ভাবিত তাহারা উহা শুনিয়া খুব আনন্দ পায়। জ্ঞানীর ব্যাখ্যা শুনিয়া ভাবুক আনন্দ পায় না এবং ভাবুকের ব্যাখ্যা শুনিয়া জ্ঞানমার্গের লোকও আনন্দ পায় না। বক্তা এবং শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে এগুলি বেশ বুঝা যায়। বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া বিচারসিদ্ধ ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা একরকম, আবার অনুভূতি হইতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা অন্য রকম, অনুভূতিগুলিও কিন্তু শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

দেবশঙ্কর বাবু। হাঁ, যেগুলি আসল অনুভূতি সেগুলি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিতে বাধ্য।

মা। হাঁ, ঐরূপ মিলিলেই তবে বুঝা যায় যে অনুভূতিগুলি ঠিক ঠিক হইয়াছে। এইরূপ অনুভূতিযুক্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যাও অন্যের হৃদয় স্পর্শ করে।

আমি। মা, এখন তুমি বলিতেছ যে লোকের যাহা অনুভূতি তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় এবং ঐরূপ মিলিয়া গেলেই বুঝা যায় যে ঐসব অনুভূতি ঠিক ঠিক ভাবেই হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে একদিন তুমি বলিয়াছিলে যে লোকের যতই অনুভূতি হইবে ততই তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান বদলাইতে থাকিবে। এখানে অনুভূতি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের পার্থক্য দেখা যায়।

মা। হাঁ, তখন শাস্ত্রজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানও ত নানা প্রকার হইতে পারে। এ হল সাধারণ মনের সাহায্যে শাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান হয় তাহা এক প্রকার। এগুলি হইল সাধারণ মনের অনুভূতি। আবার বিশুদ্ধ মন দিয়াও অনুভূতি হয়, আবার গ্রন্থিভেদ হইলেও অনুভূতি হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আছে। যদিও অনুভূতিকে চারভাগে ভাগ করা হইল—এরূপ ভাগও কিন্তু অনন্ত প্রকারের হইতে পারে। যদি কাহারও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তবে দেখিবে যে তাহার কথা শাস্ত্রের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।

আমি। যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছে তাহার কথা হয়ত তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতেছেন যে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে কিন্তু তিনি নিজে জানিতেছেন যে শাস্ত্রে ঐ জ্ঞানের মাত্র আংশিক প্রকাশ আছে, পূর্ণভাবে নাই।

মা। তাহা কেন? তোমাদের শাস্ত্রে ত বলে যে সকল কথা প্রকাশ করা যায় না। এই অর্থে সে বুঝিতেছে যে শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ঠিক ঠিকই আছে। গ্রন্থিভেদ না হইলে শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। এমন অনুভূতি বা অবস্থাও আছে যখন মনে হয় আমি আবার অজ্ঞান কখন ছিলাম। আমি ত সর্বদাই জ্ঞানস্বরূপ। এরূপ যাহাদের অনুভূতি হয় তাহারা কিন্তু অজ্ঞান বা গ্রন্থি কোন কথাই

বলিতে পারিবে না। কারণ অজ্ঞান বা গ্রন্থির কথা বলিলে তখন বুঝা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে উহা আছে। আবার জ্ঞানলাভের পর যখন কেহ গ্রন্থির কথা বলে তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ গ্রন্থি তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের বাধকরূপে নাই। ভগবানকে জানাই হইল নিজকে জানা। নিজকে জানার অর্থ হইল সকলকে জানা। শুধু শাস্ত্রপাঠ করিয়া কাহারও কিছু হয় না। যদি তাহাই হইত তবে লোকে আর এত সাধন ভজন করিত না। সেইজন্য বলা হয়, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাবে।" শুধু পাঠ করিয়া যেরূপ কাহারও কিছু হয় না, সেইরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়াও কাহারও গ্রন্থিমোচন হয় না। ইহার কারণ এই যে যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন তাঁহার নিজেরও গ্রন্থিমোচন হয় নাই। তাঁহার যদি উহা হইত তবে তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যের গ্রন্থিমোচনে সাহায্য করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্য দিয়াও অন্যকে ভগবানের জন্য পাগল করিয়া দিতে পারিতেন বা ভগবানের পরশ দিয়া দিতে পারিতেন। ভগবানের একটু পরশ দেওয়া বা তাঁহার জন্য উতলা করিয়া দেওয়া বা তাঁহার জন্য পাগল করিয়া দেওয়া—সবই মুক্ত পুরুষের দ্বারা সম্ভব। সেইজন্য বলা হয় যে দীক্ষা অনেক প্রকারের হইতে পারে।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা এইবার উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত সস্ত্রীক মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা তাঁহাকে লইয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ঘরে অবশ্য অল্প সংখ্যক লোকও ছিল। কিন্তু মায়ের ঘরের কপাট বন্ধ ছিল এবং শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কা (আত্মানন্দ) বন্ধ দরজার বাহিরে বসিয়াছিলেন ইহা দেখিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ ঘুরিয়া গিয়া মায়ের ঘরের অপর এক দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। স্বামী শঙ্করানন্দ এবং আমি মায়ের ঘরে গিয়া বসিলাম। আমাদের দেখাদেখি আরও অনেকে মায়ের ঘরের মধ্যে আসিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কা যে দরজায় বসিয়া ছিলেন উহা বন্ধ থাকাতে তাঁহাকে বাহিরেই থাকিতে

হইল। কিছুক্ষণ পর যখন ঐ দরজাও খোলা হইল তখন ব্ল্যাঙ্কা ঘরে ঢুকিয়া অভিমানের সুরে মাকে বলিলেন, "আমার পরে যাহারা আসিল তাহারা ঘরে স্থান পাইল আর আমি বাহিরে বসিয়া রহিলাম।

মা। তুমি ইহাদের মত কপাট খট্ খট্ করিলে ত তোমাকেও কপাট খুলিয়া দেওয়া হইত। তোমার মুখ এত লাল কেন? কাঁদিয়াছ নাকি?

ব্ল্যাঙ্কা। না সর্দি লাগিয়েছে।

মা। সর্দির জন্য এত লাল!

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। পরে ডাঃ দাশগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ (অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্কা) ছোটবেলা হইতেই খাট কিংবা গদীতে শুইতে পারে না। দেশে যখন থাকিত তখনও মাটিতেই শুইত। ইহা দেখিয়া ইহার দিদিমা বলিত, "এ কোথাকার একটা নোংরা মেয়ে!" ইহাদের দেশে উচ্ছিষ্টের বিচার নাই। রান্না করিয়া কাহাকেও খাবার দিবার পূর্ব্বে ঐ খাবার হইতেই কতকটা মুখে দিয়া দেখে যে উহা কেমন হইয়াছে। এরূপ করিলে যে সমস্ত জিনিষটাই উচ্ছিষ্ট হইয়া যায় তাহা ইহাদের সংস্কারে নাই। ব্ল্যাঙ্কা কিন্তু ঐরূপ উচ্ছিষ্ট জিনিষ খাইতে পারিত না। ইহার জন্য তাহাকে অনুযোগও কম ভোগ করিতে হয় নাই। ছোট বেলা হইতেই এ এইরূপ শুদ্ধাচারে আছে এবং বিবাহ করে নাই। তাহার পর এই দেশে আসে। যখন হইতে এ এই আশ্রমের সংস্রবে আসিয়াছে তখন হইতেই ইহার অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। কারণ এখানে খাওয়া এবং চলাফেরা সম্বন্ধে অনেক বাছ-বিচার আছে। মনের দুঃখে এ আমাকে বলিয়াছে, "মাতাজী, আমি বিড়াল হইতেও অধম। বিড়াল ঘরে যায় আবার জঙ্গলেও যায়; আমি কিন্তু ঘরে যাইতে পারি না।" আবার বলে, "মাতাজী, আমি গঙ্গা স্নান করিলে ত গঙ্গা অপবিত্র হইয়া যাইবে না?" একদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া এ আমাকে বলিয়াছিল, "দেশে আমি যখন অন্যের উচ্ছিষ্ট খাইতে পারিতাম না, উহা দেখিয়া আমার দিদিমা বলিয়াছিল—তুই যেমন অন্যের জিনিষ খাইতে ঘৃণা বোধ করিস,

দেখবি লোকেও তোকে ঘৃণা করিবে।" এখন দেখিতেছি যে আমার দিদিমার অভিশাপ ফলিয়াছে।

একবার কিশনপুর আশ্রমে এ আমাকে বলিল, "মাতাজী ইহারা (আশ্রমবাসীরা) আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে উহা আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি তোমার কাছে না থাকিয়া আলাদা থাকিব এবং যখন সুবিধা হয় তখন তোমাকে দেখিয়া যাইব।" উহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "বেশ, তাহাই করিও।" ইহার পরই আমরা আলমোড়া চলিয়া গেলাম। দুই দিন যাইতে না যাইতেই দেখি যে এ আলমোড়া আসিয়া হাজির। বলে কিনা "আমাকে ছাড়িয়া এ থাকিতে পারে না।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন আর ব্ল্যাঙ্কাকে বলিলেন, "কি বলিলাম বুঝিতে পারিয়াছ?"

ব্ল্যাঙ্কা। হাঁ, বুঝিয়াছি।

ধৰ্ম্ম জীবনে শুদ্ধাচার

মা আবার বলিতে লাগিলেন, "লোকে যে বাছবিচার করিয়া চলে তাহাতে আমি যেমন বাধা দিই না সেইরূপ যাহারা এ সব মানে না তাহাদিগকেও আমি কিছু বলি না। লোকের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার। যাহার যেরূপ সংস্কার তাহার সেইভাবেই চলা ভাল। গাছের পাতা যদি জোর করিয়া ছিড়িয়া ফেলা যায় তবে তাহাতে গাছেরই ক্ষতি হয়। আবার ঐ পাতা যখন পাকিয়া আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে তখন গাছের কোন ক্ষতিই হয় না। ঐ সব স্থানে নূতন পাতা দেখা দেয়। সেইরূপ লোকে যদি শুদ্ধ আচার লইয়া ভগবানের দিকে চলে সে ত ভালই। কিন্তু ভগবান লক্ষ্য না হইয়া যদি শুধু আচারই লক্ষ্য হয় তবে লোকে উহাকে শুচিবায়ু বলে। আবার খাওয়া চলা বিষয়ে কেহ যদি প্রথমে শুচিতা রক্ষা না করিয়াও ভগবান লাভের চেষ্টা করে তবে ধীরে ধীরে তাহার মধ্যেও শুচিতা আসে। মুসলমান, খৃষ্টানদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোন বাছ বিচার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে মহাত্মা লোক নাই? আসল কথা হইল লক্ষ্যটি হওয়া চাই [illegible]নের দিকে। গতকালও এই জাতীয়

কথা হইতেছিল। একজন বলিতেছিল সাধুরা ভাঙ্গ, গাজা ইত্যাদি খায় কেন? তাহাকেও ঐ কথা বলিয়াছিলাম। ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে সব কিছুই খাওয়া যায়। বীরাচারীরা মদ খায় এবং তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি মদের মাদকতাগুণ নষ্ট করিতে পারেন। এইরূপ শক্তি তাঁহাদের মধ্যে আছে বলিয়াই তাঁহাদিগকে বীর বলা হয়। তাই বলি—যাহা কিছু খাইবে তাহা ভগবানকে দিয়া খাইবে। তাহা হইলে কি হইবে? খাদ্যের অবগুণগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। ঢাকার যোগেশ ঘোষকেও ঐ কথা বলিয়াছিলাম। পূর্ব্বে ত লোকের বাসায় যাইতাম। একদিন সকাল বেলায় তাহার বাসায় গিয়াছি। দেখি কি যে সে টেবিল চেয়ারে হাপ্ বয়েল (Half boiled) মুরগীর ডিম লইয়া বসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, 'আমি কি খাই তাহা দেখিতেছ ত। ইহা কি আর ভগবানকে নিবেদন করা যায়?' তখন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'হ্যাঁ, ইহাই নিবেদন করিয়া খাইও।' সে তাহাই করিতে লাগিল। শেষে তাহার এমন অসুখ হইল যে ডাক্তার তাহাকে ডিম, মাংস খাইতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। জীবনের মায়ায় সে ঐ সব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। তাই দেখ যে ভগবান লক্ষ্য হইলে তিনি কিভাবে লোককে শুদ্ধ করিয়া দেন।"

পূর্ণাহুতির পরও হুতাশনের যজ্ঞকুণ্ড ত্যাগে অনিচ্ছা

আগামীকল্য মা চলিয়া যাইবেন তাই আজ অনেকেই মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলিল। ১০টার পর আমরা আবার মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। তখন নানাকথাই হইতে লাগিল। মা নেপালদাদাকে যে একদিন বলিয়াছিলেন যে সাবিত্রী যজ্ঞ পূর্ণ হইলে কাশীক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র হইবে সেই কথাই উঠিল। মা বলিলেন, "হ্যাঁ, এ জাতীয় কথা তখন মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। তবে তখন ঠিক কি বলিয়াছিলাম তাহা এখন আসিতেছে না।" নেপালদাদা বলিলেন, পূর্ণাহুতির পর নবম দিন বিকালে মা হঠাৎ আমাকে বলি[illegible] "দেখত যজ্ঞকুণ্ডে এখনও

আগুন আছে কিনা। একখানা কাপড় উহার মধ্যে ফেলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে।” আমি গিয়া দেখি যে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে আগুন দেখা যায়। কাপড় ফেলিয়া আর উহা পরীক্ষা করিবার দরকার নাই। নয়দিন হয় যজ্ঞ শেষ হইয়া গিয়াছে। যজ্ঞকুণ্ডের প্রায় বারআনি ভস্ম লোকে নিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও কুণ্ডে আগুন দেখিয়া খুব আশ্চর্যান্বিত হইলাম। মাকে গিয়া ঐ খবর দিলে মা বলিলেন, “অগ্নি কি তবে যাইতে চান না?” লোক ডাকিয়া রাতারাতি কন্যাপীঠের মধ্যে একটি ছোট কুণ্ড করা হইল এবং পরদিনই যজ্ঞকুণ্ড হইতে আগুন নিয়া ঐ নূতন কুণ্ডে অন্নপূর্ণার ভোগ রান্না হইল। এখনও যজ্ঞাগ্নি দিয়াই অন্নপূর্ণার ভোগ রান্না করা হইতেছে। শুনিয়াছি যে পুরীতেও যজ্ঞের আগুন দিয়া জগন্নাথদেবের ভোগ পাক হয়।”

গভীর রাত্রিতে আশ্রমে বেদধ্বনি

মা আবার বলিলেন, “গত রাত্রিতে প্রায় ১১।টার সময় ঘরে শুইয়া আছি তখন শুনিতে পাইলাম যে বেদপাঠের শব্দ হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা এই শব্দও হইতেছে। বাটু হাত নাড়িয়া যে সূরে বেদ পাঠ করিত এ সুরও সেইরূপ।” ইহা শুনিয়া খুকুনিদিদিও আমাদিগকে বলিলেন, “হাঁ উহা আমিও শুনিয়াছি। উহা শুনিয়া আমি কমলকে ডাকিলাম, কমলা বলিল যে সেও উহা শুনিতেছে। কিন্তু আশ্রমের কোথা হইতে যে এ শব্দ আসিতেছে তাহা বুঝা গেল না। প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রী বলিলেন যে তিনি গুহাতে শুইয়া থাকেন, সেখানে তিনি এই শব্দ শুনিয়াছেন।” মা নেপালাদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিও শুনিয়াছ নাকি”? নেপালদাদা আশ্রমের দোতালায় থাকেন। তিনি বলিলেন, “আমি গভীর রাত্রে শঙ্খ ঘন্টার শব্দ পাইয়াছি, কিন্তু বেদ পাঠের শব্দ শুনি নাই।” আশ্রমে আরও দুই একজন শঙ্খ ঘন্টার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমান ভূপেন বলিল, “এই সব কথা শুনিয়া ভয় হইতেছে”। তাহার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

ঢাকার বুড়াশিবের কাশী আশ্রমে পুনঃ প্রতিষ্ঠা

রাত্রি ১টা বাজিল দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মাও আমাদের সঙ্গে উঠিয়া একখানা সাদা কম্বল গায়ে দিয়া চত্বরের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শেষে যেখানে ঢাকার শিব স্থাপিত হইয়াছে—সেই দিকে গিয়া বলিলেন, "অন্য শিব আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ইনি কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই স্থান জুড়িয়া বসিয়াছেন"। যে শিবকে লক্ষ্য করিয়া মা ঐ কথা বলিলেন, তাঁহার একটু ছোট ইতিহাস আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পুষ্করিণী সংস্কার করিতে গিয়া একটি বড় শিব পাওয়া যায়। আমার বন্ধু মনোমোহন (শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ) সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুয়ার্ড ছিল। এইসব সংস্কারাদি কার্য তাহার হাতেই ছিল। পুষ্করিণীর মধ্যে এই শিবটি পাওয়া গেলে মনোমোহনের মনে হইল যে এই শিবটিই হয়ত ঢাকার প্রসিদ্ধ বুড়া শিব। মুসলমানদের অত্যাচারের সময় বোধ হয় ইহাকে পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া রক্ষা করা হয়। কারণ এই পুষ্করিণীর ধারে একটি শিব মন্দির আছে এবং ঐ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই। পরে মুসলমানদের অত্যাচার কমিয়া গেলে জগন্নাথ হল হইতে নাতি দূরে বর্তমান বুড়াশিবের মন্দির স্থাপন করা হইয়া থাকিবে। অবশ্য এ সমস্তই মনোমোহনের অনুমান মাত্র। পুকুর হইতে এই শিবটি উদ্ধার হইলে পর সে ইহাকে নিজ বাড়ীতে নিয়া একটি বেলগাছের নীচে রাখিয়া দিল এবং প্রত্যহ ইহাকে বিল্বপত্র ও জল দ্বারা সেবা করিতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য যখন তাহাকে বাড়ী ত্যাগ করিতে হইল তখন ঐ শিবটি আনিয়া সে ঢাকার শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে রাখিল। এখানেও ইহাকে পঞ্চবটীর বেলগাছের নীচে রাখা হইল। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত ইহাকে এবার ঢাকা হইতে কাশীতে আনা হইয়াছে। মনোমোহনের ছেলে শ্রীমান সরোজই এবার যজ্ঞোৎসবের মধ্যে এই শিবকে ঢাকা হইতে কাশী আনিয়াছে। এতবড় একটি শিবমূর্তি বর্তমান সময়ে পাকিস্তান হইতে সরাইয়া আনা যে কত ব্যয়সাধ্য এবং দুষ্কর কার্য তা[illegible]মাত্র বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক এই শিব আসিয়া কাশী পৌঁছিলে, পূর্ণাহুতির দিন মা ইঁহাকে কাশীর আশ্রমে স্থাপন করিতে বলিলেন। এবারও ইঁহাকে বেলগাছ এবং রুদ্রাক্ষ গাছের নীচে স্থাপন করা হইল। আশ্রমে স্থাপিত হইবার জন্য আরও দুইটি শিবলিঙ্গ (স্বয়ম্ভু-বিশ্বনাথ) তৈয়ার হইয়া আছেন। কিন্তু অকাল বলিয়া এ বৎসর তাঁহাদিগকে স্থাপিত করা হইল না। এই শিবটি আসিলে কাশীর পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে কাশীতে শিব স্থাপন করিতে কাল অকালের বিচার নাই এবং সংক্রান্তি দিন শিব স্থাপন করিলে দিনক্ষণও দেখিতে হয় না। সেজন্য ইহা পৌষ সংক্রান্তি দিন আশ্রমে স্থাপিত হইয়া গেলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া মা শুইতে গেলেন, আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কাশীতে শিবলিঙ্গদ্বয়ের স্থাপনা
এবং
ব্রহ্মচারীগণের সন্ন্যাস গ্রহণ

(তিন)

৪ঠা চৈত্র, শনিবার (ইং ১৮।৩।১৯৫০)

মা অসুস্থ শরীর নিয়া হরিবাবার আগ্রহেই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া মার অসুস্থতা বাড়িয়া গেল। হরিবাবা নিরুপায় হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে যেখানে থাকিলে মা সুস্থ থাকেন—সেইখানে গেলে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। এইজন্য ২৬শে ফাল্গুন মা বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া ২৭শে ফাল্গুন বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিলেন। আজ সন্ধ্যাবেলা মা বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীমান ভূপেন গত একমাস যাবৎ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতেছে। আজ ইহা শেষ হইল। ইহা উপলক্ষ্য করিয়াই মা একদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আগামীকল্যই আবার বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যাইবেন।

ভগবানের নিকট বৈষয়িক প্রার্থনা

সন্ধ্যার পর আমি মার কাছে গিয়া বসিলাম। মায়ের ঘরে স্ত্রী-পুরুষ আরও অনেকে ছিলেন। রামঠাকুর মহাশয়ের এক শিষ্য মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মা, আপনার নিকট বিন্ধ্যাচলে আমি এক পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার উত্তর ত পাইলাম না।"

মা। পত্রে কি লিখিয়াছিলে?

ভদ্রলোক। আমার এক বন্ধুর চক্ষু খারাপ হইয়াছে এবং আর এক বন্ধু অর্থ কষ্টে পড়িয়াছে—এই দুই জনের বিষয়েই লিখিয়াছিলাম।

মা। এ জাতীয় কথার কোন উত্তর হয় না বলিয়াই উত্তর পাও নাই (সকলের হাস্য)। দেখ, ভগবানকে বলিলেই যদি অর্থকষ্ট চলিয়া যাইত তবে জগতে আর কেহ দরিদ্র থাকিত না। তবুও তোমাদিগকে বলি যে অর্থ, রোগ বা অন্য কিছুর জন্য যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয় তবে ভগবানকেই বলিও। কাহাকে কোন পথ দিয়া যে ভগবান তাঁহার দিকে টানিতেছেন তাহা বলা শক্ত। অর্থের জন্য ভগবানকে ডাকিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় না এমন নয়, অর্থও পাওয়া যায়; অনেক সময় রোগও সারিয়া যায়, আবার যায় ও না। তোমরা ছোট ছোট ছেলেপেলেদিগকে কাছে আনিবার জন্য অনেক সময় যেমন এমনি সব জিনিষ দেখাও যাহা তাহাদিগকে দেওয়া যায় না; কিন্তু ঐ জিনিষের লোভেই যেমন তাহারা কাছে আসে, সেইরূপ ভগবানও লোকদিগকে তাঁহার কাছে আনিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। অর্থের জন্য ভগবানকে ডাকিয়া পরমার্থ পাওয়া যায়। একবার ভগবানকে পাইলে আর পাওয়ার কি বাকী থাকে? সেইজন্য বলিতেছি যে কিছু পাইবার জন্য তোমরা ভগবানকে ডাকিও, উহাতেই তোমাদের সমস্ত অভাব চলিয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীমায়ের শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে

ইহার পর বৃন্দাবনে মার শরীর যে কিরূপ খারাপ হইয়াছিল সেই সব কথা মা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "সেখানে কিছুই খাইতে পারিতাম না, যাহা খাইতাম তাহাই অম্বল হইয়া যাইত। সাতদিন পর্যন্ত শুধু জল খাইয়া থাকা হইল কিন্তু তাহাতেও অম্বল হওয়া বন্ধ হইল না। এদিকে হরিবাবা কাশীতে থাকিতেই আমার অসুখ দেখিয়া নিজে [illegible]ত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। শুধু ফল, দুধ এবং তরকারী সিদ্ধ [illegible]

বৃন্দাবনে গিয়া [illegible] আরোগ্যের জন্য [illegible]পাঠ, রামায়ণ

পাঠ ইত্যাদি কত কিছু করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন গঙ্গা (দিদি) আমাকে বলিল, 'মা, আজ ছয়মাস হয় রোগকে তুমি তোমার কাছে রাখিয়াছ। এতদিন ত তুমি আমাদের কাহাকেও তোমার কাছে থাকিতে দেওনা'। বাস্তবিক এতদিন যাবৎ যে প্লেগ চলিতেছে ইহা আমার খেয়ালেই ছিল না। তোমরা ও আমাকে রোগী বল, আমিও রোগের নেশায় থাকি; কিন্তু কতদিন যে হইয়া গেল তাহাত আর খেয়াল নাই, যখন ঐরূপ অম্বল হইতেছিল এবং মাঝে মাঝে বমি হইতেছিল তখন একদিন গিয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া ডাল, ভাত এবং ঝাল-চচ্চরি ইত্যাদি খাইলাম, এত খাইলাম যে উহা তিনজন লোকের পক্ষেও খাওয়া শক্ত ছিল। কিন্তু সেদিন আর অম্বল হইল না এবং ঐদিন হইতেই রোগের মোড় ফিরিল। এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা ও অম্বল হয় তবে উহা পূর্ব্বের মত নয়। গত দুইদিন যাবৎ শরীর ভালই যাইতেছে; দুই দিনে যে এতটা ভাল হইবে তাহা তোমরা আশা করতে পার না। আগের অবস্থা দেখ নাই, তখন দেখিলে দেখিতে যে পায়ের রং একেবারে কাল হইয়া গিয়াছিল।"

পূর্ব্ববঙ্গের দুরবস্থার কথা

কথায় কথায় পূর্ব্ব বাংলার দুরবস্থার কথা উঠিল—মুসলমানেরা পশ্চিম পাঞ্জাবে যেরূপ নৃসংশভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, পূর্ব্ব বাংলাতেও সেইরূপ আরম্ভ হইয়াছে। হত্যা, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, ধর্ম্মান্তরকরণ সমস্তই অব্যাহত ও সমষ্টিভাবে চলিতেছে। হাজার হাজার লোক প্রাণভয়ে মাত্র পরিধেয় বস্ত্র সম্বল করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ভারতের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মা বলিলেন, "দেশের সকল জায়গাতেই অশান্তি চলিতেছে। বৃন্দাবনে গত দোল পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে দেশের এই দৃশ্য ফুটিয়া উ[illegible]লে। [illegible] থায়ও আগুন লাগিলে যেম[illegible] হইতে আকাশে এক [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও [illegible]কটা [illegible]রূপ। ভাব এব[illegible]টা প্রকাশ। তোমরা

কাহারও উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে যেমন ভয়ে শিহরিয়া উঠ, এ শরীরে উহা দেখিয়া সেইরূপ হইতেছিল। এ শরীর নিজেই ঐরূপ কার্য করিতেছিল এবং উহা দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিতেছিল।

আমি। দোল পূর্ণিমার দিন কেন? উহার পূর্ব্বে যখন এখানে ছিলে তখন একদিন রাত্রিতে হঠাৎ তুমি 'বংশাল', 'বংশাল' বলিতেছিলে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে ঢাকায় বংশাল বলিয়া কোন জায়গা আছে কিনা, তখনই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে ঢাকায় বোধহয় গণ্ডগোল হইতেছে। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ দিনই রমণার কালীবাড়ী আক্রমণ করিয়া প্রতিমার অঙ্গহানি করিয়াছিল।

মা। হাঁ, কখনও কখনও হঠাৎ মুখ হইতে কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা না হইলে ত এইরূপ কত কিছু সর্ব্বদাই দেখা হইতেছে।

আমি। মা, পাপ কি শুধু হিন্দুরাই করিয়াছে, যে জন্য কেবল তাহাদের উপরই এইরূপ চূড়ান্ত ভোগ আসিতেছে?

মা। উহাদেরও (অর্থাৎ মুসলমানদেরও) ভোগ হইতেছে। সেদিন কমলাকান্ত এবং পরমানন্দ মির্জাপুর যাইতে পথে দেখিতে পাইল যে কুকুর একটি রক্তাক্ত মানুষের মাথা লইয়া টানাটানি করিতেছে।

আমি। তুমি নাকি বলিয়াছ যে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য?

মা। না, এরূপভাবে আমি বলি নাই; তবে যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা ভিন্ন শান্ত হইবার নয়, পাকিস্তান ত যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছেই এবং ইংরেজ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে।

আমি। শুধু পাকিস্তানই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আমাদের দিক হইতে কোন আয়োজন দেখা যায় না।

মা। (অস্পষ্টভাবে) [illegible]হারাও কিছু কিছু তৈয়ার হইতেছে। দেখ, ইংরাজরা ধর্ম্মের উপ[illegible]হাত [illegible] নাই; কিন্তু এখন ধর্ম্মস্থানগুলি আক্রমণ করা হইতে[illegible] ভাল হইবে না। ধ[illegible]জের

বক্ষস্থল স্বরূপ। ধর্ম্মের উপরেই সমাজ বাঁচিয়া আছে।

আমি। এখন কেন? মুসলমানেরা ত চিরদিনই ধর্ম্মের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে?

মা। তাহার জন্য কি উহাদের ভোগ কম হইয়াছে?

২রা বৈশাখ শনিবার (ইং ১৫।৪।৫০)

আজ বিকালে দেরাদুন এক্সপ্রেসে মা কাশী আসিয়াছেন। সঙ্গে অখণ্ডানন্দজী, কৃষ্ণানন্দজী, স্বরূপানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মারা ও সোলনের রাজাসাহেবও আসিয়াছেন। আগামী ৭ই বৈশাখ আশ্রমে দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই উপলক্ষ্যেই শ্রীশ্রীমা এবং সাধুদের আশ্রমে আগমন। ১৩৫২ সনে যখন আশ্রমের ভিত্তি খনন করা হয় তখন ভূগর্ভে দুইটি শিবলিঙ্গাকৃতি প্রস্তর আবিস্কৃত হয়। খুকুনীদিদি মায়ের নির্দেশ মত শিল্পীর দ্বারা লিঙ্গ দুইটি সংস্কৃত করিয়া উহা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখিয়া দেন। গত বৎসর বৈশাখ মাসেই উহা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা ছিল এবং বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ উড়িয়া বাবা ঐ লিঙ্গ এখানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য এবং গত বৎসর অকাল ছিল বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য এবার বিধি পূর্ব্বক উহা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আশ্রমে পৌঁছিয়াই সাধুরা কে কোথায় থাকিবেন তাহা মা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। পথশ্রম সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। সাধুরা হলঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে মা তাহাদিগকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুসারে সকলেই স্নানাহারের জন্য উঠিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও হলঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে এবং উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহা[illegible] আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

[illegible]ব পর মা চত্বরের [illegible]সিলেন। তখন নানা কথা[illegible] লাগিল। ডা[illegible]দাশগুপ্তের জামাতা

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তা কিছু হইল। তিনিও একজন ডাক্তার এবং ডাক্তারের অধিকার লইয়া তিনি মাকে উপদেশাত্মক অনেক কিছু কথা বলিলেন। মা আমাদিগকে বলিলেন, 'এবার আমি একাই বোধহয় ইন্‌জেকশন না লইয়া কুম্ভমেলায় গিয়াছিলাম। গোপনে হয় ত কেহ কেহ যাইতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে আমি ব্যতীত হয়ত আর কেহ যায় নাই। যখন কিষণপুরে শুনিলাম যে ইন্‌জেকশন না লইয়া কেহ হরিদ্বারে যাইতে পারিবে না তখন বলিয়াছিলাম যে যদি তাহাই হয় তবে স্নানের সময় হরিদ্বারে গিয়া ঘুরিয়া আসিব। ঐ সময় নাকি ইন্‌জেকশন না লওয়ার বাধা থাকে না। একথাও অবশ্য বলিয়াছিলাম যে যদি খেয়াল হয় তবে ইন্‌জেকশন লইয়াই হরিদ্বারে যাইব। যাহা হউক গিরীন[১] যখন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া বলিল যে এ শরীর কখনও ঔষধ খায় নাই বা ইন্‌জেকশন লয় নাই তখন তাহারা ইন্‌জেকশন ছাড়াই আমাকে হরিদ্বারে যাইতে অনুমতি দিল। এই সময় ডাক্তার জামাতাবাবু বলিলেন, "আমার মতে আপনার ইন্‌জেকশন লওয়াই উচিত ছিল।"

মা। কেন?

[illegible] উহা লওয়া ভল, কারণ যত সাবধানে থাকা যাক্ না কেন, [illegible] ঐ রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করে তা বলা শক্ত।

মা। এ শরীরের পক্ষে ইন্‌জেকশন লওয়া যে উচিত নয় তাহা তোমার শ্বশুরও বলিয়াছে। কেন উচিত নয় তাহা তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিও। তবে তোমাকে ইহা বলিতেছি যে যদি কেহ জন্মাবধি দীর্ঘকাল কোন ঔষধ গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইলে ঐ ঔষধের গুণ তাহার মধ্যে উগ্রভাবে প্রকাশিত হইতে পারে এবং ঔষধের সেই উগ্রতা নিয়মিত করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

ডাক্তারবাবু ইহার [illegible] না দিয়া বলিলেন—"আমি আর একটি কথা বলতে চাই। [illegible] তে ঘুরিয়া আসিয়া আপনি খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া[illegible] আপনার এখন বিশ্রাম [illegible]

---

১. ডাঃ গিরীন্দ্র মিত্র [illegible] ২৫।

দরকার।

মা। ঘুরা ফিরিতে আমার শ্রান্তি—

ডাক্তার। আপনার কথা বলিতেছি না অন্য যাহারা আপনার সঙ্গে—

মা। এ শরীরের কাছে যে 'অন্য' বলিয়া কিছু নাই।

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। যাহা হউক এইভাবে কিছুক্ষণ আলাপ হইলে খুকুনী দিদি আসিয়া মাকে ডাকিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। আমরা চত্বরের উপর বসিয়া রহিলাম। এমন সময় শ্রীমতী বুনী আসিয়া আমাকে বলিল, "মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" ইহা শুনিয়া আমি মার ঘরে গেলাম। ঐ ঘরে বন্ধুবর মনোমোহন এবং খুকুনী দিদিকে দেখিতে পাইলাম। মা তাঁহার শয্যার উপর বসিয়া আছেন। কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমি মাকে প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শিবলিঙ্গদ্বয় সূক্ষ্মে দর্শন

মা তখন শিবপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতে ছিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা এই দুইটি শিবলিঙ্গই কি আশ্রমে পাওয়া গিয়াছিল?"

মা। হাঁ, তবে যখন ইহা পাওয়া যায় তখন ইহা দেখিতে ঠিক শিবলিঙ্গের মত ছিল না। পাথর দুইটি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে কেহ শিবলিঙ্গ তৈয়ার করিতে গিয়া উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পরে ইহাদিগকে কারিগর দ্বারা সুডৌল ও মসৃণ করা হইয়াছে। দেখ, কেমন মজা! একজন শিব প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া শিবলিঙ্গ তৈয়ার আরম্ভ করিয়া উহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, পরে ইহাদিগকে কারিগ[illegible] অন্য একজন আসিয়া এতদিন পরে আবার ঐ শিবকে ভাল [illegible] তাঁহা[illegible]রিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছে। [illegible] ও এক কথা—গত ব[illegible] একটি কাশ্মীরী মহিলা [illegible]মে আসিয়া এই ঘরে[illegible] করিতে চায়। স্ত্রীলোকটি বি[illegible] জমিদারির মা[illegible] খুকুনী তাহাকে এ ঘরে

কিছুতেই থাকিতে দিবে না। খুকুনী বলিয়াছিল, "হউক না সে জমিদার, কিন্তু তা'ই বলিয়া যে, যা'কে তা'কে মায়ের ঘরে থাকিতে দিব তাহা হইতে পারে না।" আমি তখন খুকুনীকে বলিয়াছিলাম, "থাক্ না ও এই ঘরে। ইহা ত আর আমাদের কোন কাজে আসিতেছে না, আমরাও ত এখন অন্যত্র যাইব।" তখন খুকুনী ইহাকে এই ঘরে থাকিতে দিতে সম্মত হইল। আমরা এলাহাবাদ ঘুরিয়া যখন আবার এখানে আসিলাম তখন উহার নিকট এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে এক স্বপ্ন বিবরণ শুনিতে পাইলাম। সমস্ত ঘটনাটি এখন আমার খেয়ালে আসিতেছে না, তবে সেই মহিলাটি এখন ঐ আশ্রমে আছে। তাহার মুখ হইতেই তোমরা এই ঘটনাটি শুন।

এই বলিয়া ঐ মহিলাটিকে ডাকিবার জন্য মা খুকুনী দিদিকে বলিলেন। দিদি তাহাকে ডাকিয়া ঘরের মধ্যে আনিলে মা তাহাকে তাহার স্বপ্ন বিবরণ বলিতে বলিলেন। মহিলাটি যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর আশ্রমের মধ্যে গিয়াছেন। সেখানে এক যজ্ঞ হইতেছে। যজ্ঞকুণ্ডের চারিপাশে বসিয়া ব্রহ্মচারীগণ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন। ঐ আশ্রমের একটি প্রকোষ্ঠে দুইটি শিবলিঙ্গ বসান আছে কিন্তু তাঁহাদের কোন পূজা হয় না। স্বপ্নযোগে মহিলাটি আশ্রমে তিনটি মহাত্মাকেও দেখিতে পান। তন্মধ্যে একটির মাথায় বৃহৎ জটা। মহিলা মহাত্মার নিকট নিবেদন করেন, "আমি এখন যাহাতে সংসার হইতে অব্যাহতি পাই আপনি দয়া করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিন।" মহাত্মা যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কেন। তোমার সাংসারিক অবস্থা ত ভালই।" তখন মহিলাটি বলিল, "সংসা[illegible] ভোগ আমি যথেষ্ট করিয়াছি। এখন আর উহা আমার ভাল লা[illegible]কে উহা হইতে অব্যাহতি চাই।" তখন ঐ মহাত্মা বলিলে[illegible]দ্র মাসে তুমি শান্তির [illegible] পাইবে।" ইহার পর ম[illegible] ২৫[illegible] ভাঙ্গিয়া যায়। [illegible]

করিয়া দেখিলেন যে ভাদ্রমাসে তাহার শান্তির পথ পাওয়ার কথা, তাহা আসিতে তখনও বার মাস বাকী। এই বিলম্ব তাহার অসহ্য বোধ হওয়ায় তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া গতবৎসর কাশীতে উপস্থিত হইলেন। কাশীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখিতে দেখিতে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে পদার্পণ করিয়াই তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন কারণ ইহাই তাহার স্বপ্নদৃষ্ট আশ্রম। স্বপ্নে যেখানে যেভাবে তিনি যজ্ঞ হইতে দেখিয়া ছিলেন এখানেও ঠিক সেইখানে সেইভাবে যজ্ঞ হইতে ছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি মন্দিরে তিনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট শিবলিঙ্গ দুইটিও দেখিতে পাইলেন। পরে যজ্ঞ সমাপনের সময় মহাত্মা ত্রিবেণীপুরী ও আরও একটি সাধুকে দেখিয়া তিনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা বলিয়া চিনিয়াছিলেন; কিন্তু দীর্ঘ জটাযুক্ত যে মহাত্মা তাঁহাকে শান্তির বাণী শুনাইয়া ছিলেন তাঁহাকে তিনি এখন পর্যন্তও দেখিতে পান নাই। যাহা হউক এইসব দর্শন করিয়া এবং শ্রীশ্রীমার সঙ্গলাভ করিয়া ইনি খুবই তৃপ্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত শিবলিঙ্গ দুইটি প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজ হইতেই কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। মহিলাটি যখন আমাদের নিকট এই গল্প করিতেছিলেন মা উহা শুনিয়া খুব হাসিতে ছিলেন এবং আমি যে সব হিন্দী কথা বুঝিতে ছিলাম না মা আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিতেছিলেন। এই সময়ে খুকুনীদিদি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্বপ্নে এখানে এত মহাত্মা দেখিতে পাইলে আর মাকে কি দেখিতে পাইলে না?" মহিলাটি উত্তর করিলেন, "মাকে আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছি।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। তখন খুকুনীদিদি আমাকে বলিলেন, "যে [illegible]াবে শিবলিঙ্গ এখানে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটু বিবরণ [illegible] তাঁহা[illegible]খ ইহা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত [illegible]ইবে তাহা একটি কাগজে [illegible], উহা তাম্র পাত্রে খুদিয়া [illegible]ব মধ্যে রাখিয়া তাহ[illegible]ঙ্গ স্থাপন করা হইবে।" [illegible] হইয়া মাকে প্র[illegible]নয়া আসিলাম।

৩রা বৈশাখ, রবিবার (১৬।৪।৫০)

সকাল ১০টার সময় আশ্রমের হলঘরে স্বামী অখণ্ডানন্দজী গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীমা পাঠে উপস্থিত ছিলেন। এই পাঠের সংবাদ না জানার জন্য বাহিরের বেশী লোক উপস্থিত ছিলেন না। অখণ্ডানন্দজী সুবক্তা কাজেই তাঁহার ব্যাখ্যা সকলেরই খুব চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। বিকাল ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত তিনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষতঃ উদুখল বন্ধন আলোচ্য বিষয় ছিল। এবেলাও স্বামীজীর বক্তৃতা খুবই সুন্দর হইয়াছিল এবং সকাল হইতে শ্রোতাদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল।

৫ই বৈশাখ, মঙ্গলবার (ইং ১৮।৪।৫০)

আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ নানাস্থান হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। পাঠ এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদির সময়ও এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবধূতজী বেলা ৯।।টা হইতে ১০টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন। ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত অখণ্ডানন্দজী গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১১টা হইতে ১১।।টা পর্যন্ত চারুবাবু শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠ করেন। বিকাল ৪।।টা হইতে ৫টা পর্যন্ত অবধূতজী বক্তৃতা করেন। ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত অখণ্ডানন্দজী ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাঁহার শ্রোতার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইতিমধ্যে "আনন্দময়ী সঙ্ঘ" নামে একটি সমিতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা মায়ের যে সব আশ্রম একদিন ব্যক্তি বিশেষের নামে ছিল—তৎসমুদয় সঙ্ঘের সম্পত্তি হইল। আজ বিকালে উক্ত সঙ্ঘের [illegible] সভার অধিবেশন করিয়া স্থির করেন যে সোলনের রাজ[illegible] সঙ্ঘের সভাপতি, খুকুনী দিদি এবং জষ্টিস্ এস, আর, দ[illegible]কে সহ-সভাপতি; শ্রীযুক্ত আশু[illegible] ভট্টাচার্য এবং শ্রীমান কুসু[illegible]ণানন্দ) যথাক্রমে সে[illegible] এবং সহকারী সেক্রেটা[illegible]লেদাদা কোষাধ্য[illegible]

সন্ধ্যার সময় দিল্লীর সুধীর (সরকার) বাবু কীর্তন গান করিলেন। আগামী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নেপাল দাদা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সেইজন্য তাহার নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু ছিল, তাহা তিনি আজ আশ্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতেই এইসব দান কার্য সম্পন্ন হইল।

৬ই বৈশাখ, বুধবার (ইং ১৯।৪।৫০)

আজ আরও ভক্ত সমাগম হইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে গোপাল (চট্টোপাধ্যায়) দাদা আসিয়াছেন। স্বামী শরণানন্দ আসিয়াছেন। ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম, দিল্লী হইতে ডাঃ জে, কে, সেন এবং দেরাদুন হইতে শের সিং আসিয়াছেন। আগামী কল্য ছয় জন ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস হইবে। ইহার মধ্যে নেপাল দাদার দণ্ডী সন্ন্যাস, মৃন্ময় এবং স্বরূপ ব্রহ্মচারীর পরমহংস সন্ন্যাস এবং শিবানন্দ, প্রকাশ এবং কেশব ব্রহ্মচারীর অবধূত সন্ন্যাস হইবে। যাঁহাদের অবধূত সন্ন্যাস হইবে তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই আজ সারাদিন শ্রাদ্ধাদি করিলেন, সন্ধ্যার সময় নেপাল দাদা হোম করিলেন। এই হোমের সময় শ্রীশ্রীমা এবং অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ কিছুক্ষণ হোমের স্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যহ যেরূপ পাঠ, কীর্তন হয়—আজও তাহাই হইল।

আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা

৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার (ইং ২০।৪।৫০)

আজ আশ্রমে দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ইঁহাদের নাম রাখা হইয়াছে স্বয়ম্ভূ, বিশ্বনাথ। সকাল বেলা হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বাসন্তী পূজার মন্দিরে বেদী তৈয়ার করা হইয়াছে এবং ঐখানে শিবলিঙ্গ দুইটিকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। বেলা ৮টার সময় যখন আশ্রমে গেলাম তখন দে[illegible] পূজার মন্দিরের সম্মুখে [illegible]কটি সুন্দর চতুর্দোল ফু[illegible] তাঁহা[illegible] সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। [illegible]রে জরির কাজ কর[illegible] শয্যাদি বিছাইয়া দেওয়া [illegible] ভক্তগণ উৎসাহে [illegible] শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর

হর” বলিয়া কীর্তন করিতেছে। শ্রীশ্রীমাও ঐখানে উপস্থিত। একটু পরে শিবলিঙ্গ দুইটিকে ঐ চতুর্দোলের মধ্যে বসাইয়া ভক্তগণ ভ্রমণের জন্য বাহির হইলেন। পান্ডেজী এবং শেরসিং প্রভৃতি ভক্তগণ পতাকা হস্তে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গোপাল দাদা প্রভৃতি শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। ভক্তগণ শিবনাম কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। এই শোভাযাত্রা বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া ভাদাইনী ঘুরিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। বেলা প্রায় ১।টার সময় শিবলিঙ্গ দুইটিকে স্নান করান হইল। বিল্বপত্র চূর্ণ, আমলকী চূর্ণ, তিল চূর্ণ, ভস্ম, ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা এই স্নান কার্য চলিল। প্রত্যেক শিবের মাথায় কলসী কলসী গঙ্গাজল ঢালা হইল—সাধুগণ সহ শ্রীশ্রীমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই স্নান দেখিতেছিলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শিবনাম কীর্তন করিতেছিল। শিবলিঙ্গ দুইটিকে বাসন্তী মন্দিরে আনিয়া বেদীর উপর বসান হইল। কিছুক্ষণ পূজাদি করিয়া দোতালায় স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি মন্দিরে শিবলিঙ্গ দুইটি প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

এই শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আজ আমরা আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম।

বিকালে রোজকার মত পাঠাদি হইল। তবে আজিকার বিশেষত্ব এই যে দুইর্জন নবাগত মহাত্মা বক্তৃতা করিলেন। একজন হইল মণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দপুরী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এক শিষ্য কিংবা ভক্ত। মণ্ডলেশ্বরকে শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মায়ের নির্দেশ মত ধ্বজ, পতাকা এবং কীর্তন সহ তাঁহাকে সদর রাস্তা হইতে আশ্রমে লইয়া আসা হইয়াছে—হল ঘরের মধ্যে একটি পালঙ্কের উপর বিচিত্র বর্ণের রেশমী চাদর দ্বারা মণ্ডিত শয্যা পাতিয়া রাখা [illegible]য়াছে। মণ্ডলেশ্বর ইহার উপর উপবেশন করিলেন। তিনি হলঘরে [illegible] শ্রীশ্রীমা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। [illegible]ন্দন ও ফুলের মালা দে[illegible] হইলে উপস্থিত সকলে [illegible]ভিবাদন করিলেন। [illegible] নির্দেশমত খুকুনীদিদি এ[illegible] ফেননিভ তোয়া[illegible]

সৎকার বিধি বিশেষরূপে মণ্ডলেশ্বরকে প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। কিভাবে সাধু মহাত্মাদিগকে মর্যাদা প্রদর্শন করিতে হয় তাহা শ্রীশ্রীমা বার বার নিজে আচরণ করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। এই সব কার্যগুলি এমন সুরুচি ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পন্ন করা হয় যে উহা দেখিলেও শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

মণ্ডলেশ্বর আসন গ্রহণ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি ভক্তি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই—

"সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ভক্তিকে ভগবৎ প্রাপ্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এখন ভক্তি বলিতে আমরা কি বুঝি? বস্তু বিশেষের সহিত মনের সংযোগকেই ভক্তি বলে। অর্থের সহিত যখন মনের সংযোগ হয় তখন ইহার নাম লোভ, স্ত্রীলোকের সহিত সংযোগ হইলে ইহার নাম হয় কাম, পুত্রকন্যাদির সহিত এই সংযোগ যখন হয় তখন ইহাকে বলা হয় মোহ, আর যখন পরমাত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় তখন উহাকে ভক্তি বলে। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে পরমাত্মার সহিত মনের যে কোন সংযোগকেই ভক্তি বলে না। ঐ সংযোগের লক্ষ্য অর্থাৎ সাধ্য পরমাত্মাই হওয়া দরকার। কারণ যদি অর্থাকাঙক্ষায় মনকে পরমাত্মায় যুক্ত করা যায় তবে পরমাত্মা লক্ষ্য বা সাধ্য না হইয়া সাধন বা অর্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। মনের এরূপ সংযোগকে ভক্তি বলা যায় না। শান্তি বা আনন্দ কামনা করিয়া পরমাত্মায় মনঃ সংযোগ করিলেও ভক্তি হইবে না। এখানেও পরমাত্মা সাধ্য না হইয়া সাধনই হইলেন। ভগবান আনন্দ দান করেন এইরূপ চিন্তা না করিয়া তিনি আনন্দস্বরূপ—এই ভাবে চিন্তা না করার নামই ভক্তি অর্থাৎ [illegible]বান হইতে আমরা আনন্দ পাইব বা তিনি আমাকে কি[illegible] জন্য [illegible]রূপ কামনা না করিয়া [illegible]ষ্কামভাবে ভগবানের চিন্তা [illegible] তাঁহা[illegible]ন্ আমার প্রিয়, প্রিয়তম। [illegible] এই ভাব হইতেই [illegible] যা[illegible]ার নাম ভক্তি।

[illegible]নেক প্রকার হই[illegible]ন [illegible]হ আর্ত, কেহ জিজ্ঞাসু,

কেহ অর্থার্থী, কেহ বা জ্ঞানী। ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট কিন্তু ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই যিনি বিষয়াসক্তি শূন্য, যিনি কেবল আনন্দস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সর্বদা মনকে নিত্য যুক্ত করিয়া রাখেন তিনিই পরমভক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এই আনন্দ স্বরূপ ভগবান্ বা পরমাত্মা কে—যাঁহার সহিত মনকে নিত্যযুক্ত রাখিতে হইবে? ইহার উত্তর শ্রুতিই আমাদিগকে দিয়াছেন। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা আত্মার জন্যই আমাদের নিকট প্রিয় বলিয়া মনে হয়। পিতা, পিতা বলিয়াই আমাদের প্রিয় নন, আত্মা বলিয়াই আমাদের প্রিয়। পত্নী, পত্নী বলিয়াই আমাদের প্রিয় নয় আমাদের আত্মা বলিয়াই প্রিয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আত্মাই আমাদের প্রিয়তম এবং ইহাই আনন্দস্বরূপ। নিরন্তর এই আত্মাতে মনঃ সংযোগ করার নামই ভক্তি।

এখানে একটু সন্দেহ হইতে পারে যে আমরা আত্মাকেই পরমাত্মা বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আত্মাকে পরমাত্মারূপে গণ্য করা কি সমীচীন? উত্তরে বলা যায় যে প্রতিমাদি বিগ্রহকে পরমাত্মা বলিয়া গণ্য করিলে যদি দোষ না হয় তবে আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া গণ্য করিলে দোষ হইবে কেন? যদি বলা হয় যে প্রতিমাদি বিগ্রহকে শাস্ত্রেই পরমাত্মা বলিয়া গণ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন তবে এখানেও আমরা বলিতে পারি যে গীতাতে ভগবানই আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়াছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ"—সর্বভূতের হৃদয়ে আমিই আত্মরূপে বিরাজ করিতেছি। কাজেই দেখা গেল যে নিষ্কামভাবে সর্বদা আত্মার চিন্তনই ভক্তি এবং ইহা তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবান্ লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।"

আপনারা আমাকে কি[illegible] অনুরোধ করিয়াছিলেন তাই এই কয়টি কথা বলিলাম। [illegible] তার [illegible]

ইহার পর প্রভুদত্ত ব্র[illegible]কে টেয়র সঙ্গে যে লোকটি [illegible] আসিয়াছিলেন তিনি ভাগবত[illegible] ঘণ্টা বক্তৃতা করি[illegible] তিনি যাহা বলিলেন তাহা [illegible] ভালই লাগিল। [illegible]

মণ্ডলেশ্বর বিদায় হইলেন এবং কিছুক্ষণ পর হলঘরে পাঠাদিও শেষ হইল।

৯ই বৈশাখ, শনিবার (ইং ২২।৪।৫০)

শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্য করিয়া এখানে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের যে আনন্দের হাট বসিয়াছিল তাহা গতকল্য হইতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাণ্ডেজীও এবং হরিরাম যোশী প্রভৃতি ভক্তগণ গতকল্যই চলিয়া গিয়াছেন। সাধুদের মধ্যে অবধূতজী এবং শরণানন্দ চলিয়া গিয়াছেন। আজ গোপাল দাদা এবং অখণ্ডানন্দজী চলিয়া যাইবেন। আজ দুপুরে মা আমাদিগকে আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন। মা নাকি বলিয়াছেন যে আজ তিনি সকলকে লইয়া আনন্দভোজন করিবেন। সেই অনুসারে আজ আমরা সকলেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। বাসন্তী মন্দিরের বারান্দায় এবং বাহিরের উঠানে আমরা সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলাম। শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে আমাদিগকে ঘৃতান্ন পরিবেশন করিলেন। শুনিলাম মা নিজে ইহা রান্না করিয়াছেন। মা ঐ অন্ন পরিবেশন করিবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা কিন্তু রান্নার প্রশংসা করিও'। সকলেই খুব আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমাও আমাদের সঙ্গে বসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। বিকালবেলা অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ রওনা হইয়া গেলে মা আমাদের সকলকে লইয়া নৌকা ভ্রমণে বাহির হইলেন। দুইটি বড় বজরা নৌকা ভাড়া করা হইয়াছিল, উহার একটির উপরে মা এবং পুরুষ ভক্তগণ উঠিলেন এবং অপরটির উপর ছেলে পেলে সহ স্ত্রীলোকগণ উঠিলেন। মা আমাকে এবং নকুড় বাবুকে রক্ষক হিসাবে মেয়েদের [illegible] জন্য [illegible]কিতে বলিলেন। দুইটি বজরা পাশাপাশি বাঁধিয়া গ[illegible] তাঁহা[illegible] দেওয়া হইল। আমরা [illegible]মেধ ঘাটের দিকে চ[illegible]ং কীর্তন যাহা সচরাচর [illegible] আশ্রমে হইয়া থাকে [illegible] পরেই হইল। মা নিজেও [illegible] কিছুক্ষণ কীর্তন [illegible]ইভাবে রাত্রি ৮।। পর্যন্ত

আমরা গঙ্গায় বেড়াইয়া শেষে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

চিন্ময়, স্বরূপ, কেশবানন্দ প্রভৃতি যাঁহারা এবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তাঁহারা কে কোথায় থাকিবেন মা তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের হাতে একটি করিয়া ভিক্ষা পাত্র (ছোট পিতলের বালতি) দিলেন। ইহাদের সহিত কথা বলিতে বল্লিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। বিশ্রাম দিবার জন্য খুকুনীদিদি মাকে ভিতরে ডাকিয়া নিয়া গেলেন।

নামের গুণে নূতন কায়ার সৃষ্টি

১০ই বৈশাখ, রবিবার (ইং ২৩।৪।৫০)

আজ সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য সুধীর বাবু পাটনায় রওনা হইয়া গেলেন। কমলাকান্ত দাদাও মায়ের আদেশে বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন। ইঁহারা রওনা হইয়া যাওয়ার সময় মা ইঁহাদের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। ইঁহারা যখন রওনা হইয়া যান মা তখন সকলকে নিয়া হলঘরে বসিয়া ছিলেন। চারু (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবু পাঠ করিতেছিলেন। পাঠাবসানে মাকে কিছু বলিবার জন্য দেবশঙ্কর বাবু প্রভৃতি অনুরোধ করিলেন। উত্তরে মা বলিলেন, "আমার বলিবার যে কিছুই নাই।" তখন কেহ কেহ মাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সুধীর (সরকার) বাবু মাকে বলিলেন, শুনিয়াছি যে আজকাল নাকি বলা হয় যে মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার চাইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করা ভাল। উহাতে নাকি বেশী কাজ হয়। এখন জানিতে চাই মনে মনে প্রার্থনা করা ভাল না উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করা ভাল?

মা। 'প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে করিতে হয়। যদি মনই না থাকে তবে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থন[illegible]থা হইতে? তবে জানিও যদি ঠিক ঠিক ভাবে মন দিয়া [illegible] তবে দেহ ও বাক্য আপ[illegible] আপনি আসিয়া মিলিত [illegible]রিতে করিতে তোম[illegible] হাত আপনা আপনিই উ[illegible]হা যে তোমরা [illegible] কর তাহা নয়। উহা অ[illegible] যায়। ইহাতে[illegible]

ভাবের সহিত নিকট সম্বন্ধ। কেহ যদি নির্জনে মনে মনে ভগবানের নাম করিতে বসে এবং উহাতে যদি তন্ময়তা আসে তবে আপনা হইতে অনেক সময় উচ্চৈঃস্বরে নামও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সঞ্চালনও হইয়া থাকে। ইহাকেই কায়মনোবাক্যে নাম করা বলে। অনেক সময় দেখা যায় যে লোকে মনে মনে নাম করিতেছে আবার সঙ্গে অন্য বিষয়ও চিন্তা করিতেছে অথবা হাত দ্বারা অন্য কাজ করিতেছে। এই সব স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলে ঐ শব্দের প্রতি মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া চিত্ত স্থির হয়। আরও একটা কথা—যখন কায়মনোবাক্যে নাম করা হয় তখন তোমাদের মধ্যে আর একটা কায়া সৃষ্টি হইতে থাকে এবং সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ যাহা পরে দেখা যায় তাহা ঐ সময় হইতেই হয়। অনেকে হয়ত দীর্ঘ দিন নিষ্ঠার সহিত জপাদি করিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাহির হইতে তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তাহাদের উপর রাগদ্বেষাদির প্রভাব যেন সমভাবেই আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে তোমরা মনে করিও না যে তাহাদের সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টাই বৃথা হইতেছে। বৃথা কিছুই যায় না। যে যে কর্ম করে তাহার ফল থাকিয়াই যায়'। এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। বেলা প্রায় ১২টা বাজে দেখিয়া মা উঠিলেন।

১১ই বৈশাখ, সোমবার (ইং ২৪।৪।৫০)

আজ সকাল বেলা আশ্রমে গিয়া মাকে আশ্রমের দ্বার দেশে দেখিতে পাইলাম। নুতন সন্ন্যাসীগণ আজ আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন। নারায়ণ স্বামী (নেপালদা) দেরাদুন, কিষণপুর আশ্রমে এই গরমের দুই মাস থাকিবেন। কেশ[illegible]নন্দ কৈলাস যাইবেন। স্বরূপানন্দ, প্রকাশানন্দ এবং চিন্ম[illegible] তাঁহা[illegible] যমুনোত্রী এবং বদরী [illegible]ণ যাইবেন। সকলেই আ[illegible] [illegible]ময় আশ্রম হইতে রওনা [illegible]। রওনা হইবার পূ[illegible] য[illegible] [illegible]করিয়া ইহাদের একটি ফ[illegible]ইল। ইহারা যখ[illegible] [illegible] করিয়া যাত্রা করিলেন তখ[illegible] [illegible]াসিতে বলিলে[illegible] [illegible] বিশাল কি জয়।"

অদ্বৈতজ্ঞানে কোন সীমা থাকে না

বেলা ১০টার সময় হল ঘরে পাঠ আরম্ভ হইল। চারু (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবু শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিলেন। আধঘণ্টা পাঠ হইলে আমরা মায়ের উপদেশ শুনিবার জন্য মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আজ মাকে প্রশ্ন আমিই করিলাম। আমি বলিলাম, "মা, গতকল্য তুমি কথায় কথায় বলিয়াছিলে যে কেহ যদি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া বলে অমুক অমুক ব্যক্তির এখনও অজ্ঞান আছে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয় নাই"।

মা। হাঁ।

আমি। গোপীবাবুকে প্রায়ই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি যাহার ভাবার্থ হইল যে—ঋষিগণ জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া যখন জগতের দিকে তাকান তখন জগতের দুর্দশা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া যায় এবং ঐ অবস্থা হইতেই তাঁহারা জগতের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে প্রবৃত্ত হন।

মা। হাঁ, ইহাই জগৎগুরুর অবস্থা।

আমি। তাহা হইলে জগৎগুরু অদ্বৈতজ্ঞানী হইয়াও দেখিতেছেন যে লোকে অজ্ঞান অন্ধকারে আছে এবং দীক্ষা দিয়া তিনি তাহাদিগকে জ্ঞান দান করিতেছেন।

মা। হাঁ, তুমি যে এ প্রশ্ন করিবে তাহা আমি প্রথমেই তোমার কথা হইতে বুঝিয়াছিলাম। (সকলের হাস্য) তবে এই প্রশ্নের সমাধান ত পূর্বেই করিয়া দিয়াছি। তাই নয় কি? দেখ, যখন জ্ঞানী বলা হয় তখন কোন ব্যক্তি বিশেষ বুঝায় না। অমুকে অমুকে জ্ঞানী আর সকলে অজ্ঞানী এই ভাবে ভাগ ভাগ করিয়া দেখা অদ্বৈতজ্ঞান নয়। গোপীবাবা যাহা ব[illegible] তাহাও ঠিক। এমন একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় পৌঁছি[illegible]কান্নার রোল শুনা যায়। তোমরা এমনও ত শুনিয়াছ [illegible]কে [illegible] গ্রহণ করিলেন না। তিনি [illegible] বলিয়াছিলেন যে জ[illegible] কষ্ট আছে ততদিন [illegible]। গ্রহণ করিবেন না। [illegible]র কথা হইতে [illegible] যে

তাঁহার নির্বাণ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ছিল। এবং উহা থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাণ গ্রহণ করিলেন না। বুদ্ধদেবের কথা না হয় আমরা ছাড়িয়াই দিলাম। এমন কথা হইতেছে যে, যিনি অদ্বৈতজ্ঞানী তাঁহার কাছে জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটি আলাদা জিনিস নয়। পূর্ণ অবস্থা লাভ করিতে যেমন অজ্ঞানকে বাদ দিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানকেও বাদ দিতে হয়। কারণ আসল বস্তু ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের বাহিরে। তোমরা অবশ্য জ্ঞান ও অজ্ঞানকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখ; কিন্তু জ্ঞানীর নিকট যে সবই এক। যাহা অজ্ঞান উহাই আবার জ্ঞান—বুঝিলে?

আমি। ভাল করিয়া বুঝিলাম না। যদি জ্ঞান ও অজ্ঞান এক জিনিসই হয় তবে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? অজ্ঞান নাশ করিবার জন্যই ত দীক্ষা?

মা। আচার্যের ত একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় তিনি জ্ঞান ফুটাইয়া তুলিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। ঐ অবস্থার গতি হইতেই অজ্ঞান নাশের ব্যবস্থা হইয়া যায়; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলা যায় না যে আচার্যের মধ্যে অজ্ঞান আছে এবং যিনি নিজে অজ্ঞানী তিনি আমাকে জ্ঞান দেবেন কেমন করিয়া? জাগতিক হিসাবে মাষ্টার যেমন ছাত্রদের অজ্ঞান নাশ করিয়া তাহাদিগকে পণ্ডিত করিয়া তোলেন; ছাত্রদের অজ্ঞানতা বুঝিলেও যেমন মাষ্টারকে অজ্ঞান বলা যায় না। সেইরূপ আচার্য ও লোকের অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞান প্রকাশের সহায়তা করিলেও তাঁহাকে অজ্ঞান বলা যায় না। তিনি অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও এ সব করিতে পারেন। আবার কর্মের গতিতে এমন সব আঁশ থাকিয়া যায় যাহার জন্য লোক আচার্য হইয়া জগতের মঙ্গল করিয়া থাকেন। আবার এমন অবস্থাও আছে যেখানে পৌঁছিলে জগতের কান্নার রোল শুনিতে পাওয়া [illegible]। তোমরা এক জীববাদ বল না তখন একের ক্রন্দনই [illegible] তাঁহা[illegible] বলিয়া মনে হয়। আবার [illegible] আছে তা'ই আছে'—[illegible]তেও হয়। অবশ্য এই [illegible]গুলির মধ্যে কোনটি [illegible] ছোট, কোনটি উচ্চ এবং [illegible]—এরূপ কিছু আ[illegible]। এ জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন

অবস্থা যে আছে আমি শুধু তাহাই বলিতেছি। তবে জানিও তোমরা যাহাকে অজ্ঞান বল বা অজ্ঞান বলিয়া মনে কর ইঁহারা কিন্তু উহা ঐভাবে দেখেন না। তাঁহারা অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সব কিছু করিতে পারেন।

আমি। যাঁহারা পূর্ণ, জগতের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ দৃষ্টি হইয়া থাকে? জগতে যে সব অবতার আসিয়াছেন—ইঁহারাও সকলেই পূর্ণ তবে ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম সংস্থাপনের বাসনা আসিল কোথা হইতে?

মা। কোন ব্যক্তি বিশেষত পূর্ণ হইতে পারেন না। পূর্ণের কি কোন দেহ আছে?

আমি। অবতারের কথা বলিতেছি, যেমন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দেহ'ত ছিল, কারণ শাস্ত্রে ঐ দেহের বর্ণনা আছে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ঐ দেহেই নিবদ্ধ ছিলেন না।

মা। তুমি যে ভাবে কথা বলিতেছ তাহার উত্তর আমি নাও দিতে পারি। (সকলের হাস্য)।

কুসুম। কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি কাহারও নাম না বলাই ভাল।

আমি। বেশ ত কৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। অবতার যখন আসেন তখন তাহাদের বা ধর্ম্ম স্থাপনের ইচ্ছা আসে কোথা হইতে?

মা। অবতার আসার কথা যে বলিতেছ—তিনি কোথায় নাই যে আসিবেন? একমাত্র তিনিই ত আছেন। তাঁহার গতির মধ্যে এমন গতি আছে, যখন তাঁহাকে সাকার রূপে প্রকাশিত হইতে হয়। যেমন কাঠে কাঠে ঘষিলে অনেক সময় এমন ঘষা পড়ে যাহার জন্য আগুন জ্বালিয়া উঠে। তাঁহার সাকার রূপের প্রকাশটাও সেইরূপ। আবার তাঁহার নিরাকার প্রকাশটাও আছে। এখন বুঝিলে ত?

আমি। কিছুটা বুঝিয়াছি।

মা। এগুলি বু[illegible]ঝা ত বোঝা—এক জাতীয় চিন্তা হটাইয়া অন্য জাতীয় [illegible] তাহ[illegible] মাথায় লওয়া। আবার কিছু[illegible] পর নূতন চিন্তা আসি[illegible]কে টে[illegible]র। যতিদিন ১ম প্রক[illegible] হয় ততদিন এই রূপ[illegible]

নাম জপাদি নির্দিষ্ট সময় করিতে হয় কেন?

১৩ই বৈশাখ বুধবার (ইং ২৬।৪।৫০)

সকাল বেলা ১০।।টার পর পাঠান্তে সদালোচনা আরম্ভ হইল। সুধীর (সরকার) বাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, নাম জপাদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে করিতে বলা হয় কেন? যে কোন সময়ে উহা করিলেই ত চলিতে পারে।"

মা। (হাসিয়া) সময় অসময়ের বাহিরে যাইবার জন্য।

সুধীর দাদা। এ উত্তর দিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দেওয়া হইল।

মা। (আমাদিগকে) এই কথা বলিয়া আমি ফাঁকি দিলাম নাকি?

আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন, 'না, মা। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।'

মা তখন সুধীর বাবুকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "নির্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নাম করিতে বলা হয় এইজন্য যে ঐরূপ করিতে করিতে যদি একবার নামে মন লাগিয়া যায় তখন আর সময়ের জ্ঞান থাকে না। তখন সময় অসময় একাকার হইয়া যায়। এই জন্যই বলিয়াছিলাম যে সময় অসময়ের বাহিরে যাইবার জন্যই নির্দিষ্ট সময়ে জপ করিতে হয়। তোমাদের আহার নিদ্রা প্রভৃতির একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যেমন এতটার সময় তোমরা স্নান কর, এতটার সময় আহার কর এতটার সময় ঘুম যাও। এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐ ঐ সময় আসিলে তোমরা সচরাচর যাহা কর তাহা করিতে প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ নামও যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে করা যায় তবে সেই সময়টা আসিলে অভ্যাস মত তখন নাম করিবার কথা মনে হয়। তাহা না হইলে নাম করিবার খেয়াল নাও হইতে পারে। কারণ জাগতিক বিষয় দিয়ে তোমাদের মন এমন ভাবে ভর্তি থা[illegible] যে উহা সরিয়া গিয়া যে জপের কথা মনে হইবে এর[illegible] তাঁহা[illegible] তাহাছাড়া জপ করিবার [illegible]ন্য সকাল সন্ধ্যা ভিন্ন ভি[illegible] এই সব ক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ঐ ঐ সময়ে জপ ক[illegible]য়া যাইতে পারে। যদিও [illegible]ণের মধ্যে সর্বক্ষ[illegible] বলা হয় যে একের মধ্যে

অনন্ত আবার অনন্তের মধ্যে এক, তবুও প্রত্যেক ক্ষণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আলাদাভাবে লাভ করা যায়। সেইজন্য সকাল সন্ধ্যা প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ে জপ করিবার বিধি। এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতেই সর্বক্ষণ ভগবানের নাম করিবার সামর্থ্য জন্মে।

সত্য এবং কল্পনা

আমি। মা, সত্য ও কল্পনা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

মা। বল।

আমি। একদিন তুমি বলিয়াছিলে যে কল্পনা সত্য হইতে আলাদা। যেমন কেহ হরিদ্বারে না গিয়া হরিদ্বার সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করে তবে সে যখন হরিদ্বারে যাইবে তখন সে দেখিতে পাইবে যে তাহার হরিদ্বার সম্বন্ধে কল্পনা সত্য নয়। এইস্থানে কল্পনা সত্য হইতে পৃথক্।

মা। হাঁ।

আমি। আবার অন্য একদিন তুমি ইহাও বলিয়াছিলে যে হরিদ্বারে না গিয়া হরিদ্বার সম্বন্ধে যে কল্পনা করা হয় উহাও একেবারে মিথ্যা নয়। হরিদ্বারের যে চিত্র আমাদের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে উহা হয়তো হরিদ্বারেরই এক সময়ের চিত্র।

মা। হাঁ; এক সময়ে হরিদ্বারের ঐরূপ চেহারা ছিল, না হয় ভবিষ্যতে এই রূপ হইবে।

আমি। তাহাই যদি হয় তবে কল্পনা ত কোন অবস্থাতেই মিথ্যা নয়!

মা। (হাসিয়া) কল্পনাকে যে মিথ্যা বলা হয় তাহা কিরূপ জান? যেমন জীব, তোমরা বল না যে যত্র জীব তত্র শিব। শিবকে জীব বলাই হইল কল্পনা [illegible] পরিবর্তনশীল তাহাই কল্পনা আর যাহা সত্য তাহা সক[illegible] তাহ[illegible]প।

আমি। এই অ[illegible]কে [illegible] যাহা কিছু দেখি তা[illegible] কল্পনা, এখানে সত[illegible]মি আরও বলিয়া[illegible]দি কল্পনার সহিত দ্বন্দ্ব [illegible]ল্পনার প্রকাশ [illegible]ত্যের

সহিত যদি দ্বন্দ্ব থাকে তবে ঐ দ্বন্দ্ব কাটিয়াও সত্যের প্রকাশ হইতে পারে। এখানেও তুমি সত্য ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করিতেছ।

মা। কথা কি জান? জগৎ এবং ভগবান্ সম্বন্ধে তুমি ত কত কিছু কল্পনা করিতেছ। এগুলি স্থায়ী হয় না বলিয়া এগুলিকে মিথ্যা বলা হয়। ভগবানকে পতিরূপে, প্রভুরূপে নানা কল্পনা করিয়া তোমরা সেবা পূজা কর কিন্তু এগুলিকে শুধু কল্পনাই বলা হয়, কেন না এই সেবা পূজার জন্য তোমাদের ভিতরের কোন পরিবর্তন হয় না। যে মুহূর্তে ভগবানের বা সত্যের প্রকাশ সেই মুহূর্তেই তুমি বদলাইয়া যাইবে। যেমন আগুনের দিকে তুমি যত অগ্রসর হইবে ততই উহার তাপ তোমার গায়ে লাগিবে, কিন্তু যেই মাত্র তোমার শরীরের কোন স্থানে আগুনের স্পর্শ লাগিল অমনি ঐ স্থান পুড়িয়া গেল। সেইরূপ ভগবানকে নানারূপ কল্পনা করিয়া সেবা পূজা করা—এক প্রকার সাধনা। উহা ঐ তাপ লাগার মত কিন্তু যেইমাত্র ভগবানের প্রকাশ হয় তখনই আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার মত সাধকের পরিবর্তন হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে সত্য বস্তু কল্পনা হইতে কত পৃথক্। তোমরা ত কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছ, "তাঁহার যে এমন রূপ তাহাত আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই।" এই অর্থে কল্পনা সত্য হইতে আলাদা। আবার সত্য বা ভগবানকে যখন লাভ করা যায় তখন দেখা যায় যে তাহার সম্বন্ধে এ যাবৎ যাহা কিছু কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সমস্তই তাঁহার মধ্যে আছে। এই অর্থে কল্পনা সত্য। এই বিষয়টি পরিষ্কার হইল ত?

আমি। হাঁ, মা।

বেলা ১১।।টার সময় খুকুনীদিদি হলঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "আমাকে ডাকি[illegible] আসিয়াছে।" মার কথা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে প্রণাম [illegible] উপরে উঠিয়া গেলেন।

[illegible] তাঁহা[illegible]

[illegible]মুক্ত অবস্থা, অহৈতুক[illegible]

[illegible]বৈশাখ বৃহস্পতিবার [illegible]০)

[illegible]ল বেলা পাঠে[illegible] মায়ের সহিত কিছু ধর্ম্ম

প্রসঙ্গ হইল। দেবশঙ্কর বাবু বলিলেন "মা আজ ত আপনি চলিয়া যাইতেছেন, জীবন্মুক্ত অবস্থা কি ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিয়া যান।"

মা। আমি চলিয়া যাইতেছি? আমি যাইওনা, আসিওনা। আর জীবন্মুক্ত অবস্থা পাওয়ার কথা যাহা বলিলে, জানিও যাহা পাওয়া যায় তাহাই হারাইতে হয়। জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা হইয়া যায়।

দেবশঙ্কর বাবু জীবন্মুক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন তাহাই মা কাটিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে ভালভাবে কথা জমিয়া উঠিতেছে না দেখিয়া শ্রীযুক্ত শিশির রাহা (মৌনী) কাগজে লিখিয়া মাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। "অহৈতুকী কৃপার অর্থ কি? যদি প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্যই এ দেহ ধারণ হইয়া থাকে: তবে অহৈতুকী কৃপা কি অর্থশূন্য বোধ হয় না?"

মা। অহৈতুকী কৃপার অর্থ হইল, যে কৃপার হেতু নাই। এক অবস্থায় বলা হয় যে কাজ কর, ফল পাও। এই অবস্থায়ই বলা যায় যে আমার প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে। প্রারব্ধ কিনা পূর্ব্বের কর্মের জন্য যাহা পরে লাভ করা যায়। আবার এমন অবস্থা আছে যখন মনে হয় আমি এমন কি করিয়াছি যাহার জন্য আমার ইহা লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা আমি পাইয়াছি তাহা কর্ম করিয়া লাভ করিবার মত জিনিষ না। এই অবস্থায় কৃপার, অহৈতুকী কৃপার কথা আসে। আবার এমন অবস্থা আছে যখন একটি মাত্র সত্তাই অনুভূত হয়। তখন কে কাহাকে কৃপা করিবে? এগুলি বিভিন্ন অবস্থার কথা। কাজেই যদি বল যে কৃপা নাই তাহা যেমন সত্য আবার কেহ [illegible]দি বলে [illegible] কৃপা আছে তাহাও সেইরূপ [illegible]।

এইভাবে মা কি [illegible]। ইহার পর আরও দুই একজন কিছু কিছু প্রশ্ন করিলে [illegible] সকলের উত্তর দিলেন। [illegible] ১।।টার সময় মা হল [illegible]লেন। আমরাও প্রণা[illegible] চলিয়া আসিলাম।

বিকাল বেলায় ৫টার সময় মা পাঠে বসিলেন। বৈদ্যনাথশাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করিলেন। ভাগবত এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের জন্য মা হলঘরে একটি আসন পাতিয়া রাখিতে বলিলেন, এবং পাঠের সময় তাঁহার (অর্থাৎ মার) জন্যও একটি আসন পাতিয়া রাখিতে বলিলেন।

আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই মা কলিকাতা রওনা হইবেন। জাষ্টিস এস, আর দাশগুপ্ত তাঁহার নবনির্মিত গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে মাকে কলিকাতা লইয়া যাইতেছেন। মার জন্মোৎসবও এবার কলিকাতায় হইবে। প্রায় ১৫ দিন কলিকাতায় থাকিবেন। মায়ের সঙ্গে খুকুনীদিদি, পরমানন্দ স্বামী এবং কুসুম ব্রহ্মচারী গেলেন। সঙ্গীয় আর আর লোক আজ দুপ্রহরেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মের দুই মাস মা আমাকেও কলিকাতা গিয়া থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় মা আশ্রম হইতে রওনা হইয়া গেলেন।

তিনদিন পর অর্থাৎ ১৭ই বৈশাখ আমিও সপরিবারে কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতা পৌঁছিয়া শুনিলাম যে মা এস. আর. দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন। মাঝে মাঝে আশ্রমে বেড়াইয়া যান মাত্র। যতদিন মা কলিকাতায় ছিলেন ততদিন দূর হইতে কেবল মায়ের দর্শনলাভই হইয়াছে। কোন কথা বার্তা বলিবার বা শুনিবার সুযোগ হয় নাই। লোকের ভিড়ের জন্য কলিকাতায় উহা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। ১৫।১৬ দিন কলিকাতায় থাকিয়া মা পুরী চলিয়া গেলেন। সেখানে মাসাধিক কাল থাকিয়া কলিকাতা পৌঁছিয়াই একদিনের জন্য নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাটনা রওনা হইলেন। সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য বাবুর আগ্রহে মায়ের এবার পাটনাতে যাওয়া। পাটনাতে ৫।৭ দিন থাকিয়া মা আবার একদিনের জন্য কাশীতে [illegible]। কাশী হইতে মা যখন আবার কলিকাতায় আসিলে[illegible] তাঁহা[illegible] কাশী প্রত্যাবর্তনের সম্বন্ধে [illegible]র সহিত আলাপ করিল[illegible] কলিকাতায় থাকিয়া যে দিন [illegible] পুরী চলিয়া গেলে[illegible] অর্থাৎ ১৯শে আষাঢ় (ইং [illegible] কলিকাতা হইতে[illegible] আসিলাম। কলিকাতায়ই

শুনিয়া আসিয়াছিলাম যে রথযাত্রা পর্যন্ত মা পুরীতে থাকিবেন। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের এবার নব কলেবর হইবে সেইজন্য কেহ কেহ মাকে রথযাত্রা পর্যন্ত পুরীতে থাকিবার নিমিত্ত সাগ্রহ অনুরোধ করেন। ঐ অনুরোধরে জন্যই মাকে এতদিন পুরীতে থাকিতে হইয়াছে।
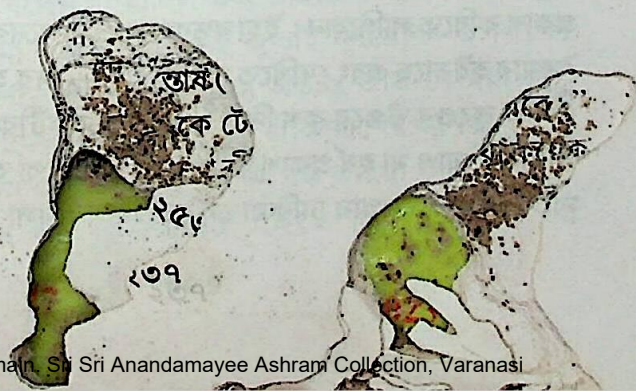
বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া শ্রীশ্রীমার কাশীতে আগমন এবং শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের নবকলেবর উৎসব প্রসঙ্গ

(চার)

পুরী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আগমন

৬ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২২।৭।১৯৫০)।

আজ বেলা ৯টার সময় শ্রীশ্রীমা কাশীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গতকাল কলিকাতা হইতে তার আসিয়াছিল যে মা পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে কাশী রওনা হইবেন। ঐ গাড়ী বেলা ৯-১৪ মিনিটে কাশী পৌঁছে। মায়ের আশ্রম পৌঁছিতে বেলা ৯।।টা হইবে মনে করিয়া সকাল বেলা গঙ্গাস্নান করিয়া ৯-১০ মিনিটে আশ্রমাভিমুখে রওনা হইলাম। পথেই খবর পাইলাম যে মা আশ্রমে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম মোগলসরাই হইতে মোটর যোগে কাশীতে আসিয়াছেন আর তাঁহার সঙ্গীয় লোকজন রেলগাড়ীতে আসিতেছেন।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে চত্বরের দক্ষিণদিকে যে নূতন মন্দিরটি করা হইয়াছে মা ঐ মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি ঐখানে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মন্দিরটি দেখিয়া মা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা বন্ধু[illegible]নের পরিকল্পনানুযায়ী তৈয়ার হইয়াছে এবং দেখিতে [illegible] তাঁহা[illegible]দর হইয়াছে। সাবিত্রী [illegible] কুণ্ডের উপরে কুশ দি[illegible]কুটীরও করা হইয়াছে। [illegible]য়াও মা হর্ষ প্রকাশ [illegible]ধ্যে আশ্রমস্থ লোকেরা মা[illegible] প্রায় ঢাকিয়া [illegible]গলা হইতে মালাগুলি

খুলিয়া আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারিণী এবং সাধুদের গলায় পরাইয়া দিলেন। আমিও একটি আশীর্ব্বাদী মালা লাভ করিলাম।

মা নীচে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া দোতালার শিব মন্দিরের মধ্যে একটু উপবেশন করিয়াই আবার বাহির হইয়া আসিলেন। আমরা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম, মা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিলেন, "শুনিয়াছি দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বে কেহ এই শিব লিঙ্গ দুইটি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়া উহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চলিয়া যায়। এতদিন পরে ইহারা সম্পূর্ণ হইয়া স্থাপিত হইয়াছেন। একটি কাশ্মীরী মহিলা স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে একটি ঘরের মধ্যে দুইটি শিবলিঙ্গ বসানো আছে কিন্তু তাঁহাদের পূজার কোন বন্দোবস্ত নাই। ঐ মহিলাটি যখন এ আশ্রম আসে সে এই শিবলিঙ্গ দুইটি দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল, কারণ ইহাই তাহার স্বপ্নে দেখা শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার খরচ সে-ই দিয়াছে।

মা দোতালার উপর কিছুক্ষণ থাকিয়া নীচে হল ঘরে আসিলেন, এই সময় এইখানে প্রত্যহই পাঠ হয়, আজও পাঠান্তে কীর্তন হইতেছিল। ইতিমধ্যে খুকুনীদিদি প্রভৃতি ষ্টেশন হইতে আশ্রমে আসিয়াছেন। মালপত্র কুলি মজুর লইয়া হল্লা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু মাকে নিয়া হলঘরে বসিয়া আছি।

পুরীর রথ যাত্রা প্রসঙ্গ

মা বসিয়া আমাদিগকে রথ যাত্রার কথাই বলিতেছিলেন। এবার জগন্নাথ দেবের নবকলেবর হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পুরীতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। পূর্ণকুম্ভের পরেই এই রথযাত্রা বলিয়া এবার সাধুসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে নাগা সাধুও অনেক ছিলেন। মা [illegible] ৬ই জুলাই নবযৌবন উপলক্ষ্যে জগন্নাথদেবের দর্শনে [illegible] তাহা [illegible]ন্তু অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া এ[illegible] ভীড়ের চাপে যাত্রীদের [illegible]কে টে[illegible] জীবননাশের আশঙ্কা [illegible] পুরীর রাজা ঐ দিন জ[illegible] [illegible]র্শন বন্ধ করিয়া দে[illegible] রথটানা দেখিবার জ[illegible] ২৫[illegible]৯টা হইতে রা[illegible]ন্ত

বসিয়াছিলাম। দেখিলাম যে পাণ্ডারা ইচ্ছা করিয়াই সারাদিন রথ সাজাইতেছে। কখনও রথের মধ্যে কাঠ লাগাইতেছে, কখনও রথের উপর কলস বসাইতেছে। কখনও বা রথগুলিকে কাপড় দিয়ে মুড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রীদিগকে রথের উপর উঠাইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ও চলিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে আনিয়া রথে বসান হইল। প্রথমে আসিলেন বলরাম, কিন্তু তিনি রথে উঠিবার পূর্ব্বে-ই কাঁসের এক বিচিত্র রকমের শব্দ করিতে করিতে সুভদ্রা দেবীকে আনিয়া রথে উঠানো হইল। বলরাম এবং জগন্নাথ দেবকে যে ভাবে রথে উঠানো হয় সুভদ্রাদেবীকে সে ভাবে উঠান হয় না। বলরাম এবং জগন্নাথ দেবের কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে। সম্মুখে এবং পেছনে ঐ দড়ি টানিয়া টানিয়া দেখানো হয় হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রথের দিকে আসিতেছেন। বিগ্রহের চারিদিকে এত ভীড় থাকে যে যত উঁচুতে লোক বসিয়া থাকুক না কেন তাহারা বিগ্রহকে দেখিতে পায় না। বিগ্রহের মাথায় বড় বড় সোনার মুকুট পরাইয়া দেওয়া হয়। লোকে দূর হইতে ঐ মুকুট দেখিতে পায় এবং ঐ মুকুট সম্মুখে এবং পেছনে দুলিতেছে দেখিয়া তাহারা মনে করে যে জগন্নাথদেব যেন হাটিয়া আসিতেছেন। রথের সম্মুখে বিগ্রহ আসিলেই ঐ মুকুট ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং তখন তখনই ঐ মুকুটের টুকরাগুলি লোকের মধ্যে লুট হইয়া যায়। তাহার পর বিগ্রহদিগকে উপর হইতে দড়ি দিয়া টানিয়া এবং নীচ হইতে ঠেলিয়া উপরে তোলা হয়।"

"মন্দিরের সেবাইতগণ জগন্নাথদেবকে তাহাদের আপনজন বলিয়া মনে করে। সেইজন্য নবকলেবরের সময় তাহারা অশৌচাদি পালন করে। বিগ্রহের যে কবে নবকলে[illegible] হইবে তাহার নিশ্চয় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হই[illegible] তাঁহা[illegible] [illegible]ন্নাথদেবের নিকট [illegible]রিতে থাকে যে তিনি [illegible]র ত্যাগ করিয়া নব [illegible]গ্রহণ করেন। এইভাবে [illegible] [illegible]লিলে ইহারা আদেশ পায় [illegible]সারে নবকলেব[illegible] হয়। তখন পুরাতন

বিগ্রহকে নুন দিয়া ঢাকিয়া এক নির্দিষ্ট স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১১।।টা বাজিয়া গেল। ইহা দেখিয়া মা বলিলেন, "এখন উপরে যাওয়া যাক্।" আমরাও মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরি

৭ই শ্রাবণ, রবিবার (ইং ২৩।৭।৫০)

আজ সন্ধ্যার পর যখন মায়ের ঘরে গিয়া বসিলাম তখন ঐখানে অন্যান্য লোকের মধ্যে একজন নবাগত ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং কথাবার্তা হইতে বুঝিবার উপায় নাই যে তিনি একজন অবাঙ্গালী। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসা করেন এবং অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলিয়া মনে হইল। মা ইহারই সহিত কথা বলিতেছেন। ইনি অল্প কয়েকদিন হয় মায়ের ভক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায় একটি অল্প বয়স্ক ছেলে আছে। বেশভূষায় সে অত্যন্ত আধুনিক। আজ ৮।৯ বৎসর হয় সে মায়ের কাছে আসিতেছে। মা কলিকাতায় গেলে সে মাকে স্বরচিত কবিতা পড়িয়া শুনায় এবং এমন হাবভাব করে যাহাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে, সে মায়ের একজন চিহ্নিত ভক্ত। মায়ের কাছে তাঃ [illegible] গোপন কথারও অন্ত নাই। মা বলিলেন, "সে লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় যে, সে নাকি মায়ের কোলে শিশু এবং আমি কলিকাতায় না থাকিলেও সে আমার দর্শন এবং আদেশ সর্বদাই পাইয়া থাকে। সে গোপন কথা বলিতে আসিয়া আমাকে বলে যে তাহার এই এই অনুভূতি হইয়াছে। আমি জানি যে ঐ সব তাহার কিছুই হয় নাই তবু সে যাহা বলে তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া যাই।" যাহা হউক এইভাবে সে বেশ এক ব্যবসা [illegible] সিয়াছে এবং তাহার কয়েকজন ভক্তও হইয়াছে। নবাগত [illegible] তাহাদের মধ্যেই একজন। মায়ের নাম করিয়া সে ইহা[illegible]কে যথেষ্ট অর্থ নিয়াছে। এবার [illegible] যখন কলিকাতা হই[illegible]ছিলেন তখন ছেলেটি [illegible] আদেশ পাইয়া পাট [illegible] ২৫[illegible]য়া এই ভদ্রলো[illegible]হতে

১৫০ টাকা নেয়। কিন্তু সে পাটনা যায় নাই কিংবা ভদ্রলোককেও ঐ টাকা ফিরাইয়া দেয় নাই। সে শুধু বলিয়াছে ঐ টাকা এক সৎকর্মে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবার রথ যাত্রার সময় এই ভদ্রলোক এবং ঐ ছেলেটি পুরীতে যায়। ইহারা বোধ হয় মায়ের আশ্রমেই ছিলেন। সেখানে ছেলেটি এই ভদ্রলোককে বলে যে মায়ের কাজের জন্য তাহাকে এক হাজার টাকা দিতে হইবে। ভদ্রলোক তাহাতেই রাজি। তিনি মনে করিলেন ইহারা (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা এবং খুকুনীদিদি) বুঝি এইভাবে অন্যের মারফৎ টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছেলেটির হাতে টাকা না দিয়া—উহা খুকুনীদিদিকে দিলেন। মা বলিলেন, "খুকুনী ত এ সব কিছুই জানে না। সে টাকা পাইয়া বলিতে লাগিল যে এতটাকা তাহাকে দেওয়া হইতেছে কেন?" যাহা হউক একদিন ইহার (অর্থাৎ ঐ ভদ্রলোকের) সম্মুখেই ছেলেটিকে প্রশ্ন করা হইল তখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। ছেলেটি ইহাকে ঠকাইয়া এত টাকা নিলেও কিন্তু ইহার কোন দুঃখ নাই। এবং বলে, "ঐ ছেলেটিত সর্ব প্রথম আমাকে মায়ের কাছে আনিয়েছে।"

ইহার পর আবার অসীমানন্দের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "অসীমানন্দও এই জাতীয় লোক-ছিল। সে ভগবান ব্রহ্মচারীর শিষ্য। তাহার নাম হইয়াছিল সচ্চিদানন্দ। এ শরীরের কাছে সেও আসিত। ফয়জাবাদে সচ্চিদানন্দ নামে একজন কংগ্রেস কর্মী ছিল। এক নাম দেখিয়া পুলিশ ভুল করিয়া ইহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি তখন গোপালজীকে (দ্বারকানাথ রায়নাকে) পুলিশের ভুলের কথা বলিলে সে চেষ্টা করিয়া ইহাকে জেল খানা হইতে ছুটাইয়া আনে। এই ঘটনার পর ইহার নাম বদলাইয়া অসীমানন্দ রাখা হইল! দেরাদুনে সে কিছুদিন ছিল। মাঝে [illegible] হৃষীকেশ যাইত এবং [illegible]খানে গিয়া যদি কাহাকেও [illegible] মনে হইত যে ইহার [illegible] নাই তবে সে গম্ভীর [illegible] বলিত, "তোমার দীক্ষার স[illegible] তুমি এখনই [illegible] দীক্ষা গ্রহণ কর।"

যাহাদিগকে এরূপ বলা হইত তাহারাও কতকটা অবাক হইয়া তখনই ইহার নিকটা দীক্ষা গ্রহণ করিত। আমাকে কিন্তু অসীমানন্দ এ সব কথা কিছুই বলিত না। পরে দেখি যে দলে দলে লোক তাহার সহিত দেখা করিতে দেরাদুনে আসিতেছে। আমি তাহাদের মুখেই এ সব কথা শুনিয়াছি এবং তাহারা যে এই দীক্ষার জন্য নিজকে খুব ভাগ্যবান মনে করিতেছে তাহাও তাহাদের কথা হইতে বুঝিয়াছি। তাহারা বলিত, "মা, একে ত হৃষীকেশের মত স্থান, তাহাতে আবার একজন মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আমাদের অবস্থা বুঝিয়াই আমাদিগকে দিক্ষা দিয়াছেন। ইহা কি কম ভাগ্যের কথা? কেবল ইহাই না, সে একদিন গোপালজীকে বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে জেল খানা হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ সেইজন্য তোমাকে একটি কথা গোপনে বলিতেছি, ইহা তুমি প্রকাশ করিও না। তোমরা কি জান যে তোমাদের আনন্দময়ী মা কে? এবং আমি কে? তোমাদের মা হইলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। হিমালয়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া ইহাকে দীক্ষা দিয়া যান। আমি হইলাম বিবেকানন্দ আর সেবাকে দেখিতেছ, সে হইল সিস্টার নিবেদিতা। এ পর্যন্ত যে তাহার বিবাহ হয় নাই তাহার কারণ হইল এই।" একদিন গোপালজী আমাকে আসিয়া বলে, "মাতাজী, তুমি কিছু না বলিলেও আমরা জানিয়াছি যে তুমি কে"। আমি যখন বার বার আব্দার করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলাম, "পিতাজী, তুমি কি জানিয়াছ তাহা আমাকে বল।" তখন সে এই সব কথা প্রকাশ করিল। ইহারা সকলেই অসীমানন্দকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত, আর সেও এমন ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া থাকিত যে লোকে সহজেই তাহাকে একজন বড় সাধু বলিয়া ধারণ[illegible]। অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষা লইতে আরম্ভ করিল এবং [illegible] ত্তাষ[illegible]সেও বেশ টাকা পয়সা গুছাইয়া নিতে লাগিল। ভাই[illegible]কে টে[illegible] তৈয়ার করিবে বলি[illegible]" আমেদাবাদ হইতে [illegible]যোগাড় করিয়াছিল। [illegible] দেখিতাম যে মাঝে ম[illegible] ২৫০[illegible]মে টাকা আসি[illegible]পর

তাহার আরও অধঃপতন হয়। সে তাহার এক শিষ্যাকে বিবাহ করে এবং সন্তানও হয়। অসীমানন্দের পরিণামও বলিতেছি। একবার সে দেওঘরে গিয়াছিল। সঙ্গে মাত্র একটি চাকর। সে যে একজন অর্থশালী লোক তাহা প্রচার হইয়াছিল। একদিন দেখা গেল যে সে তাহার ঘরে মরিয়া আছে এবং সঙ্গের চাকরটিও উধাও হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে এই রূপ কত যে জুয়াচুরি চলিতেছে। সেই জন্যই বলা হয় যে শুধু সাধুর বেশ দেখিয়াই কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।"

জগন্নাথদেবের মন্দির এবং বিগ্রহ

৮ই শ্রাবণ, সোমবার (ইং ২৪।৭।৫০)।

আজ বেলা ১০টার সময় মা হলঘরে আসিলেন। এতদ্দেশীয় কয়েকজন লোক তার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। নানা কথা হইতে লাগিল। কিভাবে জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল এবং কিভাবে এই বিগ্রহের নবকলেবর করা হয় মা সেই গল্প করিতে লাগিলেন। এ গুলি কিংবদন্তী বই আর কিছু নয়। মা বলিলেন, "আমি এই সব কথা পাণ্ডাদের এবং অন্য লোকের মুখে শুনিয়াছি। তোমরাও ত শুনিয়াছ যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পূর্ব্বে একটি নিমগাছের নীচে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পাদপদ্ম দেখিয়া এক ব্যাধ উহা পাখী ভ্রমে তীর নিক্ষেপ করিলে সেই তীর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ের বুড়া আঙ্গুলে বিধিয়া যায় এবং উহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে তাঁহার বুকের কৌস্তভমণি ঐ নিমগাছের ভিতর প্রবেশ করে। কেহ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কেহ আবার বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সৎকার করিয়া ঐ ভস্ম রক্ষা করা হয়। এমনও শূনা যায় যে, যে আঙ্গুলে তীর বি[illegible] -সেই আঙ্গুলটি নাকি [illegible] করা হয়। যাহা হউক [illegible] তাঁহা[illegible] কৃষ্ণ বসিয়া দেহত্যাগ [illegible]লেন—শবরেরা উহ[illegible] [illegible]রা করে। গাছটি কাটা হ[illegible] তিন খণ্ড হইতে[illegible] [illegible]হির হইতে দেখা যায় এব[illegible] স্পর্শ করিলে [illegible] জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যায়।

শবরেরা ঐ গাছটিকে ভূতুড়ে গাছ মনে করিয়া উহার পূজা করিতে থাকে। ঐ তিন খণ্ড কাঠকেই দারু ব্রহ্ম বলা হয় এবং ইহা হইতে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি করা হইয়াছে। ইহাই হইল জগন্নাথ দেবের মুর্তির বিবরণ।

এখন পুরীর মন্দিরের কথা বলিতেছি। এক রাজার ইচ্ছা হইল যে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে বিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি পাথর দিয়া এক প্রকাণ্ড মন্দির তৈয়ার করিলেন। তখনকার দিনে বড় মন্দির তৈয়ার করা সহজ ব্যাপার ছিল না; কারণ তখন ত আর আজকালের মত যন্ত্রপাতি ছিল না যে তাহা দ্বারা বড় বড় পাথর উপরে তোলা যাইতে পারে। তখনকার দিনে বড় মন্দির বা বাড়ি তৈয়ার করিতে হইলে মাটি গাঁথিতে আরম্ভ করিয়া হাত দিয়া যতদূর নাগাল পাওয়া যায় ততদূর তৈয়ার করিত। পরে ইহা বালু দিয়া ঢাকিয়া সেই বালুর উপরে দাঁড়াইয়াই আবার উপরের গাঁথনিগুলি করিয়া যাইত। এই ভাবে বড় বড় বাড়ী গড়িয়া উঠিত। ঐ রাজার মন্দিরও এইভাবে তৈয়ার করা হইয়াছিল। যখন মন্দিরটি শেষ হইল তখন উহার সমস্তটাই বালুর নীচে চাপা পড়িয়া রহিল। এদিকে ঐ রাজা মন্দিরে কি বিগ্রহ স্থাপন করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মা তাহাকে এই কথা বলিলেন যে ঐ মন্দিরে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হইবে তাহা তিনি স্বপ্নে জানিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া রাজা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তাহার রাজ্যের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে—কারণ ব্রহ্মলোকের সময়ের পরিমাপ এই জগতের মাপ হইতে ভিন্ন। কথায় বলে যে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত জগতের হাজার বৎসর। কাজেই যে স্থানে তিনি মন্দির তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে কঠিন [illegible]ল।

একদিন ঐ রাজ[illegible] তাহ[illegible]াইলেন যে সমুদ্র তীরে শব[illegible] যে বিগ্রহ পূজা করি[illegible]কে টে[illegible] উহা আনিয়া তাঁহার [illegible] স্থাপিত করেন। ঐ ত[illegible]জা নানাদিকে লোক[illegible]।

এই সকল লোকের মধ্যে বিদ্যাপতি বলিয়া এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রতীরে শবরদের দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি পূজার বাদ্যাদি শুনিতে পাইলেন। ঐ শব্দ অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে শবরেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। তিনি আর পূজার স্থানে যাইতে পারিলেন না। ঐ বিগ্রহের যিনি প্রধান পূজারী ছিলেন তাঁহার বাড়ীতেই বিদ্যাপতিকে রাখা হইল। ঐ পূজারীর ছোট এক কন্যা ছিল। সে কন্যাই সময় মত বিদ্যাপতিকে আহারাদি দিয়া যাইত। ঐ মেয়েটি ভিন্ন আর কাহারও সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। এইভাবে কিছুদিন গেলে পুজারীর কন্যা বিদ্যাপতির প্রতি আসক্ত হইল। পূজারী ইহা লক্ষ্য করিয়া কন্যাকে বিদ্যাপতির সহিত বিবাহ দিলেন। যদিও বিদ্যাপতি শবরদের একজন হইয়া গেলেন তবুও কিন্তু তাঁহাকে বিগ্রহের কাছে যাইতে দেওয়া হইত না। কোথায় পূজা হয় এবং কোন্ বিগ্রহের পূজা হয় বিদ্যাপতি উহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন তিনি তাঁহার শ্বশুরকে বলিলেন যে ঐ বিগ্রহ দর্শন করিতে তাঁহার খুব ইচ্ছা করে। পূজারী তাঁহাকে এই সর্তে বিগ্রহের কাছে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন যে 'পথে চলিবার সময় তাঁহার চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে।' বিদ্যাপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিয়া দুঃখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন যে যদিও বিগ্রহ দেখা হইবে তবুও ত বিগ্রহ কোথায় আছেন তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। তখন তাহার স্ত্রী তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে তিনি পথে চলিবার সময় যদি সরিষা ফেলিতে ফেলিতে যান তবে কিছুদিন পর যখন ঐ সরিষা হইতে গাছ হইবে তখন তিনি ঐ সকল গাছ ধরিয়াই বিগ্র[illegible]স্থানে যাইতে পারিবেন। কাজেও তাহাই করা হইল। যে[illegible] তাঁহার শ্বশুরের সঙ্গে [illegible] দর্শনে চলিলেন, তিনি [illegible]ত পথে পথে সরিষা [illegible] ফেলিতে চলিলেন [illegible] গেলে তাঁহার চোখের বাঁ[illegible] দেওয়া হইল। [illegible]ই বিদ্যাপতি বুঝিতে

পারিলেন যে রাজা স্বপ্নে যে বিগ্রহ দেখিয়াছেন ইহা তাহাই, তিনি তখন সুবিধামত বিশ্বাসী এক লোক দিয়া রাজার নিকট চিঠি পাঠাইলেন। চিঠি পাইয়াই রাজা সৈন্য সহ শবরদের দেশে আসিয়া শবরদিগকে পরাজিত করিয়া বিদ্যাপতির সাহায্যে বিগ্রহ বাহির করিলেন এবং ঐ তিন খণ্ড কাঠ লইয়া গিয়া পুরীর চক্রতীর্থে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে যে বালুর পাহাড়ের নীচে রাজার মন্দিরটি চাপা পড়িয়া ছিল, একদিন অন্য এক রাজা ঐ পাহাড়ের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে ছিলেন। ঘোড়ার পা শক্তস্থানে পড়িলে যেমন শব্দ হয় হঠাৎ সেইরূপ শব্দ শুনিয়া রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া বালির উপরে চূড়ার এক অংশ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি লোক লাগাইয়া বালু সরাইতে আরম্ভ করিলে সমস্ত মন্দিরটিই বালুর নীচ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন পুরীর রাজাকে খবর দেওয়া হইল। রাজা আসিয়া মন্দির দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহারই মন্দির। তখন তিনি চক্রতীর্থ হইতে বিগ্রহ আনিয়া ঐ মন্দিরে স্থাপিত করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিদ্যাপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ স্ত্রীর গর্ভে যে সব সন্তান জন্মিয়াছিল—তাহারাই এই বিগ্রহের পূজা এবং ভোগ রান্না করিতেন এবং তাঁহার শবর পত্নীর গর্ভে যে সব সন্তান হইয়াছিল তাহারা বিগ্রহের অন্যান্য সেবাকার্য করিতেন। আজকালও সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ বংশধরগণ জগন্নাথের ভোগ রান্না এবং পূজা করেন আর শবর বংশধরগণ অন্যান্য সেবা, যেমন বিগ্রহকে সাজানো, রথে তোলা, রথ টান দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল জগন্নাথদেবের মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা।

"ইহার পর নব[illegible] কলেবরের কথা বলিতেছি। রথের পনের দিন পূর্ব্বে [illegible] স্নান যাত্রা হয়। এই [illegible] জগন্নাথদেবকে কুয়া[illegible]নো হয়। ঐ ঠাণ্ডা [illegible] করিয়া জগন্নাথদেবে[illegible] এই জ্বর পনের [illegible]ই

সময় জগন্নাথদেবকে পাচন ইত্যাদি ঔষধ খাওয়ানো হয়। পনের দিন পর তিনি ভাল হইয়া উঠেন এবং রথযাত্রার আগের দিন তিনি নবযৌবন লইয়া সকলকে দর্শন দেন। স্নানযাত্রার পর পনের দিনের মধ্যে আর কেহ জগন্নাথদেবকে দেখিতে পায় না। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে বিগ্রহের গায়ে যে রং থাকে উহা বোধ হয় কাঁচা। স্নানযাত্রার সময় ঐ রং জলে ধুইয়া যায় বলিয়া আবার নূতন করিয়া রং লাগাইতে হয়। উহাতে কিছুটা সময় লাগে। সেইজন্য স্নান যাত্রার পর ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে বলিয়া লোকদিগকে পনের দিন বিগ্রহ দেখিতে দেওয়া হয় না। রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথদেব নূতন বেশে সকলকে দেখা দেন। ইহাই হইল জগন্নাথদেবের নবযৌবন।

কিন্তু যেবার নবকলেবর হয় সেবার স্নান যাত্রার পর দেড়মাস আর কেহ বিগ্রহকে দেখিতে পায় না। এইবার স্নানের পর যে জ্বর হয় তাহা হইতে জগন্নাথদেব আর আরোগ্য লাভ করেন না। ঐ জ্বরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগ হইলে তিনি পুনরায় নূতন দেহ ধারণ করেন। ইহাই হইল তাঁহার নবকলেবর। এই দেড়মাসের মধ্যেই নূতন মূর্তি তৈয়ার করা হয়। এই ভাবে রথযাত্রার পূর্ব্বদিন জগন্নাথদেব নবযৌবনে সকলকে দেখা দেন। কখন যে এই নবকলেবর হইবে তাহার নিশ্চয় নাই। সাধারণতঃ আষাঢ় মাস মলমাস হইলে এবং কতকগুলি গ্রহণক্ষত্রের এক জাতীয় সমাবেশ হইলেই নবকলেবরের সময় উপস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু কেবল মলমাস এবং গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ যথেষ্ট নহে। এ বিষয়ে জগন্নাথদেবের আদেশও পাওয়া দরকার। সেইজন্য আষাঢ় মাস মলমাস হইলে এবং ঐ সব গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ হইলে পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের নিকট কালি, কল[illegible] [illegible]ত্র রাখিয়া এই বলিয়া [illegible]না করে—"প্রভু, তোমা[illegible] [illegible]র্ণ হইয়াছে, এখন তুমি [illegible]দেহ ছাড়িয়া নবক[illegible]" জগন্নাথদেব যদি [illegible]ার আদেশ দেন [illegible]বরের আয়োজন করা

হয়। তাহা না হইলে আর কিছু করা হয় না। যত বারই ঐ রূপ মলমাস ইত্যাদি আসে তৃতবারই ঐ রূপ প্রার্থনা চলিতে থাকে। এরূপ করিতে করিতে যে বার আদেশ পাওয়া যায় সেই বারই নবকলেবর হয়। এই জন্য কত বৎসর পরেতে নবকলেবর হইবে তাহা বলা শক্ত। যাহা হউক জগন্নাথদেবের আদেশ পাইলেই পাণ্ডারা মঙ্গলাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া কোথায় বিগ্রহ তৈয়ার করার উপযুক্ত নিম গাছ পাওয়া যাইবে তাহা দেবীকে বলিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। দেবীর হাতে যে খড়্গ আছে উহা দেবীর হাত হইতে পড়িয়া গেলেই পাণ্ডারা বুঝিতে পারে যে কোন দিকে ঐ গাছ পাওয়া যাইবে। খড়্গের মাথা যে দিকে থাকে সেই দিকে গিয়া খুঁজিলেই নাকি ঐ সব গাছ পাওয়া যায়। গাছগুলি এমন হওয়া চাই যাহার উপর পাখীরা কোন দিন বাসা বাঁধে নাই এবং উহার কোটরে সাপ এবং গোড়াতে উইয়ের ঢিপি থাকা চাই। বলরাম, সুভদ্রা এবং জগন্নাথদেবের গাছগুলি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ যুক্ত হয়। সেবাইতগণ যখন খুঁজিয়া ঐ সব গাছ বাহির করে তখন উহাদের নীচে পূজা এবং হোম করা হয়। প্রধান সেবাইত সোনার কুঠার দিয়া ঐ সব গাছ সর্ব প্রথম আঘাত করে, পরে সাধারণ কুঠার দিয়া ঐ গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। পরে তিনটি বিগ্রহের জন্য তিনটি বৃক্ষ হইতে কাঠ রাখিয়া ডাল পালা সহ বাকিগুলিকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। পরে কাঠগুলি ঢাকিয়া ঠেলা গাড়ীর সাহায্যে শহরে আনা হয় এবং পথে আনিতে আনিতে ঐ সব কাঠগুলির যথা নিয়মে পূজাও করা হয়। কাহারা ঐ গাছ খুঁজিয়া বাহির করিবে, কাহারা উহা বহিয়া আনিবে, কাহারা উহা দিয়া মূর্তি গড়িবে এবং কাহারা ঐ মূর্তিতে রং লাগাইবে ইহা সমস্তই নির্দিষ্ট আছে এবং তাহারা বংশপরম্পরা এই সব কাজই করিয়া আসিতেছে।

যাহা হউক ঐ কা[illegible] আনা হইলে মন্দিরের ক[illegible] বন্ধ করিয়া মূর্তি তৈয়[illegible] যাহারা মূর্তি তৈয়া[illegible] তাহাদের চোখ এবং [illegible]া জড়ানো থাকে[illegible]

চোখ দিয়া ঐ মূর্তি দেখিতে না পায় ও চর্মহস্তে উহা স্পর্শ করিতে না পারে। পুরুষানুক্রমে তাহারা এই কাজ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই তাহাদের পক্ষে ঐভাবে মূর্তি তৈয়ার করা সম্ভব হয়। যখন মূর্তি তৈয়ার হইতে থাকে তখন খুব জোরে জোরে বাদ্য বাজানো হয় যেন বাহির হইতে কেহ ঐ মূর্তি তৈয়ার করার শব্দ শুনিতে না পায় এবং যাহারা তৈয়ার করে তাহারাও যেন তাহাদের হাতুড়ির শব্দ না পায়। এই সময় পুরীর রাজাও তরবারি হাতে মন্দিরের দ্বারে পাহারা দিতে থাকেন যেন কেহ বাহির হইতে মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে। এই রূপে বহুদিন পর্যন্ত রাজাকে ২ ঘন্টা করিয়া প্রত্যহ পাহারা দিতে হয়। প্রবাদ এই যে যতবার জগন্নাথদেবের নব কলেবর হয় প্রত্যেকবারই নব কলেবরের পর রাজারও মৃত্যু হইয়া থাকে। আজকাল অবশ্য রাজা আর নিজে পাহারা দেন না। তিনি কোন বৃদ্ধ পাণ্ডাকে দশ হাজার টাকা দিয়া তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই বৃদ্ধ পাণ্ডাই রাজার প্রতিভূ হিসাবে তরবারি হাতে করিয়া মন্দিরের দ্বার রক্ষা করেন এবং জগন্নাথদেবের নব কলেবর হইয়া গেলেই এই পাণ্ডার মৃত্যু হয়। তবে কতদিনের মধ্যে যে মৃত্যু হয় তাহা বলা যায় না। কখন কখন খুব শীঘ্র মৃত্যু হয় আবার কখন কখন মৃত্যু হইতে দুই তিন মাস লাগিয়া যায়। এ বৎসরে যে পাণ্ডা রাজার প্রতিভূ হইয়াছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক নূতন কাঠ দিয়া বিগ্রহ তৈয়ার হইলে পুরাতন বিগ্রহের বক্ষস্থল হইতে ব্রহ্ম বা প্রাণ বাহির করিয়া নূতন বিগ্রহের বক্ষে স্থাপন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিফুল, তুলসী এবং চন্দনও দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ফুল, তুলসী এবং চন্দন পুনরায় নব কলেবর না হওয়া পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায়ই থাকে। পুরাতন বিগ্রহের বক্ষ হইতে এই সব ফুল, তুলসী, চন্দন বাহির ক[illegible] তাহা[illegible]গাবিতে করিয়া রাজাকে [illegible]ওয়া হয়। বিগ্রহের বক্ষ[illegible]হইয়া গেলেই মূর্তিকে [illegible]এবং ধূপ দিয়া লেপি[illegible]য়া[illegible]মের থান দিয়া জড়ান [illegible]ঐ কাপড়ের উপর[illegible]জড়াইয়া তাহার উপর

গথের লেই মাখাইয়া পাতলা রেশমের কাপড় দিয়া উহা মুড়িয়া দেওয়া হয়। এই রেশমের কাপড়ের উপর রং লাগাইয়া মূর্তিকে চিত্রিত করা হয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে এবং এই সব কাজও তিথি মূহূর্ত ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয়। যে সব জিনিষ দিয়া বিগ্রহ করা হয় উহাই হইল বিগ্রহের অস্থি মেদ ইত্যাদি অর্থাৎ বিগ্রহের কাঠখানা হইল অস্থি এবং মজ্জা, তেল, ধূপ এবং থান কাপড় গায়ের চর্ম। এইভাবে নব কলেবর হইলেই নব যৌবন এবং রথ যাত্রা উৎসব আরম্ভ হয়। শুনা যায় যে, যে সব লক্ষণযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈয়ার হইত তাহা মঙ্গলাদেবীর নির্দেশ মত স্বতঃই পাওয়া যাইত। এখন উহার মধ্যে অনেক কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে। এখন লোকে নাকি 'তাহার গাছ দিয়াই জগন্নাথদেবের মূর্তি তৈয়ার হউক' এ বাসনা হইতে ঐ সব লক্ষণযুক্ত বৃক্ষ তৈয়ার করিয়া থাকে। তবে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহারা কাহার প্রেরণায় এই লক্ষণযুক্ত বৃক্ষ উৎপাদন করে?"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১১।।টা বাজিয়া গেল। মা উঠিয়া পড়িলেন।

বিকালে প্রায় ৫।।টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখি যে, মা—চত্বরের উপর বসিয়া আছেন। অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাও সেখানে আছেন। মনোজবাবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাকে বাতাস করিতেছেন এবং আগামী গুরু পূর্ণিমায় এখানে উদয়াস্ত কীর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। মা বলিলেন, "তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার"। মায়ের আদেশ পাইয়া মনোজবাবু সোৎসাহে সকলকেই কীর্তনে যোগ দিতে বলিতে লাগিলেন। আমাকে ঐ কথা বলিলে আমি অস্বীকার করিলাম। তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "সে কি"? উহা শুনি[illegible]য়া বলিলেন, "হাঁ, অমূল্য যোগ দিতে পারিবে, তবে যে[illegible] তাহ[illegible]াইয়া থাকিবে কিংবা বসি[illegible] থাকিবে—সে দল বৃদ্ধি [illegible]কে টে[illegible] কিন্তু উহার বেশী আ[illegible] নয়"। ইহা শুনিয়া সক[illegible]ঠিলেন।

মা কাশীতে আসিলেই একজন মালী আশ্রমের দ্বার দেশে দুই বেলাই ফুল, মালা লইয়া বসিয়া থাকে। যাঁহারা মাকে মালা দিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ঐ লোকটির নিকট হইতে মালা ক্রয় করিয়া থাকেন। এক ভদ্র লোক মাকে একটি মালা পরাইলে মা হাসিয়া বলিলেন, "যজ্ঞের পর হইতে দেখিতেছি যে এখানে থাকা হইলে একজন লোক আশ্রমে মালা বিক্রয় করিতে বসিয়া যায়। তোমরাও ইচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক উহার নিকট হইতে মালা কেন! যজ্ঞের সময় এই ব্যক্তিই মালা বিক্রয় করিয়া পাঁচ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। এইভাবে তাহার রোজগারের একটা পথ হইয়াছে।" এই সময় মালীটি ঐখানে উপস্থিত ছিল। মায়ের কথা শুনিয়া সে হাসিতে লাগিল।

জ্ঞানলাভের পর দেহ থাকে কিনা

পুরীতে রথযাত্রার সময় যে সব সাধু উপস্থিত ছিলেন মা তাঁহাদের কথা বলিতে লাগিলেন। করপাত্রীজী, শরণানন্দ স্বামী প্রভৃতি আমাদের পরিচিত সাধু অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, প্রেমানন্দ স্বামীজী কি রথযাত্রার সময় উপস্থিত ছিলেন?"

মা। হাঁ, বাবাজী পুরীতে ছিলেন, তবে রথযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিয়া ছিলাম বাবাজী নাকি কলিকাতা হইয়া রাঁচী যাইবেন। একে ত বৃদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে আবার তাঁহার শরীরটাও ভাল যাইতেছে না।

আমি। পুরীতে তাঁহার সহিত তোমার দেখা হয় নাই?

মা। হাঁ, হইয়াছে। সমুদ্রের ধারে আমরা একত্র বেড়াইতাম এবং এক জায়গায় বসিয়া কথাবার্তা [illegible]তাম। তুমি তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাঁহা[illegible]

আমি। গোপীবাবা এ[illegible] প্রথম কলিকাতায় দেখি। [illegible]আমাদের বাসার ধার দি[illegible]হইতে যাইতেন। গোপীবাবা [illegible]খিলেই তাঁহার [illegible]ৎসু হইয়া থাকেন।

মা। কেন? গোপীবাবার সহিত ত তাঁহার পরিচয় আছে।

আমি। পরিচয় পরে হইয়াছে, কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় ছিল না।

মা। তাই নাকি? তারপর।

আমি। একদিন বিকালে প্রেমানন্দ স্বামী তাঁহার ভক্তগণ সহ ঐরূপ বেড়াইতে যাইতেছেন। গোপীবাবা সীতারাম এবং আমি তাঁহার পিছু লইলাম। স্বামীজী যেখানে বসিলেন আমরাও তাঁহার নিকট গিয়া বসিলাম। সীতারাম তখন বালক ছিল, তিনি সীতারামকে খুব আদর করিতে লাগিলেন।

মা। হাঁ, বাবাজী ঐরূপই করে। আদর মুখে নয় একেবারে গলা জড়াইয়া করা।

আমি। ঐরূপ আদর করিতে করিতে তিনি তাঁহার এক অনুভূতির কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "একদিন দেখিতেছি কি? আমার দৃষ্টিপথে যাহা পড়িতেছে তাহা দেখিয়াই মনে হইতেছে যেন ইহারা আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। গাছপালা, পশু পক্ষী সব কিছুই যেন আনন্দের পুতুল। তাহারা যেন আনন্দ সাগরে ডুবিতেছে আর উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও আনন্দ সাগরে ডুবিতেছি।"

মা। হাঁ, বাবাজী এই জাতীয় কথা বলে।

আমি। এই যে আনন্দের অনুভূতি ইহা যদি চিরস্থায়ী না হয় তবে এই অনুভূতিকে কি বলিব? ইহা কি জ্ঞানে স্ফুরণ, না ভাবের একটা অভিব্যক্তি মাত্র?

মা। কেহ যদি বলে যে অমুক দিন আমি এইরূপ দেখিলাম এবং দেখিয়া আমার এই [illegible] মনে হইল, এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে যে এই দেখার ম[illegible] তাৎ[illegible]ক্ষণ আছে এবং দেখিয়া যাহা মনে হইল তাহাও আছে [illegible]কে ঢেএই অনুভূতি চলিয়া [illegible] আবার ইহাও হইতে পা[illegible]তেছে, "অমুক দি[illegible] কিছু চিন্তা না করিলেও [illegible]কাশ পা[illegible]

যাহা কিছু দেখিতেছি উহা সমস্তই আনন্দের রূপ এবং ঐ প্রকাশটা তখনও চলিতেছে।" এখানেও লক্ষ্য করিবে যে যদিও মনে করা বলিয়া এখানে কিছু নাই এবং একটা অখণ্ড আনন্দের অনুভূতি স্থায়ী ভাবে আছে, তবুও অমুক দিন হইতে যে এই অনুভূতি চলিতেছে এইরূপ একটা সময়ের জ্ঞান আছে। আবার এমনও হইতে পারে যে এই আনন্দের অনুভূতিতে কোন দেশ কাল জ্ঞান নাই। যাহার এইরূপ অনুভূতি হয় সে ভাবিতেই পারে না যে সে কোন দিন নিরানন্দ ছিল। সে যে চিরদিনই আনন্দ স্বরূপ—ইহা তাহার জ্ঞান হইয়া যায়। আবার এমনও আছে যে স্থান, কাল ইত্যাদি জ্ঞান ব্যবহারিক ভাবে থাকিয়াও সবই যে আনন্দ স্বরূপ ঃ এরূপ জ্ঞানও থাকিতে পারে। তবে এ জাতীয় জ্ঞান বড়ই দুর্লভ।

আমি। মা, তুমি যে বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির কথা বলিলে, এই সব অনুভূতি যাহাদের হয় তাহাদের চরিত্রের এবং হাব ভাবের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে কিনা?

মা। যখন চরিত্র এবং হাব ভাবের কথা বলিতেছ তখন বুঝিতে হইবে ঐগুলি শুধু অবস্থা মাত্র জ্ঞান নয়।

আমি। কিন্তু যদি কাহারও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় তখন কি তাহার দেহ থাকে?

মা (হাসিয়া) জ্ঞানীর আবার দেহ? আমি বলিতে জ্ঞানীর সেই থাকে না।

আমি। মা, এখানে তুমি ভিন্ন অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করিতেছ। আমার প্রশ্ন তাহা নয়। আমি জানিতে চাই যে, আমি যে দেহ ধারণ করিয়াছি তাহা-ত আমার ভোগ বাসনা পূরণ করিবার জন্যই, যে দিন এই বাসনা সকল পূর্ণ হইয়া যাই[illegible] দিন আর কামনা বাসনা বলিয়া কিছু থাকিবে না—[illegible]হা[illegible] দেহ থাকিতে পারে কি? [illegible] থাকে তবে তাহা কি [illegible] থাকিবে?

[illegible]। তুমি যাহা [illegible] বস্থাও আছে, যখন দেহ [illegible]ার জ্ঞা[illegible] কিতেও পারে, কান নাই

তবুও শুনিতে পারে। এই বলিয়া মা আর ইহাকে বিস্তৃত না করিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী পরমানন্দ এবং মুক্তিবাবা প্রভৃতি সাধুদিগকে আমার প্রশ্নের কথা বলিয়া উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন স্বামীজীদের মধ্যে জীবনমুক্তি এবং বিদেহ মুক্তি লইয়া ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল। এই অবসরে মা চত্বর হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে দেখিয়া আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

মায়ের অসুস্থতার বিবরণ

রাত্রি ৮টার সময় যখন মার ঘরে গিয়া বসিলাম তখন ঐখানে ডাঃ গোপাল দাসগুপ্ত, নারায়ণ স্বামী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় পুরীতে মায়ের অসুখের কথা উঠিল। এই অসুখের সংবাদ আমরা খুকুনীদিদির কাছে জানিয়াছিলাম। দিদি লিখিয়াছিলেন যে মায়ের অসুখের রকমটা এবার একেবারেই নূতন। নারায়ণ স্বামীর অনুরোধে মা তাঁহার অসুখের কথা বলিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, "রথযাত্রার ঠিক সাতদিন পূর্ব্বে শরীরটা একটু খারাপ হইল। শরীর-ব্যথা এবং একটু জ্বর জ্বর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু একথা সেদিন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না কারণ এদিন জিতেন (মুখার্জ্জি) প্রভৃতিরা কোণারকে যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। আমার অসুখের কথা প্রকাশ করিলে পাছে তাহাদের যাওয়ার ব্যাঘাত হয় সেইজন্য আমি চুপ করিয়া রহিলাম, ভাবিলাম যদি অন্য কারণে ইহাদের কোণারকে যাওয়া বন্ধ হয় তখন শরীরের অবস্থার কথা বলা যাইবে। বাস্তবিক তাহাদের আর কোণারকে যাওয়া হইল না, কারণ তাহারা জানিতে পারিল যে পথে জল হওয়াতে এখন আর ওখানে যাওয় [illegible] তখন আমি তাহাদিগকে আমার শরীর খারাপ হওয়ার কথ [illegible] তাহ [illegible] া হউক শরীরের ঐ অবস্থা [illegible] লইয়াই রাত্রিতে সামান্য কি [illegible] কে টে [illegible] ড়িলাম। পরদিন সক [illegible] পায়খানা হইতে আসিয়া [illegible] র ঝর ঝর হইয়া জি [illegible] সেদিন রোজকার মতই চ [illegible] র্তা ইত্যাদি হ [illegible]

পাঠেও গিয়া বসিলাম এবং পাঠ শেষ হইলে হিন্দীতে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য পাণ্ডেজীকে ডাকিয়া ঘরে আনা হইল। খুকুনীও তখন কাছে ছিল। বুনী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্‌বক্ করিয়া কথা বলিতেছিল। তখন খেয়াল হইয়াছিল যে বুনীকে চলিয়া যাইতে বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে বলিব। পুরীর আশ্রমে মাত্র দুইখানা ঘর। এবার সম্মুখে একটি বারান্দা করিয়া উহাতে কাঠের রেলিং দেওয়া হইয়াছে। রথযাত্রা উপলক্ষে অনেকেই আশ্রমে আসিয়াছে। আশ্রমে স্থানাভাব দেখিয়া খুকুনীকে বলিয়াছিলাম যে যদি বারান্দায় বালু আর সিমেন্ট দিয়া একটা পরদার মত করিয়া দেওয়া যায় তবে ঐখানেই কতকটি লোক থাকিতে পারিবে এবং ঐ পরদার জন্য তাহারা কতকটা দৃষ্টি হইতেও রক্ষা পাইবে। ঐ পরদার জন্য কিছু বালু এবং সিমেন্ট বারান্দার উপরই ছিল। যাহা হউক বুনী যখন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বক্‌বক্ করিতেছিল তখন তাহাকে ঐখান হইতে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং খেয়াল হইল যে ও চলিয়া গেলেই দরজা বন্ধ করিয়া চিঠি লেখা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু যেইমাত্র বুনী দরজা হইতে সরিয়া গেল ঠিক সেইসময় সাধন (ব্রহ্মচারী) আসিয়া খুকুনীকে বলিল, দিদি, ইহা আপনার কিরূপ বিবেচনা, আপনি এই সুন্দর রেলিংগুলিকে বালু এবং মাটি দিয়ে নষ্ট করিতে চান? এভাবে পরদা করিলে কি ভাল হইবে?" উহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "হাঁ, বেশ ভাল হইবে", এবং তখনই কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সাধন ভাবিল যে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্যই আমি কথা বলিলাম, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঐখান হইতে চলিয়া গেল। সে যে একটা মিথ্যা ধারণা নিয়া প্রাণে আঘাত পাইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম [illegible] উহা দূর করিবার জন্যই তাহাকে ডাকিতে লোক পাঁ[illegible]হা[illegible]দাক আসিয়া খবর দিল যে [illegible]ধন ঘুমাইতেছে। আমি[illegible]ধন ঘুমায় নাই সে অভিমানে [illegible] হইতে চলিয়া যাই[illegible]স্থ করিয়াছে। তাই তাহার [illegible]দিবার জন্য আ[illegible]কাছে যাইব বলিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইলাম। এমন সময় খুকুনী চিঠিতে কি লিখিতে হইবে সে সম্বন্ধে কথা তুলিল এবং এই সময় আরও খেয়াল হইল যে এখন গেলে সাধনকে পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য আবার বসিয়া পড়িলাম। চিঠি লেখা শেষ হইলে আমি আবার সাধনের খোঁজ করিতে বলিলাম। তখন দেখা গেল যে সে আশ্রমে নাই। সে এত তাড়াতাড়ি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল যে কেহই তাহাকে যাইতে দেখে নাই। সে আশ্রম ছাড়িয়া গিয়াছে—এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলে পরমানন্দ এবং খুকুনী দুজনেই ও কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। আবার বলিল যে সে কোন কাজে হয়ত বাজারে গিয়াছে, কারণ আশ্রমের কাজের জন্য তাহাকে সর্বদাই বাজারে ছুটাছুটি করিতে হইত। আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে এ শরীরের জন্যই সাধন একটা ভুল ধারণা লইয়া চলিয়া গেল আর নিজে নিজে বলিতে লাগিলাম, "সাধন, তুই যদি সত্যি মনে করিয়া থাকিস যে আমি তোকে তাড়াইয়া দিয়াছি তবে তুই আমাকে ক্ষমা কর। যাহা হইয়া গিয়াছে, তুই এখন ফিরিয়া আয়!" দেখা গেল যে কিছুক্ষণ পর সাধন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার নিকট শুনা গেল যে, সে চির দিনের মতই আশ্রম ছাড়িয়া যাইবে মনে করিয়াই আশ্রম হইতে ষ্টেশনের দিকে রওনা হইয়াছিল, কিন্তু পথে কি জন্য তাহার মতের পরিবর্তন হইল সে তাহা বলিতে পারে না। সেইজন্য সে আশ্রমে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমরা যাহারা আশ্রমে ছিলাম, সকলেই জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পাইতাম। প্রসাদ হয়ত কোন দিন বেলা ৩টার সময় আসিত, আবার কোন দিন সন্ধ্যাও হইয়া যাইত। ঐদিন বিকাল বেলা খবর আসিল যে আজ প্রসাদ আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে তখন নিজেরা রান্না করিয়া খাইতে গেলেও রাত্রি ১১টা ১২টা বাজিয়া [illegible] সেইজন্য জগন্নাথদেবের প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করাই [illegible] তাহা [illegible] কলে মনে করিল! বাস্তবি[illegible] ঐদিন রাত্রি প্রায় ১২টা[illegible] কে টে[illegible] সিয়া উপস্থিত হইল। [illegible] আসিলে উহার সামান[illegible] হণ করিতাম পরে স[illegible]

প্রসাদ দেওয়া হইত। ঐদিনও প্রসাদ আসিলে খুকুনী আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেল। সে এক গ্রাস মাত্র আমার মুখে দিয়াছে এবং অন্য এক গ্রাস মুখে দিবে বলিয়া মুখের কাছে আনিয়াছে এমন সময় আমি দেখিতেছি যে ভিতরের যে সব যন্ত্রের সাহায্যে লোকের দেখাশুনা, কথাবার্তা এবং চলাফেরা ইত্যাদি হয় সে সকলই যেন আমার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তোমরা যে চলাফেরা কর, কথাবার্তা বল তাহা কিভাবে হয় তাহা তোমরা জান না। ঠিক ঠিক ভাবে ঐ সব চলিলেই তোমরা মনে কর যে, তোমরা সুস্থ আছ। কিন্তু যে যে নাড়ীর গতিতে ঐসব কার্য হইয়া থাকে তাহা আমি দেখিতে পাই। যদিও আমার পক্ষে কথা বলা না বলা, দেখা বা না দেখা সবই সমান, তবুও তোমাদের নিকট যাহা বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ হয় তাহাও যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে—ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। খুকুনী যখন দ্বিতীয় গ্রাস আমার মুখের কাছে ধরিল তখন আর আমি উহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পায়খানায় যাইব বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন শরীরের সবই যেন আল্‌গা আল্‌গা ভাব। ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াতেই শরীরের সমস্ত গতি বন্ধ হওয়ার দরুণ বারান্দায় এমন একটি জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িলাম যেখানটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার অথচ অন্ধকারময়। খুকুনী আমাকে ধরিয়া বসিল। সে অন্ধকারে আমার মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। সেই সময় যদি সকলে আমার মুখ দেখিত তবে তখনই কান্নাকাটি পড়িয়া যাইত। মীরার (মনোমোহনের কন্যা) মৃত্যু সময় সে যেমন হাত পা লম্বা করিয়া ছড়াইয়া শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিল আমারও সেইরূপ হাত পা লম্বা-হইয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং শরীরের সমস্ত শক্তিই যেন মুখ হইতে একটা শব্দ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। খুকুনী আমাকে নিয়া ব্যস্ত [illegible] ঐ শব্দ ভাল করিয়া [illegible]নিতে পায় নাই। কিছুটা [illegible] যে পথ দিয়া লোকের [illegible]গ হয় তাহাও আমার [illegible]জা ভাবে পড়িয়া রহিল, [illegible]য় অনেকেরই মল[illegible]কে। নিরুপায় হইয়া

খুকুনী স্বামীজী, স্বামীজী বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সাধন, স্বামীজী ইহারা আসিল, কিন্তু সকলেই হতভম্ব, এমন সময় আমার মুখ হইতে বাহির হইল "পায়খানায় যাব"। তখন ঐ অবস্থায়ই পায়খানা করানো হইয়াছিল। পরে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে ঘরে লইয়া গেল। এত যে ব্যাপার তাহা আমার প্রসাদ খাওয়া হইতে আরম্ভ হইয়া দশ মিনিটের মধ্যে হইয়া গেল। অবশ্য ইহার মধ্যে আরও অনেক ব্যাপার আছে যাহা এখন প্রকাশ হইতেছে না। যদি কখনও আসে তবে বলা যাইবে। আমাকে ঘরের ভিতর আনিবার পর হইতে শ্বাসের গতি উলট পালট ভাবে চলিতে লাগিল, অর্থাৎ শ্বাস একবার বাহির হইয়া গিয়াছিল কিনা তাই উহা আবার ফিরিয়া আসিয়া নানাভাবে চলিতে লাগিল। এইভাবে তিন দিন গেল। এই তিন দিনের মধ্যে আরও দুইবার সব ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ইহার পর আরও একটি নূতন উপসর্গ দেখা দিল। আমি দেখিতে লাগিলাম যে সমস্ত পৃথিবী যেমন বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিয়াও স্থির হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ। লোকের মাথা ঘুরাইলে তাহারা যেরূপ দেখে ইহা কিন্তু সেইরূপ নয়। এদিকে শ্বাসের অবস্থা ত কতকটা পূর্ব্বের মতই ছিল এবং পেটের নাড়ীগুলিও অসাড়বৎ পড়িয়াছিল। এই সময় জল বা হরলিক্স মুখে দিলে খেয়াল হইত যে হয় ইহা উপর দিক বা নীচ দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, কারণ সেই সময় কেহ কিছু গ্রহণ করিতেছিল না। এইসব দেখিয়া খুকুনী অয়েল ক্লথ এবং বেড্ প্যান কিনিতে দিল, যদিও তাহাকে তখন বলিয়া ছিলাম যে ঐ সব কিনিয়া আনিতে আনিতে হয়ত শরীরের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া যাইবে। কাজে ও তাহাই হইল। খুকুনী ঐ সব কিনিয়া আনিল সত্য কিন্তু উহা আর ব্যবহার করা হইল না। ইহার তিন দিন পরই রথযাত্রা। শরীরের ঐ অবস্থা [illegible] লে বলিতে লাগিল যে এ অবস্থায় মাকে রথযাত্রা দেখা[illegible] তাঁহ[illegible] য়া হইতে পারে না কারণ [illegible] দেখিতে হইলে বেল[illegible] কে টে[illegible] রম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য[illegible] থাকিতে হইবে। কি[illegible] পর ঐরূপ বসিয়া থ[illegible]থ

দেখা হইল। শেষ দুই দিন অপরকে রথ দেখাইতে গিয়া রথ দেখা হইয়া গেল। আরও এক কথা আমার শরীরের ঐ অবস্থা যে হইয়াছিল তাহার জন্য পরমানন্দ সাধনকেই দায়ী করিতেছিল। কাশীতে সাধন একবার আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে বলিলে আমার মুখ হইতে তখন বাহির হইয়াছিল—"তোরা চলিয়া যাইতে পারিস, আর আমি কি চলিয়া যাইতে পারি না?" এই কথা পরমানন্দের মনে ছিল। তাই সে সাধনকে আমার অবস্থার জন্য দায়ী করিতে লাগিল। অবশ্য এ শরীরের মুখ হইতে যদি কিছু বাহির হয় উহাত আর স্মরণ করিয়া কাজে পরিণত করা হয় না; উহা আপনা হইতেই হইয়া যায়।"

এমন সময় শ্রীযুক্ত পটল দাদা মাকে আহার করার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন, কারণ এসব কথা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিতে ছিল না। তাঁহার গরজেই দিদি মাকে আহার করাইতে লইয়া গেলেন। আমরা প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

৯ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ২৬।৭।১৯৫০)

আজ বিকালে মা যখন চত্বরে বেড়াইতেছিলেন তখন এই দেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতাজী, গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত কতবার প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়?"

মা। গুরু তোমাকে যতবার উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন তুমি ততবার উচ্চারণ করিও।

ব্রাহ্মণ। কেহ বলেন যে গায়ত্রীর সহিত প্রণব দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়। কেহ বলেন তিনবার, কেহ কেহ উহা হইতে বেশী বারও উচ্চারণ করিতে বলেন। আমি আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে বলিয়া দিন যে কতবার প্রণব যুক্ত করিয়া গায়ত্রী জপ করিব।

মা। এ শরীরের কথা [illegible] চাও তবে এ শরীর [illegible]ছে—তুমিত আচার্যে[illegible] করিয়াই উপবীত ধারণ [illegible]ত্রী মন্ত্র জপ এ যাবৎ [illegible] সিতেছ?

[illegible] মাতাজী। [illegible]

মা। তাহা হইলে এখন আবার নূতন করিয়া জানিয়া লইয়া কিছু করার অর্থই হইল গুরু তোমাকে যে উপবীত ও গায়ত্রী দিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করা এবং এ যাবৎ তুমি যাহা করিয়া আসিয়াছ তাহাও ত্যাগ করা। তাই নয় কি?

ব্রাহ্মণ। হাঁ।

মা। গুরু যদি তোমাকে অশাস্ত্রীয় কিছু দিতেন তবে উহা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে চলিবার কথা হইতে পারিত। তাহা যখন নয় তখন গুরু যে ভাবে তোমাকে গায়ত্রী জপ করিতে বলিয়াছেন সেই ভাবেই জপ করা উচিত। এখন বুঝিলে?

ব্রাহ্মণ। হাঁ, মা এখন আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে। লোকের নানা কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আপনি বিষয়টি বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল মনে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার পর মা হাসিতে হাসিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপোদ্‌ঘাত' বলিয়া একটা শব্দ আছে না?"

আমি। এই শব্দটা তুমি আরও দুই একবার পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছ, কিন্তু ইহার অর্থ তুমি বল নাই।

মা। উপোদ্‌ঘাত কি জান? একটি লোকের কিছু ঘোলের দরকার। সে একজনের কাছে গিয়া বলিল, "আপনার বাড়িতে কি গরু আছে?" লোকটি উত্তর করিল, "হাঁ, আছে।" তখন আবার প্রশ্ন হইল, "ঐ গরু কি দুধ দেয়।" তখন আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "ঐ দুধ দিয়ে কি আপনি দৈ পাতেন?" উত্তর হইল হাঁ, তখন আবার প্রশ্ন হইল, "তবে বোধ হয় ঐ দৈ হইতে ঘোলও করেন?" লোকটি উহা স্বীকার করিল। এতক্ষণে প্রশ্নকর্তা বলিলেন, "তবে আমাকে একটু ঘোল দিন।" [illegible] উদ্দেশ্য হইল ঘোল নেওয়া। এতক্ষণ যে সে অবান্তর [illegible] কে [illegible] হা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের [illegible] ইহাকেই বলে উপোদ্‌ঘ[illegible] প্রশ্ন শুনিয়া যখন আমি [illegible] যে, গুরু যে ভাবে গা[illegible]তে বলিয়াছেন [illegible]প

করিও, তখন কিন্তু সে ইহা গ্রহণ করিল না। পরে যখন তাহাকে ঘুরাইয়া বলিলাম যে এখন নূতন করিয়া গায়ত্রী জপ করার অর্থই হইল—এ যাবৎকাল সে যাহা করিয়া আসিয়াছে তাহার ফল ত্যাগ করা, এমন কি উপবীত ত্যাগ করা। তখন তাহার হুঁস হইল। তখন কিন্তু সে গুরু নির্দিষ্ট পথেই আনন্দে চলিতে স্বীকৃত হইল। ইহাকেই উপোদ্‌ঘাত বলে। (সকলের হাস্য)

একবার আমরা যখন ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীতে ছিলাম তখন ভোলানাথের জ্বর হইল। এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতে আসিল। সে ভোলানাথকে খাইবার জন্য দুই শিশি ঔষধ দিল এবং বলিয়া দিল যে প্রথম এক শিশি হইতে এক দাগ ঔষধ খাইতে হইবে এবং কয়েক ঘন্টা পর অন্য শিশি হইতে আর এক দাগ ঔষধ খাইতে হইবে। এইরূপ একটির পর একটি করিয়া দুই শিশি হইতেই ঔষধ খাইতে হইবে। শিশি দুইটি দেখিয়াই আমার তখন খেয়াল হইয়াছিল যে ঐ দুইটি শিশির একটিতে শুধু জল আছে। তখন আমি ডাক্তারকে একান্তে গিয়া বলিলাম, "বাবা, আমার খেয়াল হইতেছে যে তুমি যে দুই শিশিতে ঔষধ দিয়াছ উহার একটিতে জল ছাড়া আর কিছু নাই। একথা কি সত্য?" তখন ডাক্তার বলিল, "হাঁ, মা, সত্যই এক শিশিতে শুধু জল আছে। আমাদিগকে এইরূপ ছল করিতে হয়, তাহা না হইলে রোগী সন্তুষ্ট হয় না। রোগী শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইবার জন্য বেশী ঔষধ খাইতে চায় কিন্তু বেশী ঔষধ দেওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি নয়। কাজেই রোগীর মন রক্ষার জন্য আমরা এইরূপ করিয়া থাকি।" ইহাও একজাতীয় উপোদ্‌ঘাত। অবশ্য এখানে যা যা করা হয় তাহা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া করা হয়। পূর্ব্বে উপোদ্‌ঘাত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি উহাতে মিথ্যা কিছু নাই। বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই একটি কথা [illegible] হয়।

[illegible] ভোলানাথকে ঐভাবে [illegible]তে দেখিয়া এ শরীরের [illegible] হইল যে এ শরীরও [illegible]খায়। অথচ এ শরীরের [illegible] সুখ বিসুখ নাই। [illegible] খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ

করিলে এ শরীরের মা বলিলেন, "অসুখ না হইতেই কি ঔষধ খাইতে হয়?" কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে ঔষধের গ্লাসে একটু জল লইয়া আমার মুখে দিলেন। গ্লাসের সমস্ত জলটুকুও কিন্তু মুখে দিলেন না। তখন আমি বলিলাম, তোমাদের কি ইচ্ছা যে এ শরীরের মধ্যে রোগ আসুক এবং বেশী দিন থাকুক।" ঐ কথা শুনিয়া এ শরীরের মা তখনই গ্লাসের বাকী জলটুকু আমার মুখে ঢালিয়া দিল। তখন আমি বলিলাম, "এখন দিলে আর কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। সেইদিন আমি ইহাদিগকে বলিলাম, "দেখ ত এ শরীরের জ্বর হইয়াছে কিনা। ইহারা থারমোমিটার লাগাইয়া দেখিল যে সামান্য জ্বর হইয়াছে। রাত্রিতেই ঐ জ্বর বাড়িয়া ১০৩ ডিগ্রী হইল। পরদিন সকাল বেলা আবার জ্বর নাই। ভোলানাথের সঙ্গে আমাকেও সামান্য ভাত খাইতে দেওয়া হইল। আবার বিকালের দিকে জ্বর। এই ভাবে চলিল। এক সময় আমার মুখ হইতে ৬৫ শব্দটি বাহির হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন উহা টুকিয়া রাখিয়াছিল। পরে দেখা গেল ৬৫ দিন পর জ্বর বন্ধ হইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এইবার মা চত্বর হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

১১ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, (ইং ২৭।৭।১৯৫০)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা তখনও হল ঘরে আসেন নাই। পাণ্ডেজী গীতাপাঠ করিতে ছিলেন। গীতাপাঠ শেষ হওয়ার একটু পরেই মা হল ঘরে আসিলেন। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি মাকে বলিলেন, "মহাপ্রভুর সেবা পূজার একটা বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দিন। আমি ত এখন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" মা হাসিয়া বলিলেন, "মহাপ্রভুর বন্দোবস্ত মহাপ্রভুই ক[illegible] তোম[illegible]জী বল, শিবজী বল, কি মহাপ্রভু বল—ইঁহাদের বন্দো[illegible]কে ছেঁ আর কে করিতে পা[illegible]" বৈষ্ণবের সঙ্গীর লোক[illegible]নের কথা উল্লেখ করিয়া[illegible]ক হাজার টাকা সাহা[illegible] স্পষ্ট করিয়া [illegible]রায়

হাসিয়া বলিলেন, "এ শরীর ত একটা উড়া পাখী। আজ এখানে, কালই আবার অন্য জায়গায়। তুমি যাহা বলিলে সে জাতীয় সেবা অর্থাৎ অর্থ সাহায্য বা অন্য কোনরূপ সেবা এ শরীর হইতে কখনও হয় নাই। কাহার কোন কাজে না লাগিয়াই এ শরীরটা শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া সময় কাটাইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ বৈষ্ণব এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকটি চলিয়া গেলেন।

সাধন লব্ধ কায়া এবং গুরু দত্ত কায়া

এই অবসরে আমি মাকে বলিলাম, "মা, একদিন কথায় কথায় তুমি বলিয়াছিলে যে লোকে যখন কায় মনোবাক্যে ভগবানের নাম করিতে থাকে তখন তাহার মধ্যে আর একটি কায়া সৃষ্ট হয় এবং সাত্ত্বিক বিকারাদির যে সব লক্ষণ প্রকাশ হইতে দেখা যায় তাহা ঐ কায়াতেই প্রকাশিত হয়।"

মা। হাঁ।

আমি। এখন জানিতে চাই যে এই যে কায়াটি সৃষ্ট হয়—ইহার রকম, আকৃতি কিরূপ এবং গুরু দত্ত কায়া হইতে ইহার পার্থক্য কি?

মা। লোকে সাধারণতঃ জাগতিক ব্যাপার লইয়াই মত্ত থাকে, কিন্তু তাহারা যখন ভগবানের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন হইতে থাকে। যে সব কাজ তাহাদের পূর্ব্বে ভাল লাগিত এখন ভগবানের দিকে চলিতে চলিতে দেখে যে উহাতে সে আর কোন আনন্দ পায় না। এইভাবে সে ধীরে ধীরে এক নূতন মানুষ হইয়া উঠে।

আমি। মা, তুমি ত এ কথা বল নাই যে তাহার কায়ার পরিবর্তন হয়, তুমি বলিয়াছ যে এক নূতন কায়া সৃষ্ট হয়।

মা। হাঁ, ধর একজন লোক সুস্থ শরীরে আছে; যখন তাহার জ্বর এবং বিকার হয় তখন কি তা[illegible] অবস্থা হইতে আলাদা দেখায় না? একটি লোক য[illegible] মাতাল হয় তখনও ত তাহাকে একটি নূতন মানুষ [illegible]য়। এই অর্থে আমি বলিয়াছিলা[illegible] লোক যখন ভগ[illegible] পায় বা তাঁহাকে লাভ

করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে তখন সে একটি নূতন মানুষ হইয়া যায়। তাহার এক নূতন কায়া হয়। এখন তুমি এই কায়ার রকম জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু ইহার ত কোন স্থায়ীরূপ নাই—যাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহার সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। সাত্ত্বিক বিকারাদির কথা ত তাহাদের শাস্ত্রেই আছে। ঐগুলি তখন তাহার মধ্যে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকাশও অনন্ত রকমের। এই জন্যই বলা হয় যে সাধন ভজন করিলে এক নূতন কায়া লাভ করা হয়।

এখন তোমার প্রশ্ন হইতেছে যে গুরু দত্ত কায়া হইতে এই কায়ার পার্থক্য কি? গুরু দত্ত কায়ার মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ আছে; গুরু শিষ্যকে বীজ দেন এবং উহাই শিষ্যের আধার ভেদে কখনও শীঘ্র বা কখনও বিলম্বে তাহাকে বদলাইয়া দেয়। এখানে যে সব পরিবর্তন হয় উহার একটা ধারা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে না? কাজেই সম্প্রদায় অনুসারে লোকের অনুভূতি এবং পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। এই ভাবে চলিতে চলিতে যখন পূর্ণত্বে পৌঁছান যায় তখন সকল সম্প্রদায়ের অনুভূতিই এক জায়গায় পাওয়া যায়। তখন ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য আর থাকে না। পার্থক্য ততক্ষণই যতক্ষণ লোক চলার পথে থাকে। এই জন্য বলা হয় যে যত মত তত পথ। পূর্ণত্বে পৌঁছিলে আর কোন বিরোধ বা পার্থক্য নাই।

এখন বলিতে পার যে, যে গুরু হইতে কোন দীক্ষা পাইল না তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু গুরু মাত্র একজনই। গুরু বলিতে এক জগৎ গুরুকেই বুঝায়। কাজেই কেহ যদি বাহ্যিক ভাবে দীক্ষা না লইয়াও নাম করিতে থাকে তবে কোন না কোন প্রকারে তাহার ভিতর দীক্ষার ফলও ফলিতে থাকিবে। জগৎ গুরুই ঐ ব্যবস্থা ক[illegible]। মনে কর তুমি দুইটি জমি পরিষ্কার করিয়া উহার একটিতে [illegible]ল আর অন্যটিকে কিছু করিলে না। যে জমিতে বীজ [illegible] যদি জল ইত্যাদি নিয়ম মত দিতে থাক তবে ঐ বী[illegible]হইয়া তোমাকে ফল ফল দেবে।

কিন্তু যে জমিতে কিছুই বুনিলে না উহা কি অমনি ফলিবে? উহাতেও ত গাছ হইতে দেখা যায়। এই যে গাছ হয় উহার বীজ আসে কোথা হইতে? সেইরূপ যে গুরু হইতে দীক্ষা নিয়া গুরুর উপদেশ মত কাজ করিয়া যায় তাহার মধ্যে ত গুরু শক্তি বিকাশ হইয়া তাহাকে এক নূতন মানুষ করিয়া দেয়ই, কিন্তু যে গুরু হইতে কিছুই পায় নাই তাহারও কিন্তু কোন একটা উপলক্ষ্য ধরিয়া হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। একটা গল্প আছে না যে—একজন স্নান করিতে যাইবে বলিয়া মাথায় তেল দিতেছিল এমন সময় তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল "শুনিলাম অমুকে সন্ন্যাসী হইবে বলিয়া কাপড় রঙ্গাইতেছে।" ইহা শুনিয়া স্বামী উত্তর করিল, "আগে কাপড় রঙ্গাইয়া পরে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কি ভাবে সন্ন্যাসী হয় তাহা দেখিবে? এই দেখ আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিলাম।" এই বলিয়া সে গামছা কাঁধে করিয়া তখনই চিরদিনের মত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। তোমরা আরও শুনিয়াছ যে "বেলা গেল"—এই কথা শুনিয়াই লালাবাবুর হঠাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই সব পরিবর্তনের কারণ কে? এখানে বলিতে হয় যে এই সব পরিবর্তনের কারণ এক জগৎ গুরুই। তিনি নানাজনকে নানা ভাবে কৃপা করিতেছেন।

গুরুদত্ত কায়া এবং নিজে নিজে সাধন করিয়া যে কায়া লাভ করা যায় এক অর্থে, বীজ হিসাবে, দুইই এক, কারণ দুইই জগৎ গুরু হইতে আসিতেছে; কিন্তু ইহাদের প্রকাশের ভঙ্গীটা আলাদা আলাদা। অনেকে বলে যে ভগবান ত এক, তবে সকলের অনুভূতি একরূপ হয় না কেন? নানা মুনির নানা মত কেন? ইহার কারণ এই যে তিনি এক হইয়া ও অনন্ত। তাঁহার একত্বের প্রকাশ যেমন দরকার, তাঁহার অনন্তত্বের প্রকাশ ও সেইরূপ দরকার, তাই নানা মুনির ভিতর দিয়া তাঁহার অনন্তত্বের দিকটাই প্রকাশি[illegible]হইতেছে। যখন পূর্ণত্বে পৌঁছান যাইবে তখন একের [illegible] দেখা যাইবে। সেখানে কিন্তু গুরু দত্ত কায়া এবং অ[illegible] কোন পার্থক্যই দেখা যাইবে না।

৫৪

কিছুক্ষণ আবার অন্যান্য কথাবার্তা হইতে লাগিল। মা আবার কথায় কথায় বলিলেন, কিছুই বৃথা যায় না। কিছুই হারায় না। হারাইবে কোথায়? তিনি যে সর্ব্বব্যাপী এবং তিনিই সব। কিছু থাকিলে ত কিছু হারাইবে? আমাদের নিকটই 'কিছু', তাঁহার নিকট এসব যে তিনিই, আমরা কোন জিনিষ না দেখিলেই মনে করি যে উহা হারাইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই। এই যে শিব ঠাকুর তোমরা আশ্রমের বেল গাছের নীচে বসাইয়াছ, ইনি ত কতকাল জলের নীচে পড়িয়া ছিলেন। তারপর মনোমোহন বাবা ইহাকে পুকুর হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের বাড়ীতে বেল গাছের নীচে বসাইল, পরে যখন ইনি ঢাকার আশ্রমে গেলেন তখনও ইহাকে বেলগাছের নীচে বসানো হইল। এখন কাশীতে আসিয়াও ইনি বেলগাছের নীচে বসিয়াছেন। যাহা হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া লোকে এত কাল মনে করিয়াছিল এখন দেখা যাইতেছে তাহা হারায় নাই। ইনি বেলতলায় বসিবেন বলিয়াই ইহাকে জল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং কাশী আসিবেন বলিয়াই পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছে। (সকলের হাস্য) পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে দেবতারা যে এদিকে চলিয়া আসিতেছেন তাহার কারণও এই। তাঁহারা পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া দেখাইতেছেন যে তাঁহারাও আমাদের মত এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া আসিতে পারেন।

স্বামী শঙ্করানন্দ। হাঁ, দেবতার বেলায় ত এ সব ভালই দেখায়; মানুষের বেলায়ই মুস্কিল।

মা। (হাসিয়া) তোমরা যখন এক জায়গায় মাটি কাটিয়া অন্য জায়গায় রাখ তখন তোমাদের কোন কষ্ট হয় না। যদি আজ শুনিতে পাও যে পাকিস্তানে যত গাছ আছে তাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা হইলে তোমরা হয়ত বলিবে বেশ হইয়াছে, সব পরিষ্কার হইয়া গেল। (সকলের হাস্য) [illegible] পাও যে ঐখানে পোকা মাকড় বা পশুপক্ষী মারিয়া ফে[illegible]কে [illegible]াহা হইলেও তোমাদের কষ্ট হইবে না। তোমাদের [illegible] হইতেই মানুষের কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইতেছে, কিন্তু [illegible]ছ যে সবই এক [illegible]

স্বামী শঙ্করানন্দ। এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার একটি মাত্র ছেলে ছিল এবং অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াই মারা গেল। আমি ভদ্র লোকের বাড়ীতে একদিন গিয়াছি, গিয়া দেখি যে তিনি ঝাঁটা দিয়া উঠান পরিষ্কার করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আজ যদি ভগবানকে পাইতাম তবেই ঝাঁটা দিয়া পিটাইয়া তাহাকে শেষ করিতাম।" শুনিলাম যে ভদ্রলোক ঐ দিনই সংবাদ পাইয়াছেন যে তাহার ছেলে পরীক্ষায় খুব ভাল পাশ করিয়াছে।

মা। দুঃখে ভগবানকে ঝাঁটা মারিতে যাওয়া ভাল। কখন কি ভাবে যে ভগবান কাহার নিকট নিজকে প্রকাশ করিবেন তাহা বলা শক্ত। একটা গল্প আছে না যে—একজন গণেশকে খুব নিষ্ঠার সহিত পূজা করিত, কারণ তিনি সিদ্ধি দাতা গণেশ, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। কিন্তু বহুদিন পূজা করিয়াও যখন সে গণেশের কোন সাড়া পাইল না, তখন সে রাগ করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিবে বলিয়া ঠিক করিল। এইরূপ ঠিক করিয়া সে অন্য দেবতা আনিয়া গণেশের পাশে বসাইল। ইহার পর যখন সে সেই দেবতার পূজা করিতে যাইবে তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল যে গণেশের কাছে বসিয়া এই দেবতার পূজা করিলেত গণেশ আমার সব মন্ত্র শুনিয়া ফেলিবে, তাহা কিছুতেই হতে দিব না। এই ভাবিয়া সে তুলা দিয়া গণেশের কান বন্ধ করিতে গেল! যখন কান বন্ধ করিয়া সে ফিরিয়া আসিতেছে তখন হঠাৎ গণেশ তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "তুই কি চাস্?" ইহা দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গণেশকে বলিল, "ঠাকুর এতদিন তোমার পূজা করিলাম তখন তুমি দেখা দিলে না। আর আজ যখন রাগ করিয়া তুলা দিয়া তোমার কান বন্ধ করিলাম তখনই তুমি দেখা দিলে। বলত ইহার [illegible] কি?" গণেশ বলিলেন, এতদিন তুই আমার পূজা করিয়াছিস [illegible] মার উপর তোর বিশ্বাস ছিল না। আজ তুই সত্য স[illegible] রিয়াছিস যে আমি কানে শুনিতে পা[illegible]" (সকলের হাস্য) ৫৪ [illegible]

আরও একটি গল্প শুন। একজন এক বিগ্রহ পূজা করিত। সেই বিগ্রহের উপর তাহার খুব বিশ্বাস না থাকিলেও সে বিশ্বাস করিত যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন! একদিন সে বিগ্রহকে ভোগ দিবার জন্য সম্মুখে রুটি রাখিয়া ঐ রুটিতে মাখাইবার জন্য ঘি গরম করিতে গেল। এদিকে এক কুকুর আসিয়া ঐ রুটি লইয়া পালাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া লোকটি কুকুরের পিছু পিছু ছুটিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু, রুটিতে এখনও ঘি মাখানো হয় নাই, একটু দাঁড়াও, আমি উহাতে ঘি মাখিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিতেছে আপ্রাণ কুকুরের পেছনে দৌড়াইতেছে। যখন আর চলিতে পারে না, সেই মুহূর্তে ভগবান তাহার নিকট নিজকে প্রকট করিলেন। তাই বলিতে ছিলাম যে কখন, কি ভাবে, কাহার নিকট ভগবান নিজকে প্রকট করিবেন তাহা বলা যায় না।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। খুকুনী দিদি মাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলেন, মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মা উপরে যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, "দেখ, কেহ গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়া এবং গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে কিছু অনুভূতি পাইয়া যদি এ কথা বলে যে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা না লইয়া কিছু করিলে উহাতে কোন ফলেরই আশা নাই তবে মনে করিতে হইবে যে ইহা বলা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে বলিতেছে গুরুর নিকট দীক্ষা না নিলে কিছুই হইবে না। তাহার কিন্তু একটা দিক অন্ধকার থাকিয়া যাইতেছে অর্থাৎ চাক্ষুষ ভাবে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা না পাইয়াও যে কিছু হইতে পারে তাহা সে জানে না। আবার গুরুর নিকট হইতে চাক্ষুষভাবে দীক্ষা না লইয়া ও যাহার ভিতরটা খুলিয়া গিয়াছে সেও বলিতে পারে যে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা পাওয়াটা কিছু নয়। ভগবানের অনুভূতি আপা[illegible] তাহ[illegible] [illegible]কে টে[illegible]। এগুলি সবই আংশিকভাবে সত্য। পূর্ণসত্যে পৌঁছিলে [illegible]পর বিরুদ্ধ আংশিক সত্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ব[illegible] ব

১২ই শ্রাবণ, শুক্রবার (ইং ২৮।৭।১৯৫০)

আজ সকালবেলা পাঠের পর কোন তত্ত্বালোচনা হইল না। আগামী গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে যে উদয়াস্ত নাম রক্ষা করা হইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "তোমাদের যখন লোকসংখ্যা কম তখন মঞ্চ তৈয়ার করিলে অসুবিধা হইতে পারে। কারণ মঞ্চ তৈয়ার করিলে প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন করিতে হইবে। মঞ্চে ঠাকুর দাঁড়াইয়া থাকিবেন আর তোমরা সকলে বসিয়া বসিয়া কীর্তন করিবে। তাহা ত হইতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে হল ঘরে একখানা আসন সাজাইয়া উহাতে ঠাকুর রাখিলে, তোমরা কখনও বসিয়া এবং কখনও দাঁড়াইয়া কীর্তন করিতে পারিবে। তোমরা এখন যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিও। "হল ঘরের মধ্যে মঞ্চ তৈয়ার করিয়া কীর্তন করা হইবে, কি হল ঘরের এক ধারে ঠাকুর বসাইয়া কীর্তন করা হইবে—ইহা লইয়া ভক্তদের মধ্যে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এবং ইহার জন্য কিছুক্ষণ ভোটাভোটিও হইল। শেষে দেখা গেল যে অধিকাংশ লোকের মত হইল বসিয়া কীর্তন করা। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, আমি মার কথা শুনিয়া প্রথম হইতে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে বসিয়া বসিয়া কীর্তন করাই মায়ের ইচ্ছা। ইহা লইয়া এত কথা এবং ভোটাভোটির প্রয়োজন ছিল না। কীর্তন করিতে করিতে যদি কাহারও মঞ্চ প্রদিক্ষণ করিবার ইচ্ছা হয় তবে আমার এমন যোগ বল আছে যে ইচ্ছামাত্রই আমি মঞ্চ খাড়া করিয়া দিতে পারিব"। স্বামীজীর কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এ শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই ত এই কথা বলিতেছ? তবে ইহাও জানিয়া রাখ যে আমিও কিন্তু আনন্দময়ী তৈয়ার করিয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া মা মনোজ (চ্যাটার্জী) দাদার মেয়ে শ্রীমতী বুবাকে ডাকিলেন। সে আসিয়া মায়ের আদেশ মত মাথায় কুণ্ডল দিয়া চূড়া বাঁধিল এবং মা [illegible] অনেক সময় বসে সেই ভঙ্গীতে বসিল। মা তাহার [illegible] মালা পরাইয়া দিলেন। ভক্তগণ মা[illegible] যে সব মিষ্টি [illegible] বুবার সম্মুখে সেই সব

মিষ্টি ধরিয়া দিলেন এবং তাহাকে একটি গান করিতে বলিলেন। শ্রীমতী বুবা একটি গান করিল, দেখিলাম যে মা গান করিবার সময়ে যেরূপ তন্ময় ভাবে কখনও স্পষ্ট এবং কখনও অস্পষ্ট স্বরে গান করেন, সেও মায়ের গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গী সুন্দর রূপে অনুকরণ করিয়া সেইরূপে গান করিল। শ্রীমতী বুবার এই আনন্দময়ীর অভিনয় দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন এবং সে যে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছে তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিলেন। মা হাসিতে হাসিতে আবার বলিলেন, "তোমরা যেমন আমাকে মঞ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে পার, আমিও কিন্তু দ্বিতীয় আনন্দময়ী দিয়া ঐ মঞ্চের কাজ করাইয়া লইতে পারি।" মায়ের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। আজ সকাল বেলাটা এইরূপ আনন্দে কাটিয়া গেল। বেলা ১২টা বাজিলে আশ্রম হইতে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

নাম যজ্ঞের অধিবাস

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী মৈথিল্যানন্দ মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহারাজকে খুব ভক্তিমান বলিয়া মনে হইল। শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন। আমি প্রথম হইতে উপস্থিত ছিলাম না। শেষের দিকে গিয়া শুনিলাম যে মহারাজ বিদায় লওয়ার প্রাক্কালে মাকে বলিতেছেন, "মা, আপনার অনেকটা সময় নিলাম।"

মা। সময় কি? না স-ময় অর্থাৎ তিনিই সর্বময়। আমার সময় বলিয়া কিছু নাই। আজ কয়েকদিন যাবৎ ঘুমের কোন ভাবই নাই। একেত ২টা ২।।টার পূর্ব্বে শোয়া হয় না। তারপর বিছানায় শুইয়াও কেবল এ পাশ আর ও পাশ।

মহারাজ। ঘুমের আনন্দের চেয়ে ধ্যান করার আনন্দ অনেক বেশী।

মা। ধ্যান করিতে [illegible]কে টে যদি ধ্যান হইয়া যায় তবেই আনন্দ। ধ্যান করা ত প[illegible]। পরিশ্রমে আনন্দ কোথায়? তবে আমি এতটা সময়[illegible] বলিয়া একটা [illegible]বের আনন্দ

পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত আনন্দ নয়। ধ্যান যখন হইয়া যায় তখনই প্রকৃত আনন্দ। তবে তিনি ধ্যান হওয়ার আনন্দ দিবেন বলিয়াই ধ্যান করান, কারণ এই ধ্যান করার ইচ্ছাটাই বা আসে কোথা হইতে?

মৈথিল্যানন্দ মহারাজ মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মাও 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রতি নমস্কার জানাইলেন।

আগামী কল্য উদয়াস্ত নাম যজ্ঞ হইবে, উহার অধিবাস আজ হইল। হল ঘরের এক ধারে একটি মঞ্চ করা হইয়াছে। তাহা ফুল পাতা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছে। মঞ্চের চারিদিকে শ্রীশ্রীমায়ের ফটো, চৈতন্যদেব এবং শিবজীর ছবি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মনোজদাদা পূজাদি করিলেন। পরে মঞ্চ পরিক্রমা করিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল। দিল্লী হইতে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীমান্ কানু আসিয়াছে। পাটনা হইতে কয়েকজন নূতন ভক্ত আসিয়াছেন, সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। মাও কীর্তনের সঙ্গে মঞ্চ পরিক্রমা করিলেন। ইহার পর অধিবাস শেষ হইলে আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় শ্রীমান্ ভূপেন আসিয়া আমাকে ডাকিল। নীচে গিয়া দেখি যে অন্নপূর্ণা এবং কালীর প্রসাদ লইয়া আসিয়াছে। মা-ই তাহাকে দিয়া এই প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের এত কৃপা পাইয়াও নিজের ভিতর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি না। এরূপ দুর্ভাগ্য আর কাহার আছে?

গুরু পূর্ণিমা

১৩ই শ্রাবণ, শনিবার (ইং ২৮।৭।১৯৫০)

আজ গুরু পূর্ণিমা। সক[illegible]া ৭টার সময় আশ্রমে গেলাম। হল ঘরে গিয়া দেখি যে ভূ[illegible]তি কীর্তন করিতেছে। আমি প্রায় ৯টা পর্যন্ত ঐখানে বসিয়া [illegible]ম। পরে উপরে আসিয়া দেখি যে [illegible] মা নাম কীর্ত[illegible] যেখানে সাবিত্রী যজ্ঞ

হইয়াছিল সেই যজ্ঞ কুণ্ডের উপর কুশ দিয়া একখানা কুটীর করা হইয়াছে। ঐ কুটীরের বেড়াগুলিও কুশাসন দিয়া তৈয়ারী। মা ঐ ঘরে বসিয়া আছেন আর ভক্তগণ দলে দলে মাকে ফল, ফুল এবং মালা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। মা যে দিন কাশী আসিয়া ছিলেন সেই দিন এই কুটীর এবং চত্বরের দক্ষিণ দিকের নূতন মন্দির দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে গুরু পূর্ণিমার দিন এই মন্দির এবং কুটীরের গৃহ প্রবেশ উৎসব হইবে। মাকে কুটীরে আসীন দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই ভাবেই বোধ হয় গৃহ প্রবেশ উৎসব হইতেছে। মাকে যখন সকলে ফুল, ফল দিতেছিল সেই সময় একটি পশ্চিমা লোক আসিয়া মায়ের কোলে কিছু চাউল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মা আমাদিগকে ঐ চাউল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, আমাকে ভিক্ষা দিয়াছে।" এই বলিয়া মা আঁচল হইতে চাউলগুলি ঢালিয়া রাখিলেন। ভিতরে আর ও কি হয় তাহা দেখিবার জন্য আমি একটু অগ্রসর হইয়া কুটীরের কাছে গেলাম। মা তখন তুলসী পত্রের একটি মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "অমূল্য, তুমি এই তুলসীপত্র লও।" আমি হাত পাতিয়া তুলসীপত্র গ্রহণ করিতেই মা আবার বলিলেন, "তুমি যখন কাছে আছ, তোমাকে একটা মালাও দিতেছি। এই বলিয়া গলা হইতে একটি গোলাপের মালা খুলিয়া আমাকে পরাইয়া দিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলাম। মনোজদাদা প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও একটি করিয়া মালা পাইলেন। ইহার পর মা কুটীর হইতে বাহির হইয়া নূতন মন্দিরের দিকে চলিলেন। আমরাও পিছু পিছু চলিলাম। মাকে মন্দিরে না নিয়া তাঁহাকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। মহিলাগণ মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। খুকুনীদিদি আমাকে বলিলেন, "মাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলে কেহই মায়ের কা[illegible]তে পারিবে না, সেইজন্য মাকে এখানে আনিয়াছি। যে মাকে [illegible]কে [illegible] দিতে ইচ্ছা করে সে এখানে দিতে পারিবে। "আমি[illegible] মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম

না। বাসায় আসিয়া গঙ্গা স্নান করিতে গেলাম, পরে যখন আশ্রমে গেলাম তখন মাকে নূতন মন্দিরে দেখিতে পাইলাম এবং শুনতে পাইলাম যে এইখানে দীক্ষা জাতীয় একটি ব্যাপার হইয়াছে কিন্তু ব্যাপারটা যে কি হইয়াছে তাহা দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিলাম না। একটু পরেই মা মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির উপর বসিলেন এবং সকলকে ফল ও মিষ্টি প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। যত লোক উপস্থিত ছিল, ইহাদের সংখ্যাও একশতের কম হইবে না। প্রত্যেকেই প্রসাদ পাইল। আমিও ফল, মিষ্টি প্রসাদ পাইয়া ঐ গুলি বাসায় রাখিয়া আবার আশ্রমে গেলাম। তখন প্রসাদ বিতরণ শেষ হইয়াছে। মা তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। ঘরখানাও লোকে পরিপূর্ণ। আজ যে ব্যাপার হইয়াছে সেই সম্বন্ধে মা যেন কি বলিতেছিলেন। আমি দূরে ছিলাম বলিয়া উহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটা জানিয়া নিব।

কিছুক্ষণ পর মা হল ঘরে গেলেন। সেখানে মেয়েরা কীর্তন করিতেছিলেন। মাও তাহাদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিয়া মঞ্চ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বেলা ১১টা পর্যন্ত চলিল। এই সময় ছেলেরা আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলে মা মেয়েদের নিয়া উপরে চলিয়া আসিলেন। আজ দুপুরের সময় সকলেই আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম।

আজ সন্ধ্যার পর আশ্রমে কতকগুলি ফিল্ম দেখানো হইল। কান্তি ভাই যখন মাকে আমেদাবাদে নিয়াছিলেন তখন ইহার কতকগুলি উঠান হইয়াছিল। আর বাকীগুলি সাবিত্রী যজ্ঞের সময় এখানে উঠান হইয়াছে। ছায়া চিত্রে মাকে চলিতে ফিরিতে এবং কথা বলিতে দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। আশ্রমে বায়স্কোপ দেখানো হইতেছে এই খবর পাইয়া মাল্লা মেয়েরা তাহাদে[illegible]হলে পেলে সহ তামাসা দেখিতে আশ্রমে আসিয়া ভিড় করিল [illegible]মে দেখানো হইয়া গেলেও তাহারা চত্বরের উপর বসিয়া গল্প গুজব কু[illegible]

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। খণ্ড খণ্ড কাল মেঘের উপর পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে। তরঙ্গশূন্য গঙ্গাবক্ষে উহা প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতেছি। এমন সময় শ্রীশ্রীমা আসিয়া মাল্লা মেয়েদের মধ্যে দাঁড়াইলেন, উহাদের যেরূপ মলিন বেশভূষা ছিল তাহাতে মনে হয় না যে কাহারও উহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু করুণারূপিণী আমাদের মায়ের চন্দন বিষ্ঠাতে সমজ্ঞান। তিনি যেন উহাদের কত আপন জন—এই ভাব লইয়া উহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কথা বলিতে লাগিলেন। ইহারা ত আনন্দেই আত্মহারা। ইহারা কখনও কল্পনা করিতে ও সাহস পায় নাই যে মা তাহাদেরই মত একজন হইয়া তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবেন। মা ভিতর হইতে বাতাসা আনাইয়া ইহাদিগকে নিজ হাতে বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রসাদ পাইবার জন্য ইহাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মা নিজ হাতে প্রসাদ দিতেছেন দেখিয়া আমাদের কমল (ব্রহ্মচারী) দাদা আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কাছে হাত পাতিয়া দাঁড়াইলেন। এ প্রসাদ যে শুধু এ সব মাল্লা মেয়েদের জন্য ইহা তাঁহার জানা ছিল না। মা কমল দাদার হাতে প্রসাদ দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ দাঁড় টানিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। এইভাবে প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে মা আসিয়া তাঁহার আসনে বসিলেন। এমন সময় মৌনের ঘন্টা পড়িল। আমরা মাকে সম্মুখে রাখিয়া ভগবদ্ ধ্যানে বসিয়া গেলাম। মৌন শেষ হইলেই মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরা কিছুক্ষণ ঐখানে থাকিয়া শেষে বাসায় আসিলাম।

১৪ই শ্রাবণ, রবিবার (ইং ৩০।৭।১৯৫০)

গতকল্য পাটনা হইতে সন্তোষ (মুখার্জি) বাবু আসিয়াছেন। তিনি মায়ের নূতন ভক্ত। মা-ই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছেন। তিনি আজ সকাল বে[illegible]লীলা কীর্তন করিলেন। তাঁহার কীর্তন শুনিয়া সকলেই স[illegible]বেলা ১০।।টা[illegible] কীর্তন শেষ

হইল। ইহার পরই পাঠের সময়। শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে সকলেই পাঠ শুনিতে নারাজ। সেই জন্য স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, "পুস্তক হইতে কিছু পড়িলেই যে পাঠ হইল তাহা নহে। মায়ের সঙ্গে সমালোচনাও ধর্ম গ্রন্থ পাঠের তুল্য, তুল্য কেন? অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

মা। (হাসিয়া) ইহারা দয়ালরূপে আমাকে কৃপা করিতেছে। এক আছে, দীন ভাব। যদি কাহার মধ্যে ঠিক ঠিক দীনভাব ফুটিয়া উঠে তখনই তাহার নিকট দয়ালের প্রকাশ হয়। ইহা হইতেই হইবে। আবার কাহারও কাহারও স্বভাব এমন যে তাহারা কিছুতেই নিজকে দীন করিতে পারে না। কিছুতেই তাহাদের মাথা নত হইতে চায় না। তাহাদের নিকটও দয়ালের প্রকাশ হয়, কারণ তাহাদিগকে দীন করিতে হইবে কিনা। দয়ালরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া ভগবান তাহাদিগকে দীন করেন, কারণ তিনি যে দীন নাথ। এ শরীরের ত কোন দীনভাব নাই, সেইজন্য বাবারা দয়ালরূপে এ শরীরকে কৃপা করিতেছে। (সকলের হাস্য) (মুক্তি বাবাকে দেখাইয়া) সে দিন বাবাজীকে বলিতেছিলাম যে পাখার বাতাস খাও। পাখার বাতাস কি? যাহা হইতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুটা কমে। গঙ্গার ধারে বসিয়া থাকিলে গঙ্গার বাতাসে শরীর জুড়াইয়া যায়। গঙ্গা হইতে অনেক সময় এমন বাতাস আসে যে তাহাতে পাখা পর্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন আর পাখা চলে না। কিন্তু গঙ্গার ধারেও যখন বাতাস থাকে না তখনই গরমে শরীরের জ্বালা পোড়া উপস্থিত হয়। তখন পাখা দিয়া বাতাস করিলে কিঞ্চিৎ আরাম পাওয়া যায়। তবে গঙ্গার বাতাসের মত পাখার বাতাসে আনন্দ নাই; কারণ হাত দিয়া বাতাস করাও একটা পরিশ্রমের কাজ। তাই বলিতে ছিলাম যে ধ্যান, জপ এগুলি হইল পাখা দিয়া বাতাস করার মত। ইহাতে কষ্ট আছে আবার আরামও আছে। কাজ করিলে উহার ফল থাকিবেই। গঙ্গার বাতাসের মত ভগবৎ কৃপা অনুভব করিবার পূর্বে ধ্যান, জপ লইয়া থাকিলে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়।

দেবশঙ্কর বাবু। ভগবান বলিতে আমরা কি বুঝিব?

মা। যাঁহার রাজ্যে কিছু হারায় না তিনিই ভগবান। কারণ হারাইবে কোথায়? তিনিই যে সব সর্বরূপে, সর্বভাবে তিনি, আবার নিরাকার অদ্বয় রূপেও তিনি। 'আছে' রূপেও তিনি, 'নাই' রূপেও তিনি। আবার 'আছে' ও 'নাই' যেখানে টেকে না সে রূপেও তিনি। যদি কেহ বলে যে তাহার উপাস্য কালী ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই, তবে ঐ কালীই হইল তাহার ভগবান। আবার কেহ যদি বলে যে তাহার কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু নাই। তবে ঐ কৃষ্ণ হইল তাহার ভগবান। যাহা ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু নাই—তাহাই ভগবান।

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী। তাহা হইলে ত বিষয়ও ভগবান। কিন্তু বিষয় কি ভগবান বলা যায়?

মা। (হাসিয়া) বিষয় কি? না বিষ হয়। যাহা বিষ হয় তাহা কি ভগবান হইতে পারে? (হাসিতে হাসিতে) না, না, বিষয় ভগবান নয়।

শাস্ত্রী মহাশয়। দিদিমা (অর্থাৎ শ্রীশ্রী মায়ের মা) বলিতেছেন যে বিষয় ও ভগবান কারণ বিষয়ের মধ্যে ভগবান আছেন বলিয়াই বিষয় আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

মা। (আবার হাসিতে হাসিতে) হাঁ, হাঁ, বিষয় ভগবান (সকলের হাস্য)।

এই সব কথা বার্তা বলিতে বলিতে বেলা ১১।।টা বাজিয়া গেল। মায়ের ভোগের সময় হইয়াছে। সেই জন্য লোক ও আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মা এবার উঠিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে গতকল্য মা যখন কুশের কুটীরে বসিয়া ছিলেন তখন একটি লোক আসিয়া মায়ের কোঁচড়ে কিছু চাউল ঢালিয়া দিয়াছিল। আজ ঐ চাউল দিয়া পোলাও রান্না করিয়া মাকে ভোগ দেওয়া হইয়াছে। দুপুর বেলা শ্রীমতী বুনীকে দিয়া আম, মিষ্টি এবং ঐ পোলাও মা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা বাড়ীতে বসিয়া বসি[illegible] প্রসাদ পাইতেছি।

সন্ধ্যার পর পাটনার সন্তোষ বাবু কীর্তন করিলেন। এখানকার কীর্তনীয়া গণেশবাবুও দল বল সহ ঐ কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ঐ কীর্তন হইল! পাটনা হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা আজ চলিয়া যাইবেন। এই জন্য রাত্রি ১১।টা পর্যন্ত একের পর এক তাহারা মায়ের কাছে তাহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় নিবেদন করিলেন।

আমি রাত্রি ১১।টার সময় বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বিগ্রহের অভাবেও বিগ্রহের প্রকাশ হইতে পারে
১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ১।৮।৫০)

আজ ১০টার পর আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা হল ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। হল ঘরে আরও অনেক লোক। রামকৃষ্ণ মিশনের মৈথিল্যানন্দ মহারাজও আজ আসিয়াছেন। গঙ্গাদিদি মার কাছে বসিয়া কি যেন বলিতে ছিলেন এবং মাও উহা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে ছিলেন। গঙ্গাদিদি আজই কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পথে আসিতে আসিতে তাঁহার উপাস্য গোপাল বিগ্রহটি চুরি গিয়াছে। একটি বালক বাস্তুহারা বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গঙ্গাদিদির স্নেহ আকর্ষণ করিয়া মেয়েদের গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে। পরে গঙ্গাদিদির নিদ্রার সুযোগ লইয়া ঐ বালকটিই বিগ্রহ চুরি করিয়া পাটনার নিকট কোন ষ্টেশনে নামিয়া যায়। আজ ১৬ বৎসর যাবৎ গঙ্গাদিদি এই বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাকে হারাইয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। স্থূল ভাবে এখন ঐ বিগ্রহের পূজা করা সম্ভব নয় বলিয়া মা তাঁহাকে মানস পূজার উপদেশ দিয়াছেন। মায়ের নিকট বিগ্রহ চুরির গল্প শেষ করিয়া গঙ্গাদিদি যখন চলিয়া গেলেন তখন দেবশঙ্করবাবু মাকে বলিলেন, এতকাল যাহাকে সেবা করা হইল তিনিই শেষে এই ভাবে দুঃখ দিয়া গেলেন। ছেলেটির বিগ্রহ চুরি করিবার উদ্দেশ্য বা কি হইতে পারে?

মা। বিগ্রহের গায়ে ছোট ছোট [illegible] গহনা ছিল, ঐ গহনার জন্যই হউ[illegible] গ্রহটিকে সো[illegible] গাই হউক সে উহা

চুরি করিতে পারে। আবার বিগ্রহটিকে সেবা পূজা করিবে বলিয়াও তাহার লোভ হইতে পারে। পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিবার সময় অনেকের বিগ্রহই নানাভাবে খোয়া গিয়াছে, কখন যে তিনি কি ভাবে এবং কাহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবেন তাহা তিনিই বলিয়া দেন। এ সম্বন্ধে 'নারায়ণের কথা' এখন নারায়ণের মুখেই শুনা যাক।

এই বলিয়া মা নারায়ণ স্বামীকে তাঁহার শালগ্রামের কথা হিন্দীতে বলিতে বলিলেন, কারণ শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন এতদ্ দেশীয় লোক ছিলেন যাহারা বাংলা কথা একেবারেই বুঝিতে পারেন না।

নারায়ণ স্বামী মায়ের আদেশ পাইয়া তাঁহার শালগ্রাম শিলার কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যে শালগ্রাম আমি এ যাবৎ কাল পূজা করিয়া আসিতেছিলাম উহা আমাদের বংশে প্রায় ১৫০ বৎসর যাবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আমার প্রপিতামহের সময় হইতেই ইনি আমাদের বাড়ীতে আছেন। পূর্ব্বে আমি আমার পিতাকে এই শালগ্রাম পূজা করিতে দেখিয়াছি। পিতার অভাবে আমার পিসীমাতো ইহার পূজা করিয়াছেন; যখন পিসীমাতার অভাব হইল তখন আমি এই শালগ্রামকে পূজার জন্য অন্য এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলাম। কারণ আমাকে চাকুরী করিয়া খাইতে হয়। শালগ্রামের সেবা পূজা বিধিপূর্ব্বক করিতে গেলে আর চাকুরী করা চলে না। কিছুদিন অতীত হইলে একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতেছি একটি ছোট বালক উপরে দাঁড়াইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, "আমাকে যেখানে রাখিয়াছ ঐখান হইতে আমাকে লইয়া আস, কারণ ঐখানে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" এই স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিলাম। ইহার কিছুদিন পর আবার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলাম, সে বারও ঐ বালক আমার গলা ধরিয়া বলিল, "তোমাকে একবার বলিয়াছি যে ঐখানে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, ঐখান হইতে আমাকে তোমার কাছে লইয়া আস।" এইবার স্বপ্ন দেখিয়া মাকে (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীকে) এই স্বপ্নের কথা বলিলাম, মা আমাকে শালগ্রাম [illegible]তে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার

উপদেশ সত্ত্বেও আমি ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য উহা আনিলাম না। এইভাবে কিছুদিন গেলে আবার একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে ঐ বালক আবার আমার গলা জড়াইয়া বলিতেছে, "তোমার কাছে আনিবার জন্য দুইবার তোমাকে বলিলাম, কিন্তু তুমি তাহা শুনিলে না। ওখানে যে আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" আমিও স্বপ্নে ঐ শিশুকে বলিলাম, "আমি সামান্য চাকুরী করিয়া খাই। তোমাকে আমি কি খাইতে দিব এবং কখন দিব?" ইহাতে বালকটি উত্তর করিল, "তুমি যখন যাহা দিবে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।" এই স্বপ্ন দেখিবার পরই আমি আমাদের শালগ্রামটি নিজের কাছে আনিয়া সেবা পূজা আরম্ভ করিলাম। একদিন হইয়াছে কি, শালগ্রামটিকে একটি পাথরের বাটিতে রাখিয়া দিয়া আমি একটু দূরে বসিয়া পূজা করিতেছি, পূজা শেষ হইলে যখন শঙ্খ ধ্বনি করিলাম তখন দেখি কি যে ঐ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শালগ্রামটি পশ্চিম মুখ হইতে উত্তর মুখে হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে শঙ্খধ্বনি করিলে যে বায়ুর আলোড়ন হয় উহার বেগেই বোধ হয় এরূপ হইয়াছে। কিন্তু এতদূর হইতে ঐ বাতাস শালগ্রামের গায়ে লাগারও সম্ভাবনা কম। যাহা হউক আমি যখন আবার শঙ্খধ্বনি করিলাম তখন শালগ্রামটি উত্তর মুখ হইতে পূর্ব মুখ হইয়া গেল। দুইবার এইরূপ হইতে দেখিয়া আমি বাড়ীর অন্যান্য লোকদিগকে ডাকিয়া আনিলাম এবং তাহাদের সম্মুখে আবার শঙ্খধ্বনি করিলাম। তখন শালগ্রামটি পূর্ব্ব মুখ হইতে দক্ষিণ মুখ হইয়া গেল। পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলে দক্ষিণ মুখ হইতে আবার পশ্চিম মুখ হইল। যাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমি এই সব দেখাইতেছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "ঠাকুর লইয়া এইরূপে খেলা করিতে হয় নাকি?"

ঐ কথা শুনিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। শ্রীশ্রী মায়ের কথায় আমি এই শালগ্রাম শিলা লইয়া বিন্ধ্যাচলে যাই। সেখানে অন্যান্য লোকের মধ্যে মা আমাকে বলিলেন, "তুমি বলিয়া[illegible]লে যে শঙ্খ বাজাইলেই তোমার ঠাক[illegible]ড়িয়া উঠে। ই[illegible]া দেখাও ত"। শ্রীশ্রী

মায়ের ঐ কথা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম আজ শঙ্খ বাজাইলে ঠাকুর নড়িবেন কিনা কে জানে? যদি না নড়েন তবে সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিবে। আমি ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর, আমাকে মিছামিছি মিথ্যাবাদী বানাইয়া লজ্জা দিও না।' কাতর প্রাণে বার বার এই প্রার্থনা জানাইয়া আমি উঠিয়া শঙ্খধ্বনি করিলাম। তখন দেখা গেল যে ঐ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, উপস্থিত সকলেই ইহা দেখিতে পাইলেন।" নারায়ণ স্বামী শালগ্রাম সম্বন্ধে আরও ২।৩টি গল্প বলিলে মা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সেবার ত্রুটি হইলেও তিনি চলিয়া যান। এই মাত্র শুনিলে যে নারায়ণ বলিতেছেন যে অমুকের নিকট তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। তাঁহাকে যেন ঐখান হইতে লইয়া যাওয়া হয়"।

দেবশঙ্কর বাবু। গঙ্গা দিদির বেলায় যে সেবার কোন ত্রুটি হইয়াছে তাহা ত মনে হয় না। তবে কিজন্য গোপাল চলিয়া গেলেন?

মা। কিজন্য গোপাল চলিয়া গেলেন তাহা বলিবার খেয়াল হইতেছে না। তবে তুমি বলিতেছিলে না যে, তিনি এতদিন সেবা গ্রহণ করিয়া দুঃখ দিলেন কেন উহার উত্তরে বলা যায় যে তিনি এই দুঃখের ভিতর দিয়া কোন রূপে ফুটিয়া উঠিবেন তাহা তিনিই জানেন, এই গোপালের জন্য গঙ্গা আজ খুব কান্নাকাটি করিয়াছে। এতদিন যাহাকে নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে তাঁহার অভাবে দুঃখ হইবারই কথা। তবে ভগবানের জন্য কান্নাকাটি করা ভাল। যত বেশী কান্নাকাটি করা যায় ততই ভাল, কারণ ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। এক হয় যে, কাহারও বিগ্রহ চুরি গেল, সে উহার জন্য দুই চারি দিন কান্নাকাটি করিয়া পরে শান্ত হইয়া গেল। এখানে বুঝিতে হইবে যে এ বিগ্রহের সহিত তাহার প্রাণের বিশেষ যোগ ছিল না। যত বেশী প্রাণের যোগ থাকিবে ঐ বিগ্রহের অভাবও তত বেশী হইবে এবং উহা [illegible] বেশী দিন স্থায়ী হইবে। হয়ত শেষে এই বিরহ মধ্য দিয়াই তাঁ[illegible] হইয়া যাইবে।

এরূপও শুনা যায় যে, এক ব্যক্তি কাহাকেও সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করা সম্বন্ধে নিরস্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহার ধ্যান লইয়া থাকিত। কিছুদিন ধ্যান করিতে করিতে ঐ ধ্যানের মূর্তি তাহার নিকট এমন সজীব হইয়া উঠিল যে যখন ঐ ব্যক্তি স্বশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল "আমি ত তোমাকে কোন দিন চাই নাই।"

মৈথিল্যানন্দ। এরূপও হইতে পারে যে, বিগ্রহের জন্য ব্যাকুলতা হইতে ঐ হারান বিগ্রহ আবার পাওয়া যাইতে পারে।

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ পাইলে যে আনন্দ হইবে তাহা কিছু লাভ করার আনন্দ। ঐ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী নাও হইতে পারে কারণ ঐ বিগ্রহ ত আবার হারাইয়াও যাইতে পারে। কাজেই জাগতিক ভাবে কিছু পাওয়ার চেয়ে অন্যভাবে পাওয়ার মূল্য বেশী।

স্বামী শঙ্করানন্দ। গোপাল যে হারাইয়াছে—ইহা গঙ্গাদিদির পক্ষে ভালই হইয়াছে। এতদিন তাহার সাকার সাধনা চলিতেছিল, এখন হইতে তাহার সাধনা হইবে নিরাকার। আর তাহাদের সম্প্রদায় ত ভেদাভেদ বাদই মানে।

মা। হাঁ, নিম্বার্ক সম্প্রদায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন।

দেবশঙ্কর বাবু। যাহাকে দ্বৈত্বাদ্বৈতবাদ বলা হয় উহা দ্বৈত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। উহাকে অদ্বৈত বলা যায় না। দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুইটি পৃথক বস্তু। এই দুইটির মিশ্রণ হইতে পারে না।

দেবশঙ্কর বাবু এই কথাগুলি বেশ জোর দিয়া বলিলেন, মা উহা শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না। দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মধ্যে যে কোন বিরোধ নাই—এ কথা মা বহুবার দেবশঙ্কর বাবুকে বলিয়াছেন এবং দেবশঙ্কর বাবুও উহা তখন মানিয়া নিয়াছেন; কিন্তু মানিয়া নিলে কি হয়? অনুভূতি শূন্য জ্ঞান পানাপুকুরের মত। পানা সরাইয়া একটু জল বাহির করিলেও উহা দেখিতে না [illegible]তে আবার পানা দ্বারা ঢাকিয়া যায়। [illegible] জন্যই মা বলে[illegible] বোঝা। এক জাতীয়

বোঝা নামাইয়া অন্য জাতীয় বোঝা মাথায় তুলিয়া লওয়া। দেবশঙ্কর বাবু আবার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিগ্রহ হারাইয়া গেলে যাহার দুঃখ হয় তাহার সম্বন্ধে কি ইহা বলা যায় না যে, বিগ্রহের সেবা করিতে করিতে ভগবানের পরশ কিছুটা তাহার লাগিয়াছে?

মা। হাঁ। কেহ হয়ত বিগ্রহের সেবা পূজা করিতেছে কিন্তু কোন ক্রমে যদি ঐ বিগ্রহ হারাইয়া যায় তবে উহার জন্য যে বিশেষ দুঃখ হওয়া তাহা হয় না। কারণ এখানে সেবা পূজার সহিত তাহার প্রাণের বিশেষ যোগ নাই। পুরীতেও গঙ্গাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মা, ভিতরে অনুভূতি না পাইলে শুধু সেবা পূজায় কিছু হয় না।" এই অনুভূতি বা তাঁহার পরশ পাওয়ার জন্যই ত যত চেষ্টা। আবার এমনও হইতে পারে যে, একজন প্রাণ দিয়াই সেবা পূজা করিতেছে, "ঠাকুর, এতদিন তুমি প্রকটরূপে আমার সেবা গ্রহণ করিয়াছ, এখন অপ্রকটরূপে আমার সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।" এতদিন সে তাহার গোপালকে 'আছে' রূপে দেখিয়া আসিয়াছে, এখন সে তাহাকে নাই রূপে দেখিতেছে। সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে তিনি আছেন কিনা, তাই—এখানে বিরহ কোথায়? যেখানে দুই থাকে সেইখানেই দূরত্ব এবং দুঃখ। এই দূরত্ব দূর করিবার জন্যই ত যত চেষ্টা। যেখানে একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নাই, সেখানে দুঃখ, ভয় আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে যে একমাত্র আত্মাই আছেন আর কিছু নাই। এরূপ অনুভব না হইলে পূর্ণ ও অংশের জ্ঞান হয় না। প্রভু এবং দাসের জ্ঞান হয় না। পরমাত্মা রূপে যিনি—পূর্ণ, অংশরূপেও তিনি, প্রভু এবং দাস রূপেও তিনি। এক পরমাত্মার জ্ঞান হইলেই এসব বুঝা যায়। তখনই বলা যায় যে সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। মায়ের কোলে উঠিয়াই মায়ের দোল খাইতে হয় এবং উহা যে মায়েরই দোল তাহা বুঝা যায়। এই জ্ঞান ধীরে ধীরে আসিতে পারে আবার হঠাৎ ও হইয়া যাইতে পারে। সাধন করিতে করিতে যেমন [illegible]হারও মন্ত্র কি এই প্রশ্ন উঠিল এবং তখন মন্ত্রের দেবতা প্রকাশ[illegible] পর প্রশ্ন উঠিল[illegible]কাহার মন্ত্র?

অমনি মন্ত্রের দেবতা প্রকাশ হইল। আবার প্রশ্ন উঠিল দেবতা কি? অমনি দেবতার স্বরূপ প্রকাশ হইল। এইভাবে ক্রম বিকাশের পথেও জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে। আবার সমস্ত জ্ঞানই এক বারে প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞান স্বরূপ তিনি ত সর্বদাই বর্তমান আছেন। তাঁহার অভাব ত কখনও নাই। কেবল আমাদের সুইচ্ বন্ধ বলিয়া আমরা অন্ধকারে আছি। এই অন্ধকার ধীরে ধীরেও যাইতে পারে। যেমন ঘরের মধ্যে সুইচ্ টিপিলাম, ঘরখানা আলোকিত হইল। বাড়ীর সুইচ্ টিপিলাম সমস্ত বাড়ীখানা আলোকিত হইল। আবার অন্য এক সুইচ টিপিলাম সমস্ত শহরই আলোকিত হইয়া উঠিল। এই হইল ক্রমবিকাশের পথ। আবার এমনও হইতে পারে যে একটি মাত্র সুইচ্ টিপিলাম উহাতে শহর, বাড়ী, ঘর এক সময়েই আলোকময় হইয়া গেল।

এইরূপে কথা বলিতে বলিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। মায়ের ভোগের সময় হইয়া গিয়াছে। মাকে ডাকিতে অনেকক্ষণ হয় উদাস (ব্রহ্মচারিণী) বসিয়া আছে। মা অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছেন বলিয়া সে বাধা দিতে সাহস পাইতেছে না। মা হঠাৎ তত্ত্বালোচনা বন্ধ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই আহারের সময় হইয়াছে। এ ভাবে কথা বলিলে তোমাদের কষ্ট হইবে।" এই বলিয়া মা উঠিয়া পড়িলেন। দেবশঙ্কর বাবু বলিলেন, "আপনার এরূপ মধুর কথা আমি দিবারাত্র বসিয়া শুনিতে পারি।" মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রী মা কাহাকেও দীক্ষা দেন কি না
১৭ই শ্রাবণ, বুধবার (ইং ২।৮।৫০)

গত গুরুপূর্ণিমার দিন দীক্ষা জাতীয় যে ব্যাপারটি হইয়াছিল উহা নানাজনের মুখে শুনিলেও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে জানিবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তাই আজ যখন বেলা প্রায় ১১টার সময় পাঠ শেষ হইল তখন আমি মাকে বলিলা[illegible], গুরুপূর্ণিমার দিন যে ব্যাপারটা [illegible]গল তাহা তোমা[illegible]নিতে পারিলাম না।"

মা, (হাসিয়া) ও, সেই কথা! ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। গুরুপূর্ণিমার দুই তিন দিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে দেখিতেছি কি যে কয়েকজন লোক আসিয়া আমার পেছন দিকে দাঁড়াইয়াছে। আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছি এবং তাহাদিগকে দেখিতেছি। উহাদের মধ্যে একজন হইল এ শরীরের জেঠাত ভাই। সে অনেকদিন হয় মারা গিয়াছে। সে ডাক্তার ছিল এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন এ শরীরের বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাহার সহিত এ শরীরের বিশেষ আলাপও ছিল না। ঐ দিন রাত্রিতে সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমাকে কিছু দেও" অর্থাৎ ভাবটা হইল এই যে আমাকে দীক্ষা দেও। আমি তাহাকে বলিলাম, "এ শরীর ত সাধারণভাবে কাহাকেও দীক্ষা দেয় না।" ইহার উত্তরে সে উপস্থিত লোকজনকে দেখাইয়া বলিল, "তোমার কাছে তো এইসব লোক আছে, ইহাদের কেহ যদি বেলপাতায় কোন মন্ত্র লিখিয়া তোমাকে উহা স্পর্শ করাইয়া দেয় তাহা হইলেই হইবে।" কি ভাবে যে কাজটি করিতে হইবে তাহা কিন্তু সে—ই বলিয়া দিল। এ শরীরের মুখ হইতেও হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, 'আচ্ছা', এ শরীর ত ঐ রূপ করিয়াই থাকে। কেহ তুলসী পাতায় হরিনাম লিখিয়া উহা দিয়া মালা গাঁথিয়া এ শরীরকে দিলে, এ মালা ত এ শরীর অন্যকে দিয়া থাকে। অবনী (শর্মা) বাবা অনেক সময় বেলপাতায় বীজমন্ত্র লিখিয়া এ শরীরের মাথায় বা হাতে দিয়া থাকে; এ বেলপাতাও ত এ শরীর কাহাকেও কাহাকেও দিয়া দেয়। যাহা হউক, আমি দিদিকে (খুকুনী দিদিকে) এ সমস্ত কথা বলিয়া বলিলাম, "আমি ত কথা দিয়া ফেলিয়াছি, তুই গুরুপূর্ণিমার দিন ইহা আমার খেয়ালে আনিয়া দিস। আরও এক কাজ করিস। বেলপাতায় তুই শৈব এবং শাক্ত বীজ রক্তচন্দন দিয়া লিখিয়া দিস আর তুলসী পাতায় শ্বেতচন্দন দিয়া বৈষ্ণব বীজ লিখিয়া দিস।" কি বীজ লিখিতে হইবে তাহা আমি না বলিয়া দিলেও [illegible] আমার নিকট নানা বীজের কথা শুনিয়াছে ত তাই উহা হইতে [illegible]িল যে সে বেল[illegible]য় কি কি বীজ

লিখিবে। ঐ দিন আরও দেখিয়াছিলাম যে একদিকে কতকগুলি বেলপাতা এবং অন্যদিকে তুলসীপাতা সাজান রহিয়াছে এবং ইহারা (অর্থাৎ আশ্রমের মেয়েরা) চন্দন ঘষিতেছে। দিদি বেলপাতায় রক্তচন্দন দিয়া কিছু লিখিতেছে, ইহার পর সে তুলসীপাতা হাতে নিয়া উহা পরিষ্কার করিল কিন্তু কি বীজ যে উহাতে লিখিবে সে সম্বন্ধে আর তাহার কোন ধারণা আসিল না এবং সে উহা ঐভাবে রাখিয়াই চলিয়া গেল। এ সমস্তই কিন্তু সূক্ষ্মে দেখা হইয়া গেল।

গুরুপূর্ণিমার আগের দিন রাত্রিতে শুইয়া আছি। ঘুম আসিতেছে না, শুধু এপাশ আর ওপাশ করিতেছি। কয়েকদিন যাবৎ ঘুমের কোন ভাবই নাই। চত্বরের উপর খাটিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কতকক্ষণ ঐখানে শুইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরই মেয়েদের কীর্তনের শব্দ শুনিতে পাইয়া বুঝিলাম যে ভোর হইয়াছে। দিদির (খুকুনী দিদির) ইচ্ছা ছিল যে গুরুপূর্ণিমার দিন এ শরীরকে সাজাইয়া পূজা করে; কিন্তু সকালবেলা আমি নীচে আসিয়া বলিলাম যে ও সব কিছু হইবে না। নূতন মন্দিরে গিয়া বিশুকেও ঐকথা বলিয়া উপরে শুইতে গেলাম। যখন দিদি দেখিল যে সে যাহা মনে করিয়াছিল তাহা হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই তখন সে এ শরীরের যে পায়ের ছাপ রাখা হইয়াছিল তাহার উপর পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া রান্না করিতে গেল। ঐদিন আশ্রমে অনেক লোকের প্রসাদ পাওয়ার কথা ছিল ত? আমি তাহাকে যে কথা খেয়াল করাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গেল।

এদিকে আমি সকালবেলা বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে এ শরীরের সেই জেঠাত ভাই আসিয়া উপস্থিত। এবার তাহার স্ত্রীও তাহার সঙ্গে আছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই আমি দিদিকে ডাকিতে উদাসকে পাঠাইলাম। মজাও এমন যে আমার খেয়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিদিরও পূর্বকথা স্মরণ হইয়া গেল এবং উদাস তাহাকে খবর দেওয়ার পূর্ব্বেই সে [illegible]য়া আমার কাছে আসিল। তখন তাহা[illegible]ইয়া নূতন মন্দি[illegible] দিদি তাড়াতাড়ি দুইটি

বেলপাতায় রক্তচন্দন দিয়া শৈব এবং শাক্ত বীজ লিখিল। লিখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "এগুলি দিয়া কি করিব?" আমিও বলিলাম তা'ই ত কি করা যায়? সে বলিল, "তবে এগুলি গঙ্গাজলেই দেওয়া যাক্।" আমিও বলিলাম, "তাহাই ভাল"। ইহার পর সে তুলসীপাতা হাতে লইয়া উহা পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা খুব চঞ্চল। সে চুলার উপর রান্না চাপাইয়া আসিয়াছে, পাছে উহা পুড়িয়া যায় এইজন্য সে এত ব্যস্ত। এমন সময় কে যেন দিদিকে ডাকিতে আসিল। সে তখন তুলসী পাতাটি বিশুর হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বিশু তুলসীপাতা হাতে লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে উহাতে কোন বীজমন্ত্র লিখিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমারা ত নারায়ণের পূজা কর, তুলসী পাতায় ঐ জাতীয় কোন বীজ লিখিতে পার।" সে তাহাই করিয়া তুলসী পাতাটি আমার হাতে দিল। আমি আবার উহা তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম।

এই বিশুই ছয় বৎসর পূর্ব্বে এ শরীর হইতে স্বপ্নে তিনটি বীজ পাইয়াছিল। উহার দুইটি তাহার মনে ছিল, তৃতীয়টি সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ঐ কথা সে এ শরীরকে পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে বলিয়াছে; কিন্তু তখন এ শরীরের কিছু খেয়াল হয় নাই বলিয়া এ শরীর কিছু বলে নাই। একবার বিন্ধ্যাচলে গিয়া সে আবার ঐ কথা উঠাইলে এ শরীর তাহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার যে দুইটি বীজ স্মরণে আছে সে যেন সে দুইটি বীজই জপ করিয়া যায়। এযাবৎকাল সে তাহাই করিয়া আসিতেছিল। আজ যখন আমি ঐ তুলসী পাতাটি তাহার হাতে ফিরাইয়া দিলাম তখন তাহার হঠাৎ মনে হইল যে তুলসী পত্রে যে বীজ লেখা হইয়াছে উহাই তৃতীয় বীজ। সে ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি উহা স্বীকার করিলাম। আনন্দে তাহার মুখ, চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এখন বাকী রহিল ঐ দুইটি বেলাপাতায় লেখা দুইটি বীজ। উহা যে কাহাকে দেওয়া [illegible]ইবে তাহার কোন খেয়ালই এ পর্যন্ত ছিল না। যখন বিশুকে ঐ [illegible]সী পাতাটি দেও[illegible]হইল তখন এ

শরীরের খেয়াল হইল যে এই মন্দির ত মনা বাবা (মনমোহন ঘোষ) তৈয়ার করিয়াছে—তাহাকে একটি বেলপাতা দিলে হয়। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একটি পাতা দেওয়া গেল। বাকী রহিল আর একটি। তখন আবার খেয়াল হইল কোন অশিক্ষিত লোক এখন যদি এঘরে আসে তবে তাহাকেই ইহা দেওয়া যাইবে। এ যেন লটারী করার মত। (সকলের হাস্য) এমন সময় বাহিরে চাহিয়া দেখি যে গোপাল (দাসগুপ্ত) বাবার স্ত্রী জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভিতরে আসিবে নাকি?" সে অমনি ভিতরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া যখন সে ফিরিয়া যাইতেছে, তখন বিশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাকে এই বেলপাতা দিয়া দিব?" বিশু বলিল, "বেশ ত দিন না।" তাহাকে তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তিনবারই ঐ জবাব দিল। তখন বেলপাতাটি গোপাল বাবার স্ত্রীকে দেওয়া হইল। ইহাই হইল গুরুপূর্ণিমার দিনের ঘটনা।

আমি। গুরুপূর্ণিমার দুইদিন পূর্ব্বে যেদিন তোমার জেঠাত ভাই সূক্ষ্ম দেহে আসিয়াছিলেন সেদিন তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন সূক্ষ্ম দেহধারী পুরুষ ছিলেন—একথা তুমি বলিয়াছ।

মা। হাঁ।

আমি। তাঁহারা বোধহয় সকলেই মৃত

মা। না।

আমি। তবে তাঁহারা কে?

মা। কেন যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা কি সূক্ষ্মদেহে আসিতে পারে না?

আমি। তা' পারে। তাঁহারাও কি দীক্ষাপ্রার্থী ছিলেন?

মা। হাঁ।

আমি। যাঁহারা তোমার নিকট হইতে স্থূলে বিল্বপত্র পাইলেন তাহাদের সূক্ষ্মদেহও কি ঐ সকল সূক্ষ্ম[illegible]দের মধ্যে ছিল?

মা। তা[illegible] হইলে তাহারা [illegible]?

আমি। এই যে ব্যাপারটা হইল ইহাকে দীক্ষা বলিতে পারি কি?

মা। তোমার যাহা ইচ্ছা।

আমি। তুমি কি বল?

মা। ঐ যে বলিলাম তোমার যাহা ইচ্ছা।

আমি। যদি আমরা ইহাকে দীক্ষা বলি তবে কাহার নিকট হইতে ইঁহারা দীক্ষা পাইলেন?

মা। (হাসিয়া) ভগবানের নিকট হইতে।

আমি। যদি বলি ইঁহারা তোমার নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন।

মা। ঐ যে বলিলাম ভগবানের নিকট হইতে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। উহাত এক কথাই হইল।

আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার জেঠাত ভাইকে বলিয়াছিলে, "এ দেহ সাধারণতঃ দীক্ষা দেয় না।" এখন ইহাই যদি আমি তোমার সীমা বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ একটি কাজ তুমি করতে পার না— উহা হইল দীক্ষা দেওয়া।

মা। (হাসিয়া) সীমা দিলেও সীমা রাখিতে পারিবে না।

আমি। কেন? যে নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই তাহা সীমা বৈ আর কি?

মা। তোমাদের মধ্যে যেরূপ ভাবে দীক্ষা হয় সাধারণতঃ এ শরীর সে ভাবে দীক্ষা দেয় না। তবে এ শরীরের মুখ হইতেও ত মন্ত্র বাহির হইয়াছে এবং উহা অন্যে গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই একভাবে না একভাবে মন্ত্র ত বলিয়া দেওয়াই হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক সময় দেখিয়াছি যে এক একজন ওলট পালট করিয়া তাহাদের মন্ত্র জপ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ শরীরের কাছে আসিয়া বলিয়াছে, "মা, যে ভাবে জপ করিতেছি তাহা ঠিক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না, তবে কি এই এইভাবে জপ করিব?" যে ভাবে জপ করিলে উহা ঠিক ঠিক হইবে বলিয়া এ শরীরের খেয়াল হইয়াছে, উহারাও কিন্তু ঠিক [illegible]রেই জপ করিতে চ[illegible]িয়াছে।

আমি। মা, তুমি বল যে তুমি সাধারণতঃ দীক্ষা দেও না, ও কথার কোন অর্থই নাই। কারণ ভোলানাথ এবং ভাইজী তোমার মুখ হইতে মন্ত্র পাইয়াছেন। তাহাছাড়া, তুমি নিজেই বলিয়াছ যে লোককে যে তুমি ফুল, মালা দেও, উহা শক্তি সঞ্চারের কাজ করে। শক্তি সঞ্চারকেই দীক্ষা বলে। দীক্ষার আর এক নাম শক্তি পাত।

মা। (হাসিয়া) কেবল ফুল, মালা কেন? কাহাকেও যে সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয় উহার সহিতও ইহা হইয়া থাকে।

নারায়ণস্বামী। তোমার জেঠাত ভাই যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা কি তিনি পাইয়াছিলেন?

মা। হাঁ।

আমি। ঐ নতুন মন্দিরেই কি তিনি উহা পাইয়াছিলেন?

মা। হাঁ, সে, তাহার স্ত্রী, তাহার ছোটভাই সকলেই পাইয়াছিল।

ইহার পর গোপীবাবুর কথা উঠিল। গোপীবাবুর শরীরটা যে অসুস্থ চলিতেছে সে কথা মাকে বলিলাম। কথায় কথায় রাধিকা মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাও উঠিল। পূর্ব্বে একবার উহা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তি করিলাম না। এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। অনেকক্ষণ হয় খুকুনীদিদি মাকে নিতে আসিয়াছেন। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

রাজঘাট স্কুলে শ্রীশ্রীমায়ের গমন

বেলা ৩টার সময় আমরা মার সহিত রাজঘাট স্কুলে গেলাম। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ গত পরশু আশ্রমস্থ সকলকে এবং আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই স্কুলেই আমাদের মিস্ ব্লাঙ্কা (আত্মানন্দ) কাজ করেন। আমাদের জন্য দুইটি বাস আসিয়াছিল। মা এবং খুকুনীদিদি প্রভৃতি তিনখানা মোটর গাড়ীতে গিয়াছিলেন। স্কুলটি রাজঘাটের সন্নিকট বলিয়া ইহাকে রাজঘাট স্কুল বলে। ইহা গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড এক [illegible]মিখণ্ডের উপর স্থাপি[illegible] আমাদিগকে যে দালানে লইয়া যাও[illegible]ছিল উহা একটি[illegible] নিতে পাইলাম যে

শান্তিনিকেতনের কোন শিল্পীদ্বারা স্কুল এবং কলেজটির নক্সা করা হইয়াছে। হলঘরটি যেমন বৃহৎ তেমনই সুন্দর। এখানে পাঁচ হইতে বার বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার অনতিদূরেই ছেলেদের কলেজ। উহাকে বেসাণ্ট কলেজ বলে। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিক্ষায়তনটি দেখিতে লাগিলাম। মা তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। স্থলে স্থলে পুষ্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ছেলেপেলেদের বাসস্থান এবং খেলার মাঠ স্কুলের সংলগ্ন। স্কুল ঘরের বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইলে নিকটস্থ তরুরাজির ভিতর দিয়া গঙ্গা এবং তদুপরি সেতুটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অনতিদূরেই বরুণা নদী। স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম।

শ্রীশ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষ্যে হলঘরটি সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। মাঝখানে একটি নাতি উচ্চ এবং নাতি দীর্ঘ বেদী তৈয়ার করিয়া উহার উপর মায়ের আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেদীর অবস্থানটি এমন যে ইহা দেখিয়া মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের মণিকোঠা বলিয়া মনে হয়। বেদীর উত্তরে, দক্ষিণে, বামে এবং সম্মুখে লোকদিগের বসিবার জন্য সতরঞ্চি এবং গালিচা পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পর মায়ের গাড়ী আসিয়া স্কুলের সম্মুখে দাঁড়াইল। মা গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্র স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে কয়েকজন মাকে মালা পরাইয়া দিলেন। সারিবদ্ধ বালক বালিকাদের মধ্য দিয়া মা যখন আসিতেছিলেন তখন তাহারা মার চরণে, মস্তকে এবং পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিল। উহার মধ্য দিয়া মা যখন হলঘরের ভিতর পৌঁছিলেন তখন ঐ সব পুষ্প এবং মালাদ্বারা মা এমনভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিতে একটি সচল পুষ্পস্তবকের মত মনে হইয়াছিল।

মা আসিয়া আসন গ্রহণ করা মাত্র ছোট ছোট ছেলেরা স্তব পাঠ করিতে লাগিল। ছে[illegible]র স্তবপাঠ শেষ হইলে কুমারীরা সেতার ও তবলা বাজাইয়[illegible] করিল। কিছুক্ষ[illegible]এইরূপ স্তব পাঠ

এবং ভজন গান পর্য্যায়ক্রমে চলিতে লাগিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে Queen's College-এর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রাও মহাশয় এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। বক্তৃতাটি তিনি ইংরেজিতে করিয়াছিলেন। স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী উহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া সকলকে উহার মর্ম জ্ঞাপন করিলেন। ইতিমধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র, মাষ্টার এবং স্থানীয় লোক দ্বারা হলঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেও খোল এবং হারমনিয়ম গিয়াছিল। শ্রীমান্ বিভু (ব্রহ্মচারী) এবং শ্রীমান্ ভূপেন (ব্রহ্মচারী) এক একটি গান করিলে মাকেও একটি গান করিতে অনুরোধ করা হইল। মা বলিলেন, "গান হবে কিনা তাহা ত বলিতে পারি না তবে যদি হইয়া যায় ত হইবে।" শ্রীমান্ বিভু যখন "হে ভগবান্, হে ভগবান্" গাহিতে আরম্ভ করিল, শ্রীশ্রীমা অমনি নিজেই ঐ নাম তদ্গতভাবে করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণীগণ এবং অন্যান্য লোকেরাও গাহিতে লাগিলেন। মূহুর্ত্ত মধ্যে যেন হলঘরের আবহাওয়া বদলাইয়া গেল। শ্রীশ্রীমায়ের মনোমোহন ঢুলু ঢুলু মূর্ত্তি, তাহার উপর তাঁহার দিব্য সঙ্গীতের ঝঙ্কারে সকলের হৃদয় তন্ত্রী যে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ নাম গান করিয়া মা নীরব হইলেন। এইবার ভোগের জন্য মাকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও ফল প্রসাদ পাইলাম। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আশ্রমের মেয়েরা একটি বাসে রওনা হইয়া গেলেন। মা ছিলেন বলিয়া আমরাও অপেক্ষা করিতেছিলাম। ওখানকার সকলে মার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে মা কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। পরে আমরা সকলেই বাসে উঠিয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

প্রেতাত্মার উদ্ধার

রাত্রিতে যখন আশ্রমে গেলাম তখন শ্রীমান্ ভূপেন প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতেছিল। শ্রী[illegible]মা তখনও বাহিরে আ[illegible] নাই। একটু পরই মা চত্বরের উপ[illegible]িয়া বসিলেন, ত[illegible]েষ হইয়া গিয়াছে।

একটি ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "বাবা, তুমি কোথায় থাক?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন যে তিনি সাগরে (মধ্যপ্রদেশ) থাকেন এবং ঐখানেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। সাগরের কথা বলিতে মা বলিলেন, "আমরাও কিছুদিন সেখানে ছিলাম। সেখানে একটি ছোট মন্দির এবং উহার নিকট একটা বড় গাছ আছে। তোমরা কি তাহা দেখিয়াছ?"

ভদ্রলোকের স্ত্রী। হাঁ, মা, দেখিয়াছি।

মা। ঐ মন্দিরে আমরা কিছুদিন ছিলাম। ঐ মন্দির হইতে অল্পদূরেই একটি ছোট গ্রাম। আমরা মাঝে মাঝে ঐ গ্রামে বেড়াইতে যাইতাম। ঐ গ্রামের লোকেরা আমাদিগকে খুব আদর করিত। তাহা ছাড়া ঐখানে যে নদী আছে, উহার ধারেও আমরা বসিয়া থাকিতাম। কিছুদিন ওখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকা হইয়াছিল। তোমরা ত দেখিয়াছ যে অনেক গাছ আছে যাহা আশ্রয় করিয়া পাখীরা বাস করে। সেইরূপ অনেক স্থান আছে যাহা আশ্রয় করিয়া আত্মারা থাকে। যেমন তোমরা বল না যে গৃহ দেবতা, গ্রাম্য দেবতা। তাহা ছাড়া স্থানের রক্ষক হিসাবেও আত্মারা থাকে। যে মন্দির এবং গাছের কথা বলিলাম, ঐখানেও একটি আত্মা ছিল। উহা ভাল আত্মা নয়। উহার প্রকাশটা ছিল বিকট, কিন্তু আমরা এখানে থাকিতে থাকিতেই উহার চেহারাটা বদলাইয়া গেল এবং দেখিলাম যে উহার ঊর্দ্ধগতি হইয়া গেল।

ব্যাস। প্রেত দেহ হইতে কি ঊর্দ্ধগতি হইতে পারে, না আবার ঐ প্রেতকে মানব দেহ ধারণ করিতে হয়?

মা। দুই-ই হইতে পারে। কাহারও প্রেত দেহ হইতেই ঊর্দ্ধগতি হইয়া যায় আবার কাহাকেও মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তখন সাধন ভজন করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।

এই সময় মৌনের ঘণ্টা পড়িল। কাজেই ঐ সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই বন্ধ হইয়া গেল। মৌনের পর মা তাঁহার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি চত্বরের [illegible]র কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে মায়ের ঘরে আলো এবং [illegible]খিয়া আমিও ঐখা[illegible]লাম।

ঘরে গিয়া দেখি যে মা তাঁহার বিছানায় বসিয়া কতকগুলি ছবি দেখিতেছেন। ঘরের মধ্যে আরও অনেক লোক আছে। ছবিগুলি নানা দেবতার ছবি। কোনটি গোপালের, কোনটি শিবের এইরূপ। উহার মধ্যে একটি কালীয় দমনের ছবিও ছিল। মা উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কিসের ছবি?" তখন শ্রীমান্ ব্যাস বলিল, "ইহা কালীয় মর্দ্দন।" ব্যাস গুজরাটি লোক তাহার বাংলা উচ্চারণ একটু স্বতন্ত্র। তাহার কথা শুনিয়া মা এবং আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আমাদিগকে হাসিতে দেখিয়া খুকুনী দিদি বলিলেন, "উহাতে দোষ কি হইল?" খুকুনীদিদির কথা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "খুকুনী, তুই ব্যাসের পক্ষ লইয়া যেন "রাভণ" বলিতেছিস্। এই কথা বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই রাভণের গল্প জানা ছিল না। মা খুকুনীদিদিকে ঐ গল্প বলিতে বলিলেন, খুকুনীদিদি তখন কোন একটা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, কাজেই তাঁহার গল্প বলিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু মাও ছাড়িবার পাত্রী নন। মা দিদিকে তিন চারি বার তাগাদা করিলে দিদি এই গল্পটি বলিলেন— এক বড় পণ্ডিত ছিল, কিন্তু তাহার পুত্র ছিল গর্দ্দভ। একদিন সে রাক্ষসরাজ রাবণের কথা বলিতে গিয়া রাবণ উচ্চারণ না করিয়া "রাভণ" "রাভণ" বলিতেছিল। তাহার সঙ্গীরা তাহার ভুল ধরিয়া দিলেও সে উহা মানিতে প্রস্তুত নয়। তখন তাহার সঙ্গীরা বলিল, "আচ্ছা, তোমার বাবা ত বড় পণ্ডিত, চল আমরা গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, —আমাদের মধ্যে কাহার কথা ঠিক।" তখন সকলে মিলিয়া পণ্ডিতের কাছে গেল, পণ্ডিত দেখিলেন যে তাঁহার ছেলেই ভুল করিয়াছে। একদিকে পুত্রস্নেহ, যাহার জন্য ছেলেকে জব্দ হইতে দেখিতে চান না, অন্যদিকে আবার মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। তখন দুই কুল রক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "শব্দটি অবশ্য 'রাবণ' কিন্তু হওয়া উচিত 'রাভণ' কারণ—

"কুম্ভকর্ণে ভকা[illegible]
ভকারোক্তি [illegible]

সর্ব্বজ্যেষ্ঠকুলশ্রেষ্ঠে
ভকারঃ কিং ন রাবণে"।।

কুম্ভকর্ণে 'ভ' কার আছে, বিভীষণেও 'ভ' কার আছে। আর যিনি সকলের বড় এবং কুলের শ্রেষ্ঠ—তাহার বেলায় কি 'ভ' না হইয়া 'ব' হইবে? (সকলের উচ্চ হাস্য)

স্ত্রীলোকের প্রণবে অধিকার আছে কি না
১৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, (ইং ৩।৮।৫০)

আজ বেলা ১০।।টার সময় আশ্রমের হলঘরে গিয়া দেখি যে গীতাপাঠ চলিতেছে। মা তখনও হলঘরে আসেন নাই। একটু পরেই মা আসিলেন। পাঠ চলিতেছিল, ইহার মধ্যে মা নিজ হইতেই কথা আরম্ভ করিলেন। সকল বিষয়েই দেখিতেছি যে অব্যবস্থাই মায়ের ব্যবস্থা। কখনও দেখিয়াছি যে পাঠের সময় মা নিজে কথা বলেন না এবং অপর কাহাকেও কথা বলিতে দেন না। ভাবটা এই দেখান যে নীরবে পাঠ শ্রবণ করাই যেন সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য, এখন সে পাঠ যেমনই হউক। আবার কোন কোন দিন, যেমন আজ নিজেই কথা বলিয়া পাঠ বন্ধ করিয়া দেন।

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"

অবশ্য এজন্য কেহ দুঃখিত নয়, বরং আনন্দিতই। মা বলিতে লাগিলেন, "এই যে অক্ষর সকল আছে, ইহার প্রত্যেকটিরই কিন্তু অর্থ আছে। অক্ষর কি না যাহার ক্ষয় নাই। সেইরূপ শব্দ, অক্ষর এগুলি কি? সে-ই ত। যেমন তোমরা বল শব্দ ব্রহ্ম। (স্বামী শঙ্করানন্দকে) কি বাবা তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে? এখানকার কথা ত আবোল তাবোল। বল না তোমাদের শাস্ত্রে শব্দ সম্বন্ধে কি বলে?

শঙ্করানন্দ। হাঁ মা, শাস্ত্রে শব্দের চারিটি অবস্থার কথা বলে, যেমন পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী। ইহার মধ্যে পরা বাক্ হইল ব্রহ্ম হইতে অভেদ, তাহার পর পশ্যন্তী, তাহার পর মধ্যমা, শেষে বৈখরী বাক্। বৈখরী [illegible] হইল শব্দের স্থূল রূপ।

মা। বৈখরী [illegible] বাহির হয়।

স্বামী শঙ্করানন্দ। অ আ ইত্যাদি অক্ষর যেভাবে সাজান আছে, উহা হইতেই সৃষ্টির ক্রমটা ধরা যায়। তা কিনা অনুত্তর অর্থাৎ যাহার উপরে আর কিছু নাই। ইহার পর আ অর্থাৎ আনন্দ, ইহার পর ই অর্থাৎ ইচ্ছা, তাহার পর ঈ অর্থাৎ ঈক্ষণ। ঈক্ষণের পর উন্মেষ—উ, তাহার পরই ঊ অর্থাৎ ঊর্ম্মিরূপে সৃষ্টির প্রকাশ।

মা। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ আছে এবং উহার ছন্দ আছে, যেমন তোমরা বল না যে গায়ত্রী শব্দের তিনটি ভাগ আছে। গায়ত্রী অর্থ কি? অর্থাৎ যাহা গান করিলে গায়কের ত্রাণ হয়। কি হইতে ত্রাণ হয়? না পাপ হইতে। পাপ কি? না, তাপ; যাহা দুঃখ দেয়। যেখানে দুই সেইখানেই দুঃখ। সেইজন্য গায়ত্রী অর্থ হইল যাহা গান করিলে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ—এইসব দ্বৈতভাব হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। তখন কি হয়? না, অক্ষর হয়, অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই, যাহা নিত্য। আবার এই অক্ষরের মধ্যে আছে অনুস্বার, তারপর বিসর্গ অর্থাৎ বিশেষ অর্থ; তারপর হইল চন্দ্রবিন্দু। চন্দ্র কি না, যাহার অর্দ্ধেক প্রকাশ আর বাকী অর্দ্ধেক অপ্রকাশ। ইহার মধ্যে আছে বিন্দু। বিন্দু কি? না, যাহা হইতে সৃষ্টি হয়। গায়ত্রীর কথা হইতেছিল না? গায়ত্রীর মধ্যে কি আছে? না, ওঁ আছে। এই ওঁ কিন্তু সব অক্ষরেই আছে। যাহা সব, তাহাই শব, কারণ সব অর্থাৎ বহু থাকিলেই দ্বৈতভাব এবং যেখানে দ্বৈতভাব সেইখানেই জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, তাপ ইত্যাদি। ওঁ এর উপর অর্দ্ধচন্দ্র অর্থাৎ যাহার কতক প্রকাশ এবং কতক অপ্রকাশ। তাহার পর বিন্দু যাহা হইতে সৃষ্টি। এই প্রণবই হইল শব্দব্রহ্ম। ইহাই এক এবং ইহাই বহু। ইহাই ক্ষর এবং ইহাই অক্ষর। এই অক্ষর লইয়া ত কথা আরম্ভ হইয়াছিল না?

ইহার পর আগে অধিকারের কথা। তোমরা বল না যে স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রের প্রণবে অধিকার না[illegible]। তাহারা প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহার এক অর্থ হইল[illegible] যে তাহাদের গঠনই এরূপ যে যাহা[illegible]ন্য তাহাদের প্রণব[illegible]না অর্থাৎ তাহাদের

মধ্যে এমন সব গ্রন্থি আছে যাহার জন্য প্রণবের স্ফুরণ হয় না। কিন্তু যদি এই গঠন বদলাইয়া যায়। যদি ঐ সব গ্রন্থি খুলিয়া যায় তবে প্রণবও উচ্চারণ হইতে পারে। আবার স্ত্রীলোক যে প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না তাহার অন্য অর্থও হইতে পারে। স্ত্রীলোক কে? যে অবলা সেই স্ত্রীলোক। অবলা কি? না, যে দুর্বল, যে অপরকে আশ্রয় করিতে চায়। এই অর্থে সকলেই স্ত্রীলোক। পুরুষের চেহারা থাকিলেই পুরুষ হয় না। স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে আশ্রয় করিতে চায়, পুরুষও তেমন স্ত্রীলোককে আশ্রয় করিতে চায়। এই অর্থে উভয়ই দুর্বল। কাজেই বলা হয় যে সকলেই স্ত্রীলোক। যতক্ষণ এই দুর্বলতা থাকে ততক্ষণ (প্রণব) উচ্চারণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে বিচরণ সম্ভব হয় কি করিয়া? যখন দুর্বলতা চলিয়া যায় তখন সকলের পক্ষেই প্রণব উচ্চারণ সম্ভব হয়।

একদিকে যেমন বলা হয় যে স্ত্রীলোকের প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই, আবার ইহাও বলা হইয়াছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" এই দিক হইতে বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কাহারও প্রণব উচ্চারণের সামর্থ্যই নাই। তোমরা বল যে প্রণব হইতেই সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি অর্থ ত কিছু করা? শক্তি ভিন্ন কাজ করিবে কে? কাজেই প্রণব উচ্চারণ করা বা সৃষ্টি করা এক স্ত্রীলোক বা শক্তির পক্ষেই সম্ভব। তাই দেখিতেছ যে স্ত্রীলোক প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না—একথা যেমন সত্য, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না—একথাও সেইরূপ সত্য।

স্বামী শঙ্করানন্দ। মা, তোমার কিভাবে প্রণব উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা শুনিতে চাই।

মা। এ শরীর যখন ছোট ছিল, তখন এ শরীরের বাপ মা ইহাকে লইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নানে গিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া তাহারা গুরুবাড়ী দীক্ষা লইতে [illegible]ল। দীক্ষার পর তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দীক্ষা মন্ত্র জপ করি[illegible]সিয়া গেল, নতুন দী[illegible] কিনা, পাছে আমি দীক্ষামন্ত্র শুনিয়া [illegible] আমাকে নৌকা[illegible] চিড়া, বাতাসা

দিয়া বসাইয়া দিল। (সকলের হাস্য) তখনকার দিনে বাতাসাগুলিও বেশ ছিল বড় বড়, লাল লাল। আমি চিড়া, বাতাসা খাইতে লাগিলাম আর আপন মনে গড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শুইয়াই শুনিতে পাইলাম যে একজন আর একজনকে বলিতেছে, "ওঁ শব্দ স্ত্রীলোক কখনও উচ্চারণ করিবে না এবং যেখানে স্বাহা বলিতে হইবে—সেখানে নমঃ বলিবে।" তাহা ছাড়া স্ত্রীলোক যে প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না তাহা ছোটবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। পরে এ শরীরের উপর যখন সাধনের খেলা আরম্ভ হইল এবং মুক্তভাবে ভিতর হইতে প্রণব উচ্চারণ হইতে লাগিল তখন উহা "বাহির হইয়া গেল বাহির হইয়া গেল" বলিয়া উহা চাপিবার কত চেষ্টা। কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? জলের কল খোলা থাকিলে যেরূপ গব্ গব্ করিয়া জল পড়িতেই থাকে, উহা আর থামান যায় না, সেইরূপ এ শরীরের মুখ হইতে আপনা আপনি প্রণব উচ্চারিত হইয়া যাইতে লাগিল। এ শরীরের ত কিছুই ইচ্ছা বা চেষ্টা সাপেক্ষ নয়। সবই আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে। এখনও যে মন্ত্রাদি বাহির হয়, বা কাহাকেও কিছু দেই তাহা ঐরূপ। উহা পাইয়া কেহ কেহ মনে করে যে তাহারা এ শরীর হইতে দীক্ষা পাইল, কিন্তু কিছু দেওয়া টেওয়া এ শরীরের ভাব নয়। জগৎগুরু দীক্ষা দেন বলিয়া বলা হয়; কিন্তু এ শরীর দিবে কাহাকে? অপর কিছু থাকিলে ত দিবে? এ শরীরের নিকট সবই যে অ-পর (অর্থাৎ আপন)।

আমি। জগৎগুরুর কি দ্বৈতভাব থাকে?

মা। (হাসিয়া) না। জগৎ ত গতাগতি। ইহাই দ্বৈতভাব। ইহার গুরু হইতে হইলে দ্বৈতভাবের উপরে যাইতে হয়।

আমি। তাহা হইলে জগৎ গুরুর দীক্ষা ও তাঁহার দিক হইতে লীলা মাত্র। আমরা উহা যাহাই মনে করি না কেন।

বেলা ১১।।টা বাজিয়া গিয়াছে। মাকে ডাকিবার জন্য লোক আসিয়াছে। মা বলিলেন, "একথা চলিলে অনেক বেলা হইবে। নারায়ণ স্বামীর গত [illegible]ল উপবাস গিয়াছে। [illegible]ীর না খাইলে ত সে

খাইবে না। কাজেই আজ এইখানেই বন্ধ করা যাক্। কাল আবার এই আলোচনা হইবে।" এই বলিয়াই মা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কোন মন্ত্র লাভ করিলে উহাকে দীক্ষা বলা যায় কি না

১৯শে শ্রাবণ (ইং ৪।৮।১৯৫০)

বেলা ১১টার সময় পাঠের পর মা যখন হল ঘরে আসিলেন তখন আবার গতকল্যের আলোচনা যাহা অসম্পূর্ণ ছিল—তাহা আরম্ভ করা হইল। কথাটা আমিই উঠাইলাম। আমি বলিলাম, "মা, গতকল্যের বিষয়টি আজ আবার আলোচনা করা যাক্।"

মা। বেশ। কাল কি পর্যন্ত হইয়াছিল?

আমি। বলিতেছি, কিন্তু আমার নিবেদন এই যে গতকাল তুমি অক্ষর, অনুস্বার, বিসর্গ ইত্যাদি বলিয়া আমাদিগকে যেরূপ অগাধ জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে, আজ কিন্তু সেরূপ করিও না। আমরা যাহা বুঝি তাহাই বলিও।

মা। (হাসিয়া) অগাধ জলে ফেলিয়া দিয়াছিলাম নাকি?

আমি। যাহা কিছু বুঝিলাম না তাহা অগাধ জল বই আর কি? কাল এই পর্যন্ত বলিয়াছিলে যে কখনও কখনও তোমার মুখ হইতে মন্ত্রাদি বাহির হয়, অথবা তুমি যাহাকে কিছু দেও বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ঐ মন্ত্র পাইয়া মনে করে যে তাহার দীক্ষা হইল, কিন্তু তোমার দিক হইতে ইহা দীক্ষা নয়, কারণ তোমার নিকট অন্য বলিয়া ত কিছু নাই যে তুমি তাহাকে দিবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল যে কেহ যদি তোমার কা[illegible] দীক্ষা প্রার্থনা করে এবং তোমার মুখ হইতে তখন কোন মন্ত্র বাহি[illegible]য় এবং সে উহা গ্রহণ করে, তবে তোমার দিক হইতে এ ব্যাপা[illegible]টা যাহাই হউক না কেন, যে ঐ মন্ত্র লাভ করিল সে উহাকে দী[illegible] ভিন্ন আর কি বলিতে পারে?

মা। (হাসিয়া) [illegible]রা যাহা মনে কর।

আমি। ইহা[illegible] অগাধ জলে ফে[illegible]

মা। অনেক সময়ই এ শরীর হইতে মন্ত্র বাহির হইয়াছে, কিন্তু যাহারা উহা শুনিয়াছে তাহারা ত উহা গ্রহণ করে নাই। উপদেশের বেলায়ও ঐরূপ। কেহ কেহ উপদেশ হিসাবে ইহা শুনিতে চায়, আবার কেহ উহার মধ্যে এমন কিছু পায় যাহা হইতে সে মনে করে যে তাহার যাহা পাইবার সে তাহা পাইয়াছে। মন্ত্র বলা বা কাহাকেও কিছু দেওয়া—এগুলি ইদানীং বেশী বেশী হইতেছে। ঢাকাতে যখন এ শরীরটা উলট পালট হইত এবং কাহাকেও কিছু দেওয়া বা বলা ছিল না তখন একজন এ শরীরের ঐসব দেখিয়া এমন একটা কিছু পাইয়া বসিল যাহা লইয়া সে এখনও আছে। এ কথা আমি তাহার নিকট হইতেই শুনিয়াছি। আবার দেখ, কেহ কেহ এ শরীরের নিকট কিছু পাইয়াও আবার অন্য গুরুর আশ্রয় নিয়াছে।

স্বামী শঙ্করানন্দ। অন্য গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা নিলেও তোমার নিকট যাহা পাইয়াছিল তাহা ত কাজ করিয়া যাইতেছেই।

মা। হ্যাঁ। অনেকে দীক্ষিত হইয়াও এ শরীরের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছে। এ শরীর হইতে এমন কিছু বলা হইয়াছে যাহাতে তাহার গুরুমন্ত্রের উপর বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। কাহাকে কাহাকেও অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া গুরু তাহাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহা লইয়া থাকিতে বলা হইয়াছে। আবার কাহাকে কাহাকেও মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর আশ্রয় লইতে বলা হইয়াছে। তোমরা বলিতে পার গুরু ত একই। উহা সত্য কথা। অনেক সময় এরূপও বলা হইয়াছে যে, যে মন্ত্র যাহার যোগ্য নয় তাহাকে তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। একজনকে তাহার গুরুমন্ত্র জপ করিতে বলিলে সে বলিয়াছিল, "আমি ঐ মন্ত্র জপ করিতে পারিব না; কারণ উহা করি[illegible] আমার শরীর কেমন হইয়া যায়।" তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, [illegible]রু মন্ত্রে তোমার যখন এত অশ্রদ্ধা, তখন বলিতে হইবে যে তোমা[illegible] [illegible]ীক্ষা হয় নাই। কারণ ঠিকমত দীক্ষা হইলে এরূপ হইত না। যাহ[illegible] উপর তোমার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট[illegible]হইতে তুমি আবার দী[illegible]গ্রহণ কর।"

আমি। য[illegible]ল যে ঐ দীক্ষা এ[illegible] যায় নাই, কারণ

ঐ দীক্ষার জন্যই তাহার আবার অন্য গুরু হইতে দীক্ষা নিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

মা। এ কথা আমি এইমাত্র বলিতে যাইতেছিলাম, শুধু ইহা আমার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। এই ভাবে দেখিলে কিছুই বৃথা নয়।

ভূপেন। কিন্তু কাল যে আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহার আলোচনা হইল না। কাল বলা হইয়াছিল যে জগৎগুরুরও ত দ্বৈতভাব নাই তবে তাহার দীক্ষাকে জগৎগুরুর দীক্ষা বলা হয় কেন?

আমি। উহার মীমাংসা এই ভাবে পাওয়া যায় যে, জগৎগুরু বা মার দিক হইতে যাহা লীলা বদ্ধজীবের পক্ষ হইতে ঐ ব্যাপারটাই দীক্ষা।

শ্রীশ্রীমা উহা স্বীকার করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আবার গুরুরও একটা অবস্থা আছে। ঐ অবস্থায় গুরুশিষ্যের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন গুরু শিষ্যকে কিছু দেন বা করিতে বলেন এবং বলা হয় যে ইহা না করিলে কিছুই হইবে না।

আমি। গুরু বা আচার্য্য হওয়া ত একটা অবস্থা মাত্র। যিনি আজ আচার্য্য পদে আছেন তিনি হয়ত কাল উহা হইতে ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইতে পারেন। তখন অন্য একজন আসিয়া ঐ আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন।

মা ইহাও স্বীকার করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "যে সত্তা তোমাদের মধ্যে আছে তাহার প্রকাশের জন্যই ত দীক্ষা। যাহা ভিতরে আছে তাহা বাহিরে প্রকাশ করাই হ'ল দীক্ষার কাজ। যেমন মাটির নীচে বী[illegible]নিলে উহা গাছ হইয়া ফল, বীজ দেয়, যে বীজ ভিতরে ছিল তা[illegible]বার নানা আকারে প্রকারে বাহিরে প্রকাশ হয়, দীক্ষাও ঐরূপ। [illegible]খন এই বীজ তুমি যত্ন করিয়াই লাগাও বা বাতাসে উড়িয়া আসি[illegible] পড়ুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বীজ পড়াই হইল আসল ক[illegible] বীজটি যদি আসল [illegible]য় তাহা হইলে তুমি স্বরূপতঃ যাহা তা[illegible]রিয়া দিবেই।

নির্বিকার অবস্থা লাভের উপায়

এতদ্দেশীয় একজন লোক এতক্ষণ বসিয়া কথা শুনিতেছিল, সে এই সময় বলিল, "মাতাজী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনি আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।"

মা। যদি সৎপ্রসঙ্গে হয় তবে সেখানে ধৃষ্টতার স্থান কোথায়? ভগবানের কথা বলিলে কখনও ধৃষ্টতা হয় না।

লোকটি। আপনি যে সাধন করিয়াছেন তাহাতে আপনার কি উপলব্ধি হইয়াছে যে ভগবান্ আছেন এবং তাঁহাকে কি দেখা যায়?

মা। পিতাজী, এ শরীরের কোন সাধন ভজন নাই। তবে এ শরীর বলিতেছে যে তুমি যেমন আছ তার চেয়েও প্রত্যক্ষভাবে ভগবান্ আছেন।

লোকটি। এ ত কথার কথা হইল। আপনি আমাকে ভগবান্ দেখাইয়া দিতে পারেন?

মা। (হাসিয়া) ভগবান্ ত এমন নয় যে তিনি এক জায়গায় আছেন, তোমাকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আনিব। তিনি যে সর্বত্র আছেন। একমাত্র তিনিই আছেন।

লোকটি। কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে আপনি সাধন ভজন করিয়া কি প্রমাণ পাইয়াছেন? আপনি আমাকে ভগবানের কোন অনুভূতি দিয়া দিতে পারেন কিনা? আপনি এইমাত্র আমাকে একটি ফল দিয়াছেন। (এক ভক্ত মাকে কতকগুলি ফল আনিয়া দিয়াছিল, উহা হইতে মা সকলকেই এক একটি ফল দিয়াছিলেন) এই ফল লাভ করিয়া আম[illegible] ছয় মাসের জন্য না হউক যদি পনর দিন, দশ দিন, এমন কি পাঁচ [illegible] জন্যও নির্বিকার অবস্থা লাভ হয় তবেই ত আমি বুঝিলাম যে আ[illegible]কিছু পাইয়াছি। তাহা না হইলে এ ফল পাওয়ার অর্থ কি? ইহা শু[illegible] ফলই।

মা। হ্যাঁ, একথা সত্য। এ শরীরে[illegible]কথা যে বলিতেছ, ইহা তোমার ছোট বাচ[illegible]। তারপর ইহার আব[illegible]থাটা খারাপ। (সকলের হাস্য)

লোকটি। আমি আজ পনর বৎসর যাবৎ নির্বিকার হইতে চেষ্টা করিতেছি। কত প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল পাই নাই। কি করিয়া বুঝিব যে ভগবান্ আছেন? আপনি ত সাধক, আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন। ভগবান্ কি প্রার্থনা শুনেন?

মা। হ্যাঁ, তাঁহার কান নাই তবু তিনি শুনেন, চোখ নাই তবু তিনি দেখেন, পা নাই তবু তিনি চলেন, একমাত্র তিনিই আছেন। প্রার্থনা করিলে তিনি শুনেন এ কথা যেমন সত্য, আবার তিনি ভিন্ন জগতে আর কেহ নাই একথাও সেইরূপ সত্য। আচ্ছা, তুমি ত নির্বিকার হইতে চাও? আমার সঙ্গে সঙ্গে ছয় মাস থাকিতে পারিবে? ছয় মাস আমার সঙ্গে থাকিলে নির্বিকার হইবে—এ কথা বলিতেছি না, কথা হইল, এখন হইতে ছয় মাস আমার সঙ্গে থাকিতে পার কিনা?

লোকটি। তাহা হইলে আমার যে বালবাচ্চা আছে তাহাদের কি হইবে? যাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়াছি তাহারই বা কি হইবে? (সকলের হাস্য) তাহারা ত সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবান্ জ্ঞানেই আমি তাহাদিগকে সেবা করিয়া আসিতেছি।

মা। স্ত্রী এবং ছেলেপেলে যদি ভগবান্ই হয় তবে ত তোমার ভগবান্ লাভ হইয়া গিয়াছেই। (সকলের হাস্য)

লোকটি। যাহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগকে কি ভগবান্ জ্ঞানে সেবা করা উচিত নয়?

মা। সে কথা বলিতেছি না। তোমার পুত্র পরিবার যে ভগবান্—একথা তুমি বুদ্ধি হইতে [illegible]তেছ, বিচার করিয়া বলিতেছ, কিন্তু তোমার অনুভূতিতে নাই। সে[illegible] বলি যে নির্বিকার হইবার জন্য ইহাদিগকে ভগবান্ জ্ঞানে সেবা [illegible]বেই, তাহা ছাড়া এক ঘন্টা কি আধ ঘন্টা সব কিছু ছাড়িয়া ভগব[illegible]র ধ্যানে লাগিয়া যাইবে। তখন তুমি স্ত্রী, পুত্রের কথা খেয়ালে র[illegible]বে না। অবশ্য এক ঘন্টা বসিলেই যে ধ্যান লাগিয়া যাইবে এমন [illegible] কথা নয়। তবে ঐ স[illegible]য়টা ধ্যানে থাকিতে চেষ্টা করা দরকার[illegible]ক ঘটী জল লইয়া[illegible] চলাফেরা কর

তবে জল ত স্থির আছেই, চলাফেরার জন্য ঘটীটা নড়িতে থাকিলে জলও চঞ্চল হইয়া যায়। কিন্তু ঘটীটি যদি এক জায়গায় বসাইয়া রাখা যায়, নড়াচড়া না করা যায় তবে ঐ ঘটীর জলও এক সময়ে হয়ত শান্ত হইবে। সেইরূপ শরীরটা হইল ঘটী এবং মন হইল উহার মধ্যে জল। শরীরটাকে এক জায়গায় বসিয়া স্থির করিয়া রাখ তবে হয়ত মনও এক সময়ে স্থির হইয়া যাইবে। একবার মন স্থির হইলেই তাঁহার পরশ পাইবে। তাঁহার পরশ পাইলেই বুঝিতে পারিবে যে একমাত্র ভগবান্ই আছেন, আর কিছু নাই। নির্বিকার হইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে ডাকিবার জন্য অনেক আগেই লোক আসিয়াছে। এতক্ষণ মা কথা বলিতেছিলেন, এইবার উঠিলেন। উঠিবার পূর্ব্বে মা লোকটিকে বলিলেন, "পিতাজী তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা ত ঠিক কথাই। ইহার মধ্যে ধৃষ্টতার কি আছে? ভগবান্ লাভের উদ্দেশ্য লইয়া কিছু বলিলে ধৃষ্টতা হয় না।" এইবার আমরাও মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন

২০শে শ্রাবণ, শনিবার (ইং ৫।৮।১৯৫০)

আজ ১০।টার সময় আশ্রমের হল ঘরে গিয়া দেখি যে মা ঐখানে উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয় মার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন আপনি বলিতেছিলেন যে আপনি ছোটবেলায়ও যেমন ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন। এ কথার অর্থ বুঝি[illegible]। অবশ্য ইহা বুঝি যে আত্মা এক এবং অপরিবর্তনশীল, কিন্তু [illegible]রের যে কোন পরিবর্তন হয় না তাহা ত বুঝিতে পারি না।"

মা। বাবা, শরীর বলিয়া কিছু আছে[illegible]কি? শরীর কিনা যাহা সরে যায়। তুমি [illegible]লিতে চাও যে এ শ[illegible] ছোটবেলায় ছোট্ট একটু শিশু ছিল এ[illegible]ন ত উহার পরিব[illegible]। কাজেই এ শরীর

ছোটবেলায় এবং এখন এক অবস্থায় আছে কি প্রকারে! এই যে পরিবর্তন যাহা দেখিতেছ, তাহা দৃষ্টির ব্যাপার। যেখানে দৃষ্টি আছে, সেইখানেই সৃষ্টি। এই দেখিলে এখানে কিছু নাই, তারপর একটা গাছ হইল, কিছুদিন পর গাছটা মরিয়া গেল। এই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—ইহা সবই দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে। যেখানে দৃষ্টি আছে, সেইখানেই দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন আছে। এই তিন থাকে বলিয়া পরিবর্তন দেখা যায়। তুমি দেখিলে যে শিশু যখন বড় হইল তখন সে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তোমার কাছে আর শিশু নাই, কিন্তু যিনি যোগী তিনি যুবক এবং বৃদ্ধের মধ্যেও শিশুকে দেখিতে পান। বীজে যেমন সমস্ত গাছটাই আছে, আবার গাছেও সেইরূপ বীজ আছে। একের মধ্যেই অনন্ত আবার অনন্তের মধ্যে এক। যাহা পরিবর্তন হয়, তাহা ত শরীর অর্থাৎ তাহাই সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া যাইবে কোথায়? এই পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তন আছে ইহাকেই বলা হয় অখণ্ডমণ্ডলাকার। অখণ্ড বুঝাইবার জন্যই মণ্ডলাকার বলা হয়। উপমা সর্বাংশে এক হয় না। সে দৃষ্টি না খুলিলে এগুলি বুঝা যায় না। তুমি যে দৃষ্টির কথা বলিতেছ উহা দিয়া ইহা বুঝা যাইবে না।

সুরেনবাবু। বুঝা না গেল, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার উপায় কি?

মা। (হাসিয়া) তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

সুরেনবাবু। (সবিস্ময়ে) তাঁহাকে পাওয়া যায় না?

মা। না, তিনি যে সর্বত্রই আছেন। তাঁহাকে পাইবে কোথায়? তোমার প্রশ্ন হইল যে কি করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ম দ্বারা যে তাঁহাকে পাই[illegible]উপায় নাই। তাহা হইলে ত তিনি কর্মের অধীন হইয়া পড়েন [illegible] কিছুরই অধীন নন, বরং বলা যায় যে কিসে তাঁহার প্রকাশ [illegible]? তিনি সর্বত্রই আছেন এবং প্রকাশমান ভাবেই আছেন। কেব[illegible] আবরণের জন্য তাঁহাকে অনুভব করা যায় না। এই আবরণ কা[illegible]গেলেই তিনি যে সর্বত্র প্রকাশমানভাবে আছেন তাহা অনু[illegible]। এই আবরণ [illegible]তে হইলে এক

লক্ষ্য হইতে হয়। এক জায়গায় খুঁড়িতে খুঁড়িতেই জল পাওয়া যায়। তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে হইলে একাগ্র হইতে হয়। আমাদের বহু অগ্র আছে কি না, সেইজন্য একাগ্র হওয়ার প্রয়োজন। যাহাতে একাগ্র হওয়া যায় তাহার জন্য সর্ব্বদা সৎসঙ্গ, সদালোচনা এবং নাম জপাদি লইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ থাকিতে থাকিতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যায়। কখন যে তাঁহার প্রকাশ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যে কোন সময়েই ইহা হইতে পারে।

সুরেনবাবু। তাহা ত বুঝি, কিন্তু সকল সময় ত এইভাব রাখা যায় না। মাঝে মাঝে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে।

মা। বাবা, তোমাকে একটা কথা বলিতেছি, তুমি ইহা ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ। যখন অবিশ্বাস আসিবে তখন মনে করিবে যে এই আমি মৃত্যুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছি, মৃত্যু আমাকে ধরিয়া বসিয়াছে। ভগবানের দিকে যাওয়াই হইল অমৃতের দিকে যাওয়া আর ভগবানের বিমুখ হওয়াই হইল মৃত্যুর হাতে গিয়া পড়া। একটা গল্প আছে—ভগবান্ যখন সকলকেই থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া দিলেন তখন পাপ গিয়া তাঁহাকে বলিল, "ভগবান্, তুমি সকলের বাসস্থানই ঠিক করিয়া দিলে, কিন্তু আমার থাকিবার স্থান ত ঠিক করিলে না?" ভগবান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন, "যে মুখে হরি কথা নাই, যাহার হৃদয়ে ভগবৎ চিন্তা স্থান পায় না—তুমি সেইখানে গিয়া থাক।" কাজেই ভগবানে অবিশ্বাস হইলে, ভগবানকে হৃদয়ে জায়গা না দিলে সেখানে পাপ আসিয়া বাসা বাঁধিবে। যেখানে পাপ, সেইখানেই তাপ অর্থাৎ দুঃখ, সেইখানে[illegible] জন্ম, মৃত্যু। সেইজন্য ভগবৎ চিন্তা লইয়া থাকিতে হয়। কি[illegible] কখন তাঁহার প্রকাশ হয়।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা [illegible] ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে ডাকিতে আসিয়াছে দেখিয়া মা উঠি[illegible] পড়িলেন।

বিকাল প্রায় [illegible]টার সময় আশ্রমে [illegible]ম। তখন মা চত্বরের উপর পা চারি[illegible]তেছিলেন। ঐখা[illegible]খ্যাও খুব কম ছিল।

তাহার কারণ বোধ হয় এই যে একে সন্ধ্যা সমাগতা, তাহাতে আবার আকাশে মেঘের ঘনঘটা। যাঁহারা আশ্রম হইতে দূরস্থানে অবস্থান করেন, তাঁহারা বোধ হয় আজ আসেন নাই। আসিয়া থাকিলেও চলিয়া গিয়াছেন। গঙ্গার দৃশ্যটি অতি মনোরম। হু হু শব্দে বাতাস বহিতেছে, গঙ্গাবক্ষে ঢেউগুলি অনন্তনাগের মত সহস্রশীর্ষ উন্নত করিয়া গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার গৈরিক অম্বুরাশির উপর একখানা গাঢ় নীল মেঘ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। উহার প্রান্তদেশ বাতাসে আলোড়িত হইয়া চূর্ণকুন্তলসম ইতস্ততঃ আবর্তিত হইতেছে। নীল ঘন চন্দ্রাতপ তলে গুড়ুগুড়ু শব্দে যেন বায়ু মঙ্গল গীত গাহিতেছে। সবদিকেই আজ নীরদ নীলিমার লীলা বিলাস, চত্বরের উপর ধীর পদক্ষেপে মা হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তিখানি চঞ্চল বারিদবক্ষে অচঞ্চল সৌদামিনীর মত শোভা পাইতেছে। আমরা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ আর ইহা দেখিতে হইল না। ঝন্ ঝন্ শব্দে বারিধারা নামিয়া আসিল। আমরাও চত্বর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি নীচের হল ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

হল ঘরে আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কোন সন্ন্যাসীর যদি মৎস্য খাইতে আপত্তি না থাকে তবে আমাদের কি তাঁহাকে মৎস্য দেওয়া উচিত হইবে?

মা। অনেক সন্ন্যাসী মাছ খান, যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। তবে এ শ[illegible]রের কথা হইল যে সন্ন্যাসীদিগকে মাছ খাইতে না দেওয়াই [illegible]

আমি। যদি উচ[illegible]র কোন গুরুভাই নিম্নবর্ণ গুরুভাইয়ের অন্ন গ্রহণ করিতে আপ[illegible]ত্ত না করেন, তাহা হইলে কি তাহাকে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে [illegible]

মা। এক কথা [illegible] যে দীক্ষাকে নূতন [illegible]ন্ম বলা হয়। এই জন্ম গুরু হইতে পা[illegible]লিয়া গুরুভাইদের [illegible] এরূপ ভাবও

হইতে পারে যে, আমরা যখন এক গুরুরই সন্তান তখন আমাদের মধ্যে বাছ-বিচার থাকা উচিত নয়। আবার ইহাও দেখিতে পাও যে গুরুভাইদের মধ্যে বাছ-বিচার করিতে না চাহিলেও অন্যের বেলায় তোমরা বাছ-বিচার করিয়া থাক। কাজেই যেখানে ভেদদৃষ্টি আছে সেখানে জাতিভেদে মানিয়া চলাই ভাল। অবশ্য এ সম্বন্ধে যদি গুরুর কোন নির্দেশ থাকে তবে উহা আলাদা কথা। সেখানে বলিবার কিছুই নাই এবং ঐ নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করা কর্তব্য। কিন্তু সেরূপ যদি কোন নির্দেশ না থাকে এবং তোমাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকে তবে জাতিভেদ মানিয়া চলাই ভাল। কারণ তোমরা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছ কি না, কাজেই কোন অমঙ্গল দেখিলে তোমরা উহার কারণ না পাইয়া শেষে জাতিভেদ না মানাটাই ঐ অমঙ্গলের কারণ বলিয়া ধরিয়া নিবে।

মুক্তিবাবা। আজকাল আর জাতিভেদ কোথায়? কলের জল ত সকলেই খাইতেছে এবং আজকাল নাকি এরূপ আইনও হইবে যাহাতে জাতিভেদ মানাটাই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

মা। বেশ ত, সেরূপ হইলে তখন তোমরা জাতিভেদ মানিও না। যাহা কিছু হইতেছে সবই তাঁহার ইচ্ছায়। এই দৃষ্টি হইতে দেখিলে কিছুর সহিতই দ্বন্দ্ব নাই। উহা না থাকিলে যত বিরোধ, যত গণ্ডগোল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীমান্ ভূপেন সন্ধ্যা কীর্তন আরম্ভ করিল। তাহাদের কীর্তন হইয়া গেলে শ্রীমান্ বিভুর (ব্রহ্মচারী) অনুরোধে মা কিছুক্ষণ নামগান করিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ করিতে পারিলেন না। মা বলিলেন, "পুরীতে শ[illegible]খারাপ হইয়া যাওয়ার পর হইতেই দেখিতেছি যে গান গাহিতে [illegible]ই না, কখনও কখনও খেয়ালবশে একআধটুকু গান হইয়া যায় [illegible]ত্য, কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হয় না।"

রাত্রি পৌনে [illegible]টা পর্যন্ত গান কীর্তন [illegible]ল। এই সময় মৌনের ঘন্টা পড়িলে [illegible]রা মাকে পুরোভা[illegible]পনের মিনিট কাল

ধ্যান করিলাম। পরে মা উঠিয়া উপরে গেলেন, ততক্ষণ বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আমরাও চত্বরের উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ঐখানে থাকিয়া শেষে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ধ্যানজপাদির সহিত প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ
২১শে শ্রাবণ, রবিবার (ইং ৬।৮।১৯৫০)।

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে পৌঁছিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে হল ঘরে গিয়া বসিলাম। তখনও হল ঘরে পাঠ শেষ হয় নাই। মা আসন গ্রহণ করিলে পাণ্ডেজী, যিনি পাঠ করিতেছিলেন, মাকে বলিল, "মাতাজী, আজ যাহা পাঠ করিলাম উহাতে আমার একেবারেই অধিকার নাই। গীতায় বলিতেছে—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানাং তথা পরে।
প্রাণাপান গতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণঃ।।"

এখানে প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে আহুতি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মা স্বামী শঙ্করানন্দকে ইহার অর্থ বলিতে বলিলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ এ সম্বন্ধে বলিলেন, কিন্তু কেহ বুঝিল কিনা সন্দেহ। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে মা এই সব আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গীতায় যে প্রাণ এবং অপানবায়ুকে এক করার কথা বলা হইয়াছে, ইহা কিন্তু বাস্তবিক ঐরূপই হইয়া থাকে। ক্রিয়া ঠিক ঠিক হইলেই এ সব হয়। এ শরীর ছয় মাস কেবল তিনটি ভাতের দানা খাইয়াছিল এ কথা ত তোমরা জান। যখন বাজিতপুরে থাকা হইয়াছিল তখন একবার ক্রমান্ব[illegible]ন দিন এ শরীর কিছুই গ্রহণ করে নাই। এমন কি একটু জলও [illegible] অথচ সংসারের যাবতীয় কাজ এ শরীরে হইতে হইয়া যাইত। [illegible]ই সময় দেখিয়াছি যে একটি বিশেষ আসন হইয়া শ্বাসের গতি বদ[illegible]ইয়া গেল। শরীরের যে সাতটি দ্বার যেমন নাক, কান, মুখ, মলদ্[illegible] প্রস্রাবের দ্বার দিয়া ঠিক একভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ হইত[illegible] সকল দ্বারগুলিতে [illegible] একসঙ্গে বাতাস আসিতেছে ও যা[illegible]হা বেশ বুঝা যাই[illegible]। নাক, কান,

মুখ—এগুলির কাজ ভিন্ন ভিন্ন। আবার তাহারা একত্র হইয়া এক কাজই করে। এই প্রকার যে ভিতরের ক্রিয়াগুলি—তাহা নানাভাবেই হইতে পারে। এক আছে হঠযোগ। এই হঠযোগে কিন্তু বায়ুযোগের ক্রিয়াও হইয়া আসন ইত্যাদির মধ্য দিয়া শ্বাসের গতিও একই প্রকার হয়। বায়ুযোগ দ্বারা প্রাণবায়ুর ঐরূপ ক্রিয়া হইতে পারে। এখানে লক্ষ্যটা অন্য কিছুর উপর না রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের উপর রাখিতে হয়। জপের দ্বারাও ইহা হইতে পারে। তারপর আসন ও ধ্যান সম্বন্ধে একই কথা বলা যাইতে পারে। ধ্যান ঠিক ঠিক হইলে এ ধ্যান অনুযায়ী আসন এবং ক্রিয়া আপনা আপনি হইয়া যায়। এ কথা ঠিক নয় যে ধ্যান করিতে হইলে একটা বিশেষ আসনের দরকার। সেইরূপ হইলে আসনই হইল একটা বন্ধন। লোকের চলিতে ফিরিতে ধ্যান হইতে পারে। এ অবস্থায় শরীরের যে ভাবে থাকা দরকার তাহা আপনা আপনি হইয়া যায়। পূজাদিতেও এরূপ হয়। যখন পূজাদি ক্রিয়া করিতে করিতে লোকে একেবারে গলিয়া যায় তখন ঐরপ ক্রিয়া হইতে পারে। মোট কথা ধ্যান বল, জপ বল, পূজা বল, রাজযোগ বল, এগুলি হইল প্রাণবায়ু শুদ্ধ করিবার ভিন্ন ভিন্ন উপায়, তাঁহার প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন পথ। যেমন এক গন্তব্য স্থানে যাইতে কেহ রেলগাড়ী, কেহ ষ্টিমার, কেহ এরোপ্লেন ইত্যাদিতে যাইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এই পথে চলিতে চলিতে কি হয়? না, জীবনের গতিটা বদলাইয়া যায়, সে যে পথের ব্রতী আছে তাহা ঘুরিয়া গিয়া সে অন্য পথের ব্রতী হয় অর্থাৎ যে গতিটা এখন বিষয়ের দিকে আছে উহা তখন ভগবানের দিকে যাইতে থাকে। তখন আর বিষয় ভাল লাগে না।

এক হয় যে বিষয়ের আলাপ যে [illegible] ভাল লাগে না তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ের আলাপ করিতে [illegible] আসে তাহার উপর রাগ হয়। আবার এরূপ হয় যে কাহারও উপ[illegible] রাগ বা দ্বেষ হয় না। কিন্তু এক ভগবৎ আ[illegible]লোচনা ভিন্ন আর কিছু[illegible]ল লাগে না। বিষয়ের আলোচনা হইলে [illegible]খে তাহার কান্না পায় [illegible]ও কিন্তু জট রহিয়া

গেল। বিষয়ও রহিল, ভগবৎ ভাবও রহিল; সুখ, দুঃখ দুই-ই রহিল। আর এক অবস্থা হয় যখন বিষয়ের গ্রহণই হয় না। ভগবৎভাবে এমন ভরপুর যে বিষয় আর উহাতে প্রবেশের পথই পায় না। পেট এমনভাবে ভরিয়া আছে যে অন্য কিছু খাইতে দিলে উহা মুখ দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়। যদিও ইহা তিনভাবে ভাগ করা হইল। ইহাও কিন্তু অনেক প্রকার হইতে পারে।

তোমরা সাধারণতঃ কিছুক্ষণ নাম জপাদি করিলে, উহা করিয়া আসিয়াই আবার পূর্ণভাবে বিষয় লইয়া মাতিয়া গেলে। ইহা যেন এক কান দিয়া ভিতরে যাওয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার মত। ইহাতেই বুঝা যায় যে ঐ পথে এখনও কিছু হয় নাই। যদি হইত তবে ভগবানের নাম করিয়া আসিয়াই আবার বিষয় লইয়া মাতিয়া যাইতে পারিতে না। তবে কাল বলিতেছিলাম যে পাথরের উপর দিয়া জল বহিয়া গেলে কালক্রমে পাথর যেমন ক্ষয় হইয়া যায় সেইরূপ নাম জপাদি বা অন্যান্য ক্রিয়া করিতে করিতে স্বভাবের গতিও উল্টিয়া যাইতে পারে।

এই যে হঠযোগ এবং রাজ যোগের কথা বলা হইল—ইহা যদি ঠিক ঠিক ভাবে না হয় তবে কিন্তু নানা রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। একবার নৈনিতালে একজনকে দেখিয়াছিলাম যে রক্তবাহ্য হইয়া একেবারে মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার দলে আরও লোক ছিল। তাহারা ঠিক করিয়াছিল যে তাহারা হঠযোগ শিক্ষা করিয়া পরে কলেজ করিয়া সকলকে ইহা শিক্ষা দিবে। (উপস্থিত একটি মহিলাকে দেখাইয়া) ইহারও জপ করিতে করিতে বায়ু এমন উগ্র হইয়াছিল যে দিবার[illegible]া নাই।

ইহা শুনিয়া ম[illegible] বলিলেন, "মা আমাকে ঐ অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" [illegible] আবার বলিতে লাগিলেন, "হঠযোগ এবং রাজ যোগের ক্রিয়া [illegible]ক ঠিক ভাবে না হইলে নানা উপসর্গ দেখা যায়। আবার এক এ[illegible]ন আছেন জোর করিয়া ধরিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন, নানা সম্প্রা[illegible]ছ না। ঐ পথে চলি[illegible] চলিতে কেহ যদি

কিছু লাভ করে তবে উহা সব থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। যেমন বৈষ্ণবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সব থেকে বড়, শক্তির কাছে কালী সবচেয়ে বড়। ধ্যান, জপ, ক্রিয়াতেও তাহাই হয়। কেহ হয়ত বলে ধ্যান না করিলে কিছুই হইবে না, কেহ বলে ক্রিয়া না করিলে কিছুই হইবে না। ইহাও কিন্তু স্বাভাবিক। কারণ একমাত্র তিনিই আছেন। যে পথেই তাঁহার প্রকাশ হউক না কেন উহা ত সবচেয়ে বড় মনে হইবেই, কারণ প্রকাশ ত তাঁহারই। আবার এমন দীক্ষাও হইতে পারে যাহাতে সে নিজের পথে অটুট থাকিয়াও অন্য সম্প্রদায়ের ভাবধারার সহিত যুক্ত হইতে পারে। কারণ সর্বরূপে, সর্বভাবে একমাত্র তিনিই যে আছেন তাহার প্রকাশ হওয়া ত দরকার। কিন্তু কেহ যদি একধারায় চলিতে চলিতে অন্য ধারার সংস্পর্শে আসিয়া বদলাইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার কিছুই হয় নাই। কারণ বদলান অর্থই হইল খণ্ড হইয়া যাওয়া, দুই হইয়া যাওয়া, ইহাতে ত একের প্রকাশ হয় না।”

বেলা ১১।টা বাজিয়াছে। খুকুনীদিদি আহারের জন্য মাকে ডাকিতে আসিয়াছেন। সান্ন্যাল মহাশয় এতক্ষণ বসিয়া মায়ের কথা শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি দাঁড়াইলেন। উঠিবার সময় তিনি অনুচ্চস্বরে মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি কিছু না করিয়া এরূপ অবস্থা লাভ করিলেন কেমন করিয়া?” স্বামী শঙ্করানন্দ ঐ কথা মাকে বলায় মা হাসিয়া বলিলেন, “বাবা কি হইল? কিছু করিলে ত কিছু হইবে? আবার ইহাও জানিও যে কিছু করিয়া কিছু হইলে তাহা চলিয়া যায়। যেমন জন্ম হইলে মৃত্যু হয়। তাই বলিতেছি এ শরীরের কিছু হয় নাই।” এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় অস্পষ্টভাবে এই কথা বলিতে ব[illegible]চলিয়া গেলেন, “ইনি কিছুতেই ধরা দিবেন না।” পটল দাদা[illegible]থা মাকে বলিলে, মা হাসিয়া বলিলেন, “যাহা ধরা যায় তাহা আ[illegible]র অধরা হয় কেমন করিয়া?”

এইবার আমরা[illegible]ও মাকে প্রণাম করি[illegible]ঠিয়া পড়িলাম। মা উপরে চলিয়া গে[illegible]ন।

শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপ জানিবার বৃথা চেষ্টা

২২শে শ্রাবণ, সোমবার, (ইং ৭।৮।৫০)

আজ বেলা ১০।।টায় মা হল ঘরে আসিয়া বসিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয় মাকে বলিলেন, "আমার ছোট একটি প্রশ্ন আছে এবং আপনি সরলভাবে ইহার উত্তর দিবেন।

প্রশ্নটি হইল এই—আপনি আপনাকে কি মনে করেন?

মা। (হাসিয়া) বাবা, 'আপনি' অর্থ কি? 'আপনি' কে?

সান্ন্যাল মহাশয়। এইত আপনি গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। 'আপনি' বলতে আমি বুঝি শরীরধারী যে আপনি আছেন, সেই শরীরধারী আপনি আপনার সম্বন্ধে কি মনে করেন?

মা। শরীর? শরীর ত যাহা সরে যায়। বদলায়, আর আপনি বলতে তুমিই বুঝায়। তুমি বল না 'আমি আপনি করিয়াছি'?

সান্ন্যাল মহাশয়। আপনি আর আমি কি এক? আপনাকে হাজার হাজার লোক প্রণাম করে। আমাকে ত কেহ প্রণাম করে না।

মা। এই কথা! এখানে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ কেহ এই শরীরকে প্রণাম করে কিনা।

স্বামী শঙ্করানন্দ। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে সকলে ঐ শরীরকেই প্রণাম করে। ঐ শরীরের এমন সব peculiarity আছে যাহার জন্য সকলে উহাকে প্রণাম করে।

মা। তোমার কথায়ই ত প্রমাণ হইল কেহ এই শরীরকে প্রণাম করে না, তাহারা প্রণাম করে peculiarityকে। (সকলের হাস্য)

বাবা আমাকে সরলভাবে উত্তর দিতে বলিয়াছে, তাই বলিতেছি যে, তোমরা আমাকে [illegible]নে কর—আমি তাহাই।

সান্ন্যাল মহাশয়। [illegible]কি কখনও হয়? এক এক জন আপনাকে এক এক রূপে মনে ক[illegible] সবগুলি এক সঙ্গে সত্য হয় কেমন করিয়া।

মা। কিন্তু সত্য [illegible]তাহাই। কেহ এ শরীরকে মা বলে, কেহ মেয়ে বলে, কেহ বন্ধু [illegible] কেহ বা এ শরীরকে বাবা বলে। গম্ভীর নাথ বাবার এক শিষ্য [illegible]তাহার নাম ছিল পশু[illegible]তি। সে আমাকে

বলিত, "সকলে তোমাকে মা বলে, আমি তোমাকে বাবা বলিব।" কাজেই দেখিতেছ সকলে যাহা বলিতেছে—আমি তাহাই।

সন্ন্যাল মহাশয়। আপনি যাহা বলিলেন, সেভাবে ত আমাদিগকেও কেহ বাবা বলে, কেহ ভাই বলে, কেহ বন্ধু বলে, কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় না যে আমি কে।

মা। আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আর এই গঙ্গার ধারে বসিয়া আমি মিথ্যা কথা বলিব? (সকলের হাস্য) তারপর তুমি বলিয়াছ আপনি কি মনে করেন? মন কি? না, মানিয়া লওয়া। যাহা মানিয়া লওয়া যায় তাহা কি সত্য হয়। মন ত সুখ দুঃখের অধীন। যেমন একজন আর একজনকে মারিল। যে মারিল সে মারিয়াই সুখ পাইল। তাহা না হইলে সে মারিবে কেন? আর যে মার খাইল—সে দুঃখ পাইল। তাই দেখ এক কাজকেই একজনে সুখ মনে করিতেছে, আবার অন্য একজন দুঃখ মনে করিতেছে। কাজেই যেখানে মনে করা যায় সেখানে সত্য কোথায়? যাহা সত্য তাহা আর মানিয়া নিতে হয় না। সেখানে মন নাই।

সান্ন্যাল মহাশয়। যদি আমি মনে করি যে আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তবে কি ইহা সত্য হইবে না?

মা। দেখ জগতের বিধানই এমন সুন্দর যে, তুমি যাহা বলিবে উহাই যদি মনে করিতে থাক, তবে একদিন দেখিবে যে, যে মন দিয়া তুমি উহা চিন্তা করিয়াছ তাহার নাশ হইয়া গিয়াছে। মনো নাশ বলে না? তখন তুমি যাহা বলিলে, সত্য সত্যই তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন বুঝিলে?

সান্ন্যাল মহাশয়। হ্যাঁ, কিছুটা।

মা। কি বুঝিলে?

সান্ন্যাল মহাশয়। বিশেষ যে বুঝিলা[illegible] তাহা বলিতে পারি না। (সকলের হাস্য) আমি আপনাকে যে প্রশ্[illegible]রিলাম তাহা ত আপনি গুলিয়ে দিলেন। ([illegible]কলের হাস্য)

এই বলিয়া[illegible]ন্যাল মহাশয় প্রণা[illegible] দাঁড়াইলেন। বেলা

তখন প্রায় ১১।।টা। মা বলিলেন, "বাবা, বেলা ত গেল। যতটা পার তাঁহার চিন্তা লইয়া থাক।

সান্ন্যাল মহাশয়। তাহা পারি কই? আপনার অনন্ত শক্তি। আপনি আমাকে জব্দ করুন।

মা হাসিতে লাগিলেন।

ক্রোধের মূর্ত্তি

এই সব কথার মধ্যে কমল (ব্রহ্মচারী) দাদা হল ঘরে আসিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার ক্রোধের মূর্ত্তি দেখিলাম, তুমি হুঁশিয়ার হইয়া চলিও।"

কমলদাদা বলিলেন, "কই, আমি ত কাহারও উপর রাগ করি নাই।"

মা। রাগ কর নাই, কিন্তু আমি তোমার রাগের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। একবার হইয়াছিল কি, বীরেনকে (মুখার্জ্জি) আমি বলিয়াছিলাম, "বাবা, তোমার ক্রোধের খুব একটা উগ্র মূর্ত্তি দেখিলাম।" বীরেন বলিল, "আমার ক্রোধের মূর্ত্তি দেখিলে? আমি আজ কিছুতেই রাগ করিব না।" এই বলিয়া সে তাহার বৃদ্ধা খুড়ীকে লইয়া বাড়ী রওনা হইল। পথে যাইতে যাইতে একটা লোক সাইকেল লইয়া আসিয়া ঐ বৃদ্ধার উপর পড়িল এবং বৃদ্ধা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। যেই এই কাণ্ড হওয়া আর যায় কোথায়? বীরেন রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সেই লোকটার মুখে এমনভাবে চড়াইতে লাগিল যে তাহার গাল ফাটিয়া অল্প অল্প রক্ত বাহির হইল। তারপর বীরেন তাহার খুড়ীকে লইয়া [illegible] গেল। এতক্ষণ তাহার কিছুই মনে ছিল না। বাড়ীতে পৌঁছিয় [illegible] তাহার মনে হইল যে, সে না বলিয়াছিল যে আজ সে রাগ করি [illegible] া। অথচ কিভাবে যে তাহার রাগ আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সে [illegible] নিতে পারে নাই। তা'ই বলিতেছিলাম যে তুমি সাবধান হইও। [illegible] মারও রাগের মূর্ত্তি দেখিলাম।

বেলা ১১।।টা ব [illegible] গিয়াছে দেখিয়া মা [illegible] ঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলি [illegible]।

মায়ের ভাবের পরিবর্ত্তন

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাকে চত্বরের উপর বেড়াইতে দেখিলাম, কিন্তু রাত্রিতে যখন আশ্রমে গেলাম তখন গিয়া শুনি যে মায়ের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি শ্রীযুক্ত গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত কথা বলিতে বলিতে আড়ষ্ঠভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়া হঠাৎ মৌন হইয়া গিয়াছেন। মায়ের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিলাম যে মা শুইয়া আছেন, খুকুনী দিদি মায়ের পা ডলিয়া দিতেছেন, কেহ কেহ বাতাস করিতেছে। সকলের মুখই গম্ভীর। আমি আর ঘরে না গিয়া চত্বরের উপর বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় যখন বাসায় ফিরিয়া আসি তখন আবার মাকে দেখিতে গেলাম। তখন মা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় মার কাছে বসিয়া আছেন। বোধহয় মা কিছু বলিয়াছিলেন। উহা শুনিয়া গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন, "তুমি আগের মত কথাবার্তা বল, আমরা শুধু তোমার ঐ ভাবের সহিত পরিচিত, অন্য ভাবের সহিত আমাদের পরিচয় নাই।" মা উহা শুনিয়া উত্তর দিলেন না। ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় মার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মায়ের এই ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি একটু বিচলিত হইয়াছেন। মার ভাবটি দেখিয়া আশ্রমের সকলেই ম্রিয়মাণ। রাত্রি ১১টার পর আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার (ইং ৮।৮।৫০)

আজ বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মা যে আজ হল ঘরে আসিবেন—সে আশা ছিল না। ত[illegible]া কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য আশ্রমে গেলাম। শুনিলা[illegible]ন বেলা মা আর ঘরের বাহির হন নাই। হল ঘরে গীতা পাঠ হই[illegible]ল আমি গিয়া ঐখানে বসিলাম। ১০।।টা পর্যন্ত পাঠ হইল, কী[illegible] হইল। উঠিব উঠিব মনে করিতেছি এমন সময় মা হল ঘরে আ[illegible]া উপস্থিত। সচারচর মা যেভাবে চলে[illegible] আজিকার চলনটা [illegible]বর নয়। গতি অতি মন্থর। মা আ[illegible] আসন গ্রহণ করি[illegible]ল্প সংখ্যক লোকই

হল ঘরে ছিল, সকলেই নীরব। মায়ের ঢুলুঢুলু আঁখি দেখিয়া মনে হইল গতকল্যের জের আজও চলিতেছে। মাঝে মাঝে মা দুই একটা কথা বলিতেছেন, মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতে চায় না। মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল আজ আর কোন সদালোচনা হইবে না।

আধ্যাত্মিক পথে চলিতে ত্যাগের দরকার

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর মা মুক্তিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন কি না। মুক্তিবাবা বলিলেন যে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করেন। মা বলিলেন, "একজনের কথা জানি যে সে রোজ গঙ্গাস্নান করিয়াই তাহার বাতের ব্যথা সারাইয়া ছিল।" মুক্তিবাবা বাতের ব্যথাতে কষ্ট পাইতেছিলেন।

আজ বাটুদা আসিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "যতিদের তিন বেলা স্নান অবশ্য কর্তব্য। যতি বলিতে বান-প্রস্থাবলম্বী এবং সন্ন্যাসী উভয়ই বুঝায়।

মুক্তিবাবা। এ নিয়ম বোধহয় গরম দেশের জন্য। (সকলের হাস্য)

বাটুদাদা। আমি যখন দ্বিতীয়বার কৈলাশে যাই, তখন ঢাকার বরদা গাঙ্গুলীর ভাই হেরম্ব গাঙ্গুলী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দেখিয়াছি যে তিনি ঐ দুর্গম পথেও প্রত্যহ তিনবার করিয়া স্নান করিতেন। জলে বরফ ভাসিতেছে, তিনি ঐ বরফ ঠেলিয়াই স্নান করিতেন। আহারও তাঁহার ছিল খুব পরিমিত।

মা। (আমাকে) [illegible]বাবা খুকুনীর ভাই নন্দুর শ্বশুর। হরিদ্বারে সে আমাদের কাছে [illegible]ছিল। আমরা যেখানে থাকিতাম তাহার নীচেই একটা গুহা ছি[illegible] তাহাতে একজন সাধু ত্রিশ বৎসর ছিলেন। সাধুটিও ভাল ছিলেন। [illegible]নি চলিয়া গেলে হেরম্ববাবাকে বলিয়াছিলাম যে সে চেষ্টা করিলে [illegible]ন থাকিতে পারে। সে তাহাই করিয়াছিল। সে মনে করিত পূর্ব্বজ[illegible]হ্মচারী ছিল। চুল দা[illegible]ও ঐভাবে রাখিত।

আমি যখন [illegible]র ছিলাম সেখা[illegible]কজন সাধু

দেখিয়াছিলাম। তিনি দিবারাত্র পূজা ইত্যাদি লইয়া থাকিতেন। নিদ্রা জয় করিবার জন্য রাত্রিতে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতেন। প্রথম প্রহরে রান্না করিয়া ভোগ লাগাইয়া সামান্য একটু প্রসাদ পাইতেন। পরে দ্বিতীয় প্রহরের পূজার জোগাড় করিয়া ঐ সময় একটু ঘুমাইয়া লইতেন, দ্বিতীয় প্রহরেও এইরূপ। সমস্ত রাত্রিই এইরূপ পূজা করিতেন এবং ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমাইয়া লইতেন। যাহারা এই পথে চলিতে চায় তাহাদের এইরূপ ত্যাগের ভাব থাকা চাই। যেমন লোকে পাশ না করা পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়া যায়, সেইরূপ এই পথে কিছু লাভ না করা পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে হয়। পরীক্ষা হিসাবে কিছুদিন ধ্যান জপাদি করিলে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিক আহার আর নিদ্রাতে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। আহার, নিদ্রা ষোল আনাই বজায় থাকিবে আবার এদিকেও কিছু লাভ হইবে, তাহা কি কখনও হয়? তোমরা একটু নাম জপাদি কর এবং উহা করিয়াই আবার যে সেই। নিজেদের বদলাইয়া যাইবার সঙ্কল্প কই? এ পথে চলিতে হইলে ঐরূপ সঙ্কল্প এবং ত্যাগের ভাব থাকা দরকার। তোমাদের মধ্যে এই ভাবের অভাব, অথচ তোমরা বল যে এ পথে চলিয়া কিছু হইল কই? কিছু যে হইবে তাহার জন্য তোমরা করিতেছ কি?

অতি ধীরে ধীরে এবং অনুচ্চস্বরে মা এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন। বেলা ১২টা বাজিয়াছে দেখিয়া মা উঠিয়া উপরে গেলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বিকাল প্রায় ৬টার সময় যখন আশ্র[illegible] গেলাম তাহার একটু পরেই মা ঘর হইতে বাহির হইয়া চত্ব[illegible]পর পা'চারি করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার কতকটা তট[illegible]স্থা বলিয়া মনে হইল। চক্ষের দৃষ্টিও লক্ষ্যশূন্য। লোকের সঙ্গে যে দু[illegible]একটি কথা বলিতেছেন উহাও যেন খুব ভাসা ভাসা ভাবে। আমরা [illegible]াইয়া দাঁড়াইয়া মায়ের ভাব লক্ষ্য করিতে[illegible]লাম। মা একবার চ[illegible]র উপরে যজ্ঞমন্দিরে গিয়া কিছুক্ষণ দাঁ[illegible]য়া রহিলেন। তখন [illegible]আরতি হইতেছিল।

আবার সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মায়ের সেদিকে লক্ষ্য নাই। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। এমন সময় খুকুনীদিদি আসিয়া মাকে হল ঘরে লইয়া গেলেন। আমরাও হল ঘরে গিয়া বসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের অস্বাভাবিক হাসি

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমা আসনে বসিয়া আছেন। অতি শান্ত ভাব। মুখখানা যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। প্রায় এক ঘণ্টা কীর্তন চলিল। শ্রীমান্ বিভু (ব্রহ্মচারী) গান করিতেছিল। গান গাহিতে গাহিতে একটু গণ্ডগোল করিলে, উহা উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীমা হাসিতে লাগিলেন। উচ্চ হাসি তাহা নয়, অথচ থাকিয়া থাকিয়া উহা যেন ঝলকে ঝলকে উঠিতেছে। হাসিটা আমার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না। খুকুনী দিদি তখন ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াও মনে হইল না যে তিনি উহা স্বাভাবিক মনে করিতেছেন বরং মায়ের হাসিতে তাঁহার মুখে চিন্তারেখাই দেখা দিল। মা কিছুক্ষণ খুব হাসিয়া পরে বলিলেন, "এবার উপরে যাওয়া যাক্।"

মা উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উপরে উঠিয়া আসিলাম। তখনও ঝুর ঝুর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলাম। ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি আজ মায়ের হাসি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন, কারণ গতকল্য মাকে হাসাই[illegible]জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উপরে আসিয়া[illegible]সির কথা চলিতে লাগিল। মা বলিলেন, "এ শরীরের মাথা খা[illegible]কিনা তাই মাঝে মাঝে এরূপ হয়। গানের কোন দোষ দেখিয়া যে[illegible]সি হইয়াছে তাহা নয়। উহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। পূর্ব্বেও এরূপ[illegible]সি হইয়াছে। সে কি হাসি! ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ ঘণ্টা হাসিতেছি[illegible] হাসির জন্য হাত,[illegible] সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। হাসি[illegible]বে হইতে পারে। [illegible]তে হাসিতেই

একেবারে শেষ। অখণ্ডানন্দ বাবা এ শরীরের হাসি দেখিয়া গম্ভীর হইয়া যাইত।

ডাঃ দাশগুপ্ত। মাথা ত খারাপই,—তবে ইহা চাপিয়া পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিলেই আমরা খুশী হইব।

ইহা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। এমন সময় কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) আসিলে মা তাহাকে নিয়াও কৌতুক করিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ের ভাবটা ঠিক স্বাভাবিক নয় বলিয়া আমরা ঐ হাসি তামাসায় ভালভাবে যোগ দিতে পারিতেছিলাম না, কারণ আবার যদি মায়ের অস্বাভাবিক হাসি আরম্ভ হয়।

মনের সূক্ষ্ম গতি

এই সময় কমলাকান্ত প্রশ্ন করিল, "মা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয় কেমন করিয়া? মৌনের সময় হইয়া যাওয়াতে মা তখন আর এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। মৌন শেষ হইলে কমলাকান্ত আবার প্রশ্নটি উত্থাপন করিল। মনে হইল প্রশ্নটি তাহার ব্যক্তিগত কোন অনুভূতি লইয়া। মা তাহাকে যে ভাবে জেরা করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহাই মনে হইল। তাহাকে অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বলিয়া সাধারণ ভাবে ক'টি কথা মা বলিলেন। মা বলিলেন, "মন জগতের নানা বিষয়ে ছড়াইয়া আছে এবং ঐখান হইতে রস গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। যতদিন মন ঐ সব ছাড়িয়া একাগ্র না হইবে ততদিন তাহার সূক্ষ্ম গতি আরম্ভ হইবে না। মনের সূক্ষ্ম গতি আরম্ভ হইলেই সেই মহান্ প্রকাশটা সুগম হইয়া আসে। সেইজন্য তোমাদিগকে সর্ব্বদা সৎসঙ্গ, সদালোচনা এবং ধ্যান-জ[illegible] লইয়া থাকিতে বলি। যাহারা সংসারী তাহার সংসারের কাজও [illegible]হার সেবা মনে করিয়া করিবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় শুধু তাঁ[illegible] ধ্যান বা চিন্তার জন্য রাখিবে। তখন আর কোন চিন্তা নাই। শুধু [illegible]নি আছেন আর আমি আছি— এই ভাব। এইভাবে কিছুক্ষণ নির্জ[illegible]্যান করিলে কি হইবে? না, সংসারের অনন্যে কাজ যে তাঁহার [illegible]হিসাবে করিতেছ ঐ ভাবটা আর[illegible] হইয়া ফুটিয়া উ[illegible]বে একককে লইয়া

চলিতে চলিতে মন একদিন একাগ্র হইয়া যাইবে এবং একাগ্র হইলেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে।

এইভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। এমন সময় খুকুনী দিদি আসিয়া মাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। আমরা চত্বরে বসিয়া বসিয়া মায়ের প্রসাদ পাইলাম। মেঘে আকাশ অন্ধকার, রাত্রিও ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। মার সঙ্গে যে আজ আর দেখা হইবে তাহা মনে হইল না। তাই বাসায় চলিয়া আসিলাম।